জিজ্ঞাসা ও জবাব

(২য় খণ্ড)

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও জবাব

(২য় খণ্ড)

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
মোবাইল:০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮
dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust
www.assunnahtrust.com

জিজ্ঞাসা ও জবাব (২য় খণ্ড)

ড. খোন্দকার আব্দুলাহ্ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
(১৯৫৮-২০১৬)

সম্পাদনা: শাইখ ইমদাদুল হক

অনুলিখন: আল মাসুদ আব্দুল্লাহ

প্রকাশক: উসামা খোন্দকার

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রকাশকাল: শাবান ১৪৩৯ হিজরী, বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ২০১৮ ঈসায়ী

বিক্রয় কেন্দ্র: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স। মোবাইলঃ ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮
আস-সুন্নাহ টাওয়ার, ঝিনাইদহ। মোবাইলঃ ০১৭৯১৬৬৬৬৬৩, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার। ঢাকা-১১০০, মোবাইলঃ ০১৭৯১৬৬৬৬৬৫
ফুরফুরা দরবার, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৭৮৮৯৯৯৯২৬

ISBN: 978-984-93282-2-3

হাদিয়া: ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

Jiggasha O Jobab (Voloum-2) (Question & Answer) by Professor Dr. Kh. Abdullah Jahangir.(Rahimahullah) Published by As-Sunnah Pablications, As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300. Printed, April-2018 Price TK 250.00 only.

প্রকাশকের কথা

প্রশংসা আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের উপর। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন মাহফিলে ও টিভি চ্যানেলে বহু মানুষের যুগজিজ্ঞাসার জবাব কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রদান করেছেন। তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি মাহফিলগুলো ভিডিও ক্যাসেটবদ্ধ করতেন। ফলে তাঁর প্রশ্নোত্তর ও বক্তৃতা যেমন সংরক্ষিত রয়েছে; তেমনি তা সংযোজন ও বিয়োজনের হাত থেকেও রক্ষা পেয়েছে। তিনি তাঁর মৌলিক রচনাগুলো যেমন তথ্যনির্ভর করে সাজিয়ে গেছেন, তেমনি তাঁর যুগজিজ্ঞাসার জবাবগুলোও কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে প্রদান করে গেছেন। বর্তমান জটিল জীবনধারায় তাঁর প্রদত্ত বহু জিজ্ঞাসার জবাব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে ইসলামের আলোর পথ দেখাবে বলে আমরা আশা রাখি। বিভিন্ন ভিডিও ক্যাসেট, টিভি চ্যানেল ও ইউটিউবে থাকা তাঁর প্রশ্নোত্তরমালা সংগ্রহ করে *'জিজ্ঞাসা ও জবাব'* নামে সিরিজ আকারে আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স তা প্রকাশ করছে বলে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই। মহান আল্লাহ যেন লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করেন এবং লেখকের রচনাগুলোকে তাঁর জন্য কবুল করেন। পরিশেষে সকলের নিকট দুআ' কামনা করি।

উসামা খোন্দকার

চেয়ারম্যান
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট।

সূচীপত্র

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান দয়াময় আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিজন, সহচর ও কল্যাণ কামনায় প্রলয়দিবস পর্যন্ত তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর।

আমাদের রব মহান দয়াময়। তাঁর দয়ার অন্যতম নিদর্শন, দুনিয়ার অন্ধকারে কল্যাণ পথে চলবার জন্য তিনি আপন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন ওহির জ্ঞান এবং আপন শরীআতে জ্ঞানার্জনকে দিয়েছেন সর্বোচ্চ মর্যাদা। বান্দার কথা ও কর্ম, এমনকি চিন্তাকে পর্যন্ত সঠিকভাবে চালিত করবার জন্য জ্ঞানকে করেছেন সকল বিধানের উপর অগ্রগামী। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন বিশ্বমানবতা ছিল ধ্বংস ও সর্বনাশের একেবারে দ্বারপ্রান্তে, যেখান থেকে আর এক পা ফেললেই সে হারিয়ে যাবে চিরপতনের অতল তলে– যদি আমরা চিন্তাশক্তির সবটুকু প্রয়োগ করে মানুষের দ্বারা সম্ভব এমন সকল পাপ ও অপরাধের তালিকা প্রস্তুত করি এবং ইতিহাসের পাতা উল্টে ফিরে যাই খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীতে, তবে সেখানে কোনো একটি জনপদ এমন পাওয়া সম্ভব নয়, যেখানে আমাদের প্রস্তুতকৃত অপরাধ ও পাপের তালিকার কোনো একটি পাপ অনুপস্থিত, সেসময়ে মানবতা যেন নিজেদেরকে ধ্বংস ও সর্বনাশের খেলায় ও নেশায় মেতে উঠেছিল, এই ধ্বংস-উন্মুখ, মুমূর্ষু মানবতাকে মুক্তি ও চিকিৎসার জন্য এই মঙ্গলময় কল্যাণকামী সর্বজ্ঞ সত্তা আমাদের উম্মি নবী (ﷺ) এর নিকট যে আসমানি ব্যবস্থাপত্র পাঠালেন তার সর্বপ্রথম অবতারণ যে মাত্র পাঁচটি আয়াত, সেখান একটি মাত্র আদেশ 'পড়ো'। এই অবতারণ-দস্তুরই বলে দেয়, মানবতার মুক্তি, সুস্থতা, চিকিৎসা ও সফলতার জন্য 'সর্বস্রষ্টা রবের নামে' পড়ার গুরুত্ব কতটুকু।

পথ-পদ্ধতির ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামে জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প রাখা হয় নি। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ. তাঁর 'কিতাবুস সহীহ'র একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন, 'কথা ও কর্মের পূর্বে জ্ঞানার্জন'। মহান আল্লাহ বলেন, "অতএব তোমাদের জানা না থাকলে

যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও"[১]। নবীজি (ﷺ) বলেন, "তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ"[২]। অতএব পড়া, শোনা ও দেখা– যে কোনো পথ ও পদ্ধতিতে আমাদেরকে জ্ঞানার্জন করতে আদেশ করা হয়েছে।

জ্ঞানার্জন তাই মুসলিম উম্মাহর কাছে এক মহান ইবাদত। এই উম্মাহর মনীষী পুরুষগণ জ্ঞানের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছেন জনপদের পর জনপদ। জ্ঞান তাদের কাছে হারানো ধন, জ্ঞানের অন্বেষায় কদম উঠানো 'আল্লাহর রাস্তা', জান্নাতের সহজতম পথ। যেখানে অন্যান্য উম্মাত তাদের নবীদের তিরোধানের সাথে সাথেই বড় অবহেলায় নিজেদের কিতাব হারিয়ে ফেলেছে, বিস্মৃত হয়েছে, অপসারণ ও বিকৃত করেছে, সেখানে মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর কিতাব ও নবী (ﷺ) এর হাদীস অবিকল সংরক্ষণের জন্য সাধ্যের সবটুকু করেছে। চৌদ্দশত বছর পরে এই পতনুম্মুখ কালেও উম্মাতের অসংখ্য সদস্য কুরআন-সুন্নাহর বিধান জেনে জীবনে তা প্রতিপালনের জন্য পাগলপারা। যারা নানান কারণে ইসলামকে অ্যাকাডেমিকভাবে জানার সুযোগ পান নি তারা বিভিন্নভাবে আলিমদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে শরীআত পালনের চেষ্টা করেন। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন এমন অসংখ্য মানুষের জিজ্ঞাসাস্থল।

দিনদুপুরে মেঘমুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সূর্যের পরিচয় দানের জন্য একটি শব্দও উচ্চারণ করা যেমন বাহুল্য ও বোকামি, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ কে পাঠক মহলের কাছে পরিচিত করবার জন্য বাক্য ব্যয় করাও তেমনই। আমরা শুধু মহান আল্লাহর দরবারে সকৃতজ্ঞ শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আমাদেরকে এই সূর্যসম মহান মনীষীর ইলমি খেদমতের সাথে কোনোভাবে শরীক হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। আর তাঁর নিকট সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে এই কল্যাণকর্মটি সমাপ্তিতে নিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

---

[১] সূরাঃ নাহল, আয়াতঃ ৪৩; সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৭

[২] সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৩১; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৬৫৮

পাঠক, *'জিজ্ঞাসা ও জবাব'* সিরিজের যে বইটিতে আপনি এখন চোখ রেখেছেন তা কোনো লিখিত পুস্তক নয়। এর কিছু প্রশ্ন হয়তো লিখিত, যে প্রশ্ন আপনারা বিভিন্ন সময়ে মিম্বারে, ময়দানে ও টিভিতে করেছিলেন। আর জবাবগুলো সবই মৌখিক। তখন স্যার রাহিমাহুল্লাহ আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব আর মুখভরা হাসি নিয়ে আপনাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তখন আপনারা ছিলেন শ্রোতা আর এখন পাঠক।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো তথ্য প্রেরক আর অনুধাবনকারী হচ্ছে মস্তিষ্ক। এক্ষেত্রে চক্ষু ও কর্ণের বিরোধ সুস্পষ্ট। কানের পাঠানো যে তথ্যগুলো মস্তিষ্কের জন্য সুখকর ও সহজবোধ্য, ঠিক সে তথ্যগুলোই যখন চোখ পাঠায় অবিকলভাবে তখন অনেক সময় তা হয়ে পড়ে বিরক্তিকর ও দুর্বোধ্য। উচ্চসাহিত্যমান সম্পন্ন সুলিখিত কোনো প্রবন্ধ, যার পাঠ আপনাকে মুগ্ধ, মোহিত ও আনন্দিত করেছে, সেটি একই গাঁথুনিতে যখন কোনো মঞ্চের বয়ান বা ওয়াযে আপনাকে শোনানো হবে আপনি বিরক্ত হয়ে পড়তে পারেন। তেমনি কোনো মঞ্চ কাঁপানো, দর্শক মাতানো বক্তব্য যখন হুবহু লিখিত হয়ে চোখের সামনে আসে তখন তা সম্পূর্ণ অখাদ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এজন্যই লেখা ও বলার রয়েছে আলাদা আলাদা ধাঁচ।

পাঠক, স্যার রাহিমাহুল্লাহর হাসিমুখ দেখতে দেখতে যে জবাবগুলো এক সময় আপনারা শ্রবণ করেছেন এখন হতে যাচ্ছেন তার পাঠক। কিন্তু এক্ষেত্রে চক্ষু-কর্ণের বিরোধ যেন আপনার মস্তিষ্ককে পীড়িত না করে সে জন্য আমরা আমাদের সীমা ও সাধ্যের ভেতর থেকে চেষ্টা করেছি। তবে এদিকেও ষোলোআনা খেয়াল রাখা হয়েছে, যেন মূল বক্তব্যের মর্ম কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়, আবার বক্তব্যের কথ্য আমেজ হারিয়ে সম্পূর্ণ লেখ্যাকৃতে পরিণত না হয়। আমরা চেয়েছি, এই সঙ্কলনটি পাঠ করতে গিয়ে আপনি ইলমে দীনের পাশাপাশি একই সাথে পাবেন বক্তব্য শ্রবণ ও প্রবন্ধ পঠনের স্বাদ।

এই সিরিজের প্রথম খণ্ডটি বাজারে এসেছে গত ডিসেম্বরে। তার শ্রুতিলিখন করেছিলেন বন্ধুবর *সাব্বির জাদিদ;* আর এ খণ্ডের শ্রুতিলিখন করেছেন স্নেহাস্পদ *আল মাসুদ আব্দুল্লাহ*। *'জিজ্ঞাসা ও*

জবাব' সঙ্কলনটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজনের করা প্রশ্নের জবাবের সঙ্কলন হওয়ার কারণে একই প্রশ্নোত্তরের রিপিট হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে একই বিষয়ের একাধিক প্রশ্নের জবাবগুলোতে অতিরিক্ত ভিন্নভিন্ন কিছু তথ্য বা বিষয় থাকলে আমরা সবগুলো প্রশ্নোত্তরই অবিকল রেখে দিয়েছি। তবে এক্ষেত্রে একটি প্রশ্নোত্তরকে মূল রেখে অন্য উত্তরগুলোর অতিরিক্ত উপকারী অংশগুলো তার সাথে বিন্যাস্ত করে দেওয়া যেত। চূড়ান্ত সংস্করণের জন্য আমরা এই চিন্তাটা তুলে রাখছি এবং পাঠকের সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করছি।

পাঠকের জন্য সুবিধাজনক ও উপকারী হত প্রশ্নোত্তরগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজাতে পারলে। সেজন্য প্রয়োজন প্রশ্নোত্তরের পুরো ভাণ্ডারটা লিখিত হয়ে যাওয়া। তাই এই বিষয়টাও আমরা চূড়ান্ত সংস্করণের জন্য রেখে দিচ্ছি। তবে প্রথম খণ্ডটা সম্ভব না হলেও এই খণ্ডের ভেতরের বিষয়গুলো বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে শুরুতে একটা সূচিপত্র সংযোজন করে দিয়েছি।

কোথাও কোথাও পাঠক দেখতে পাবেন, প্রশ্নে লিখিত বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু পয়েন্ট স্যার উত্তরে আলোচনা করেছেন। প্রধানত তিনটি কারণে এমনটি হয়েছে। টেলিভিশনের লাইভ প্রোগ্রামে স্যার কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন তখন হয়তো কোনো দর্শক-শ্রোতা ফোনে প্রশ্ন করলেন। উপস্থাপক প্রশ্নটির কিছু পয়েন্ট ইঙ্গিতে লিখে রাখলেন এবং চলমান প্রশ্নের জবাব শেষ হলে স্যারকে তার লেখা ইঙ্গিতের আলোকে প্রশ্নটি করলেন। কিন্তু কোনো পয়েন্ট হয়তো বাদ পড়ে গেছে। যেটা স্যার নিজের স্মৃতি থেকে জবাব দিয়েছেন কিন্তু আমাদের লিখিত প্রশ্নে আসে নি। স্যারকে লিখিতভাবে প্রশ্ন করলে সবসময় তিনি পুরোটা প্রশ্ন শব্দ করে পড়তেন না কিন্তু জবাব দিতেন। প্রশ্নের সেই নিঃশব্দে পঠিত অংশ আমরা লিখতে পারি নি। কেননা আমরা তো লিখেছি রেকর্ড থেকে শুনে। আবার কখনো স্যার রাহিমাহুল্লাহ মনে করেছেন, এই প্রশ্নের মৌলিক জবাবের সাথে অতিরিক্ত কিছু কথা না বললে শ্রোতার জন্য বিষযটি বোঝা কষ্টকর হবে অথবা শ্রোতা ভুল বুঝতে পারেন। কখনো তিনি প্রশ্ন শুনে ভেবেছেন, সমাজে এ সম্পর্কে ব্যাপক ভুল ধারণা বিদ্যমান। যে কারণে শুধু প্রশ্নের উত্তরটুকু যথেষ্ট নয়। তখন তিনি অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কথা বলে সমাজের ভ্রান্তি দূর করতে চেয়েছেন।

কেননা পর্দার সামনে শুধু একজন প্রশ্নকর্তা নয়, বরং সেখানে বসে আছে একটি সমাজ।

সাধারণতই লিখিত বক্তব্যের মতো মৌখিক বক্তব্য উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ হয় না। তবে স্যার রাহিমাহুল্লাহ এক্ষেত্রে ছিলেন অনেকটা ব্যতিক্রম, এসবপ্রশ্নের মৌখিক জবাবেও যথেষ্ট কোটেশনগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে সাধারণত রেফারেন্স দেন নি। আমরা তাঁর উদ্ধৃতিগুলোর পাশে রেফারেন্স সংযুক্ত করে দিয়েছি। বিভিন্ন হাদীসের বইয়ের একাধিক অনুবাদ বাজারে আছে। সেসব অনুবাদের একটার সাথে আরেকটার হাদীস নাম্বারের অনেক অমিল রয়েছে। তাই পাঠক বাজারের যেকোনো অনুবাদ হাতে নিয়ে যদি আমাদের উদ্ধৃতির সাথে মেলাতে যান হয়তো মিলবে না। আমরা হাদীসের মতন ও নাম্বার সংযোজন করেছি *'মাকতাবা শামিলা'* থেকে। একই হাদীস যখন একাধিক সঙ্কলক তাদের নিজনিজ সঙ্কলনে বা একই সঙ্কলক তার কিতাবের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন সেক্ষেত্রে শব্দের তারতম্য ঘটেছে এবং কোথাও অংশবিশেষ, কোথাও পূর্ণ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। পাঠক সাধারণকে কোটেশন মেলানোর ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

কুরআন-হাদীসের কোটেশন উল্লেখ করে স্যার রাহিমাহুল্লাহ সর্বত্র হুবহু অনুবাদ করেন নি। আগে বা পরের বক্তব্যের মধ্যে মর্ম উল্লেখ করেছেন। আমরাও সবক্ষেত্রে অনুবাদ সংযোজনের প্রয়োজন মনে করি নি। কোথাও সংযোজন করলে তা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রেখেছি। পাঠক দেখতে পাবেন, তিনি কখনো পূর্ণ কোটেশন উল্লেখ করে অংশবিশেষের অনুবাদ বা মর্ম উল্লেখ করেছেন আবার কখনো আয়াত বা হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করে সম্পূর্ণ অনুবাদ বা মর্ম উল্লেখ করেছেন। আমরাও তেমনই রেখে দিয়েছি। তবে দুআর ক্ষেত্রে স্যার যেখানে আংশিক বলে ইঙ্গিত করে থেমে গেছেন, পাঠকের সুবিধার্থে আমরা সেখানে হাদীসের কিতাব থেকে পূর্ণ দুআ' সংযোজন করে দিয়েছি।

স্যার রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত শরীফ তবিয়তের মানুষ। ছোটবড়, দূরের, কাছের সবাইকেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন এবং হাসি মুখে কথা বলতেন। কিন্তু পাঠক, দেখবেন অনেক জবাবের ক্ষেত্রে স্যার

প্রশ্নকর্তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি এমনটি করেছেন যখন বুঝতে পেরেছেন, এই প্রশ্নকর্তা তাঁর ছাত্র বা সন্তানতুল্য অত্যন্ত স্নেহভাজন কেউ।

উলামা ও আয়িম্মায়ে কিরামের প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনের ধারা অনেক প্রাচীন। অনেকেরই প্রশ্নোত্তর সঙ্কলিত হয়ে উম্মাতের কাছে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে এবং ইলমি আকাঙ্ক্ষার পিপাসা মিটিয়েছে। তার ভেতর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার *'মাজমুউল ফাতাওয়া'* সমাদর, গ্রহণযোগ্যতা ও উপকারিতায় অনন্য। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ যে দরদ ও কল্যাণেচ্ছা নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছেন এবং উম্মাতের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন, আমাদের আশা মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনকেও সমাদৃত, উপকারী ও দীর্ঘস্থায়ী করবেন।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়া করে এ সঙ্কলনটির ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে কবুল করে নেন। একে অনুলেখক, সম্পাদক, ব্যবস্থাপক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠক– সকলের নাজাতের ওয়াসীলা বানিয়ে দেন। একাজের মূল ব্যক্তিত্ব ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহর সকল উত্তম কর্মকে কবুল করেন, তাকে উম্মাতের জন্য কল্যাণকর করেন, তাঁর সকল ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে আপন রহমতের কোলে আশ্রয় দেন, তাঁর প্রিয় বান্দাদের সর্বোচ্চদের কাতারে শামিল করে নেন এবং আমাদেরকে জান্নাতে তাঁর সাথে একত্রিত করেন। আমীন! সালাত ও সালাম আল্লাহর খলীল ও হাবীব মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিজন ও সহচরগণের উপর।

ইমদাদুল হক

২৬/০৭/১৪৩৯ হিজরী

মাদরাসাতুত তাকওয়া

আনন্দধাম, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

ঈমান/আকীদা

প্রশ্ন-০১: যদি কেউ মুসলিম হতে চায়, মুসলিম হতে যদি আগ্রহভাবে এগিয়ে আসে আর তাকে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয়, তাহলে আমার কী করণীয়?

উত্তরঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেনঃ

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

আমরা মানুষের কাছে দীন পৌঁছাব। আমরা অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেব।[১] তবে দুর্ভাগ্য আমরা মুসলিমরা মুসলিমদেরকে, একে অপরকে কাফির বানাতে খুবই ব্যস্ত আছি। কোনো অমুসলিমের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে যাই না। এরপরও অনেক অমুসলিম নিজের আগ্রহে, নিজের চেতনায়, আবেগে মুসলিম হতে আসেন, তখন আমরা অনেকে বাঁধা দিই। অনেকে উদার হতে চাই, অনেকে ভয়ে...। আসলে, প্রথম কথা হল, আপনি যদি কোনো একজন মানুষের ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হন, তাহলে ওই ব্যক্তির জীবনের গুনাহ-পাপ কুফরের দায়ভার আপনার ঘাড়ে চাপবে। দ্বিতীয় বিষয় হল, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ

যদি তোমার কারণে, তোমার হাতে, তোমার ওয়াসীলায়, তোমার মাধ্যমে একটা মানুষও আল্লাহর দীন লাভ করে, হিদায়াত পায়; এটা তোমার দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নিয়ামত বলে গণ্য হবে।[২] কাজেই আপনি, যদি এরকম অবস্থা থাকে, আপনার বেশি কিছু

---

[১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৩৪৬১; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২৬৬৯
[২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৩৭০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৪০৬

দরকার নেই; যদি প্রাপ্তবয়স্ক কেউ হয়, বলে মুসলিম হব, আপনি সঙ্গে সঙ্গে কালিমা পড়িয়ে দেন। কোনো দেরি করার দরকার নেই। ইসলাম গ্রহণ করতে কোনো এফিডেফিট শর্ত নয়, কোনো মাওলানা সাহেব শর্ত নয়, কোনো ব্যাপটাইজ করা শর্ত নয়, কিছুই শর্ত নয়। ওই ব্যক্তি শুধু নিজের ভেতরে আল্লাহর কাছে সাক্ষী দেবে যে, ঈমান গ্রহণ করেছে। কাজেই আপনি তাকে কালিমাটা বলে দেন, সে পড়ে নিক– সে মুসলিম হয়ে গেছে। ওই মুহূর্তেই দেন, এক মিনিটও দেরি করবেন না। কারণ পরের মুহূর্তে সে মারা যেতে পারে। সে ঈমানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে, আপনি বললেন, তিনদিন পর এফিডেফিট করো এসো। আপনি কালিমা পড়ালেন না, সে মারা গেল, তার কুফরির দায়ভার আপনার ঘাড়ে... । কাজেই সে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, সুস্থ মানুষ, মুসলিম হবে, আপনি কালিমা পড়িয়ে দেন। বাকি এফিডেফিট অন্যান্য দায়িত্ব সে নিজেই করতে পারবে। (উপস্থাপক: অনেকে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য ...) অনেকেই ইসলাম গ্রহণকে দুনিয়াবি উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারে; এক্ষেত্রে আমরা, যিনি ইসলাম গ্রহণের আবেগ প্রকাশ করবেন, তাকে মুসলিম বানিয়ে দেব। এরপর তাকে আমরা নেক সোহবত দেওয়ার চেষ্টা করব। তিনি যদি দুনিয়ার আগ্রহে করেও থাকেন, হয়তো ভালো হয়ে যাবেন। তবে আমরা কারো দ্বারা প্রতারিত হব না। অর্থাৎ একজন এসে বলল, আমি নতুন মুসলিম হয়েছি, তাকে আমরা সবকিছু দিয়ে দিতে লাগলাম, এরকম নয়। আমরা তাকে ঈমানের পথে সহযোগিতা করব, ঈমানের মযবুত হলে দুনিয়াবি ব্যাপারেও সহযোগিতা করব।

<u>প্রশ্ন-০২:</u> কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায় দেখেছি লেখা আছে, 'যারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেককাজ করিয়াছে, তারা বেহেশতের উদ্যানসমূহে থাকিবে'। এই নেককাজ এবং ঈমান বিষয়ে একটু বলবেন, আমাদের ঈমান এবং নেককাজ সেই

অনুযায়ী হচ্ছে কিনা?

উত্তরঃ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা যদি মানদণ্ড না জানি, তাহলে অনেক দৌড়াব, কিন্তু ফল পাব না। এখানে ঈমান এবং আমল ঠিক আছে কিনা, এটার জন্য আল্লাহ মানদণ্ড দিয়েছেন। সেটা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। কাজেই আমাদের ঈমান, আমাদের নেককর্ম যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতমতো হয়, তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে আল্লাহর কাছে কবুল হচ্ছে। আর যদি আমরা অনেক নেকআমল করি, আর সেটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতমতো না হয়, তাহলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, এটা আমাদের যতো ভালো লাগুক, যতো আমাদের অন্তরে কান্না আসুক, চোখে পানি আসুক, আবেগ আসুক, স্বপ্ন হোক, কাশ্‌ফ হোক, যতোকিছুই হোক না কেন, এগুলো সব দুনিয়ার ফল। আখিরাতে এর কোনো ফল আমরা পাব না। এটা প্রথম একটা মূলনীতি। দ্বিতীয়ত, আমরা যতো নেক আমল করি, ঈমান কবুল হওয়ার জন্য দুটো দিক আছে– ঈমান বিল্লাহ, তাওহীদ। আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আরেকটা হল, ঈমান বির-রিসালাহ। (আল্লাহর) রিসালাতে বিশ্বাস করা। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' তিনি যে আল্লাহর রাসূল, শেষ রাসূল, এটা বিশ্বাস করা। আল্লাহর ঈমান accepted (গৃহীত) হবে না যদি শিরক থাকে। আল্লাহর সাথে শিরক করলে যতোই আমরা নিজেদের ঈমানদার মনে করি, সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা আল্লাহ কুরআন কারীমে সূরা ইউসুফের শেষে বলেছেনঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে, আমলে সালিহ করে, অর্থাৎ ঈমানদার;

কিন্তু তারা শিরকে লিপ্ত থাকে[৩]। আর শিরক-লিপ্ত ঈমান আল্লাহ গ্রহণ করেন না। কুরআন কারীমে বারবার বলা হয়েছে। রিসালাতের ঈমানেও শিরক আছে। রিসালাতের ঈমানে শিরককে বলা হয় বিদআত। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাত ভালো লাগে না, অন্য কোনো মানুষের সুন্নাত, রীতি-পদ্ধতি ভালো লাগে। নবীজির সুন্নাতের চেয়ে অন্যদের তরীকা পদ্ধতি আমার কাছে বেশি প্রিয় মনে হয়। অথবা নবীজির সুন্নাতটা অপূর্ণ মনে হয় যে, নবীজি (ﷺ) যেভাবে নামাযটা পড়েছেন, রোযাটা রেখেছেন, যিক্‌রটা করেছেন, টুপিটা পরেছেন, পাগড়ি পরেছেন, পরিবার চালিয়েছেন, মুআমালাত করেছেন, ঠিক ওইভাবে না করে আরেকটু অন্যরকম করলে আমার সাওয়াব-বরকত বেশি হবে– মনের ভেতরের এই আবেগ অস্থিরতা– এটাকে বলা হয় শিরক ফিন-নুবুওয়াহ বা বিদআত। তো এই শিরক এবং বিদআত বর্জন না করলে ঈমানটা সহীহ হয় না। আর নেকআমল কবুল হওয়ার শর্ত হল, ইখলাসুত তাওহীদ। ঈমানের প্রথম অংশটা ঠিক রাখতে হবে। অর্থাৎ আমার আমলে সালিহটা একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য হতে হবে। এটাকে বলা হয়, ইখলাসুত তাওহীদ। তাওহীদকে বিশুদ্ধ করা। এজন্য আল্লাহ ঈমান বলে আমল বলেছেন। আমি আমলটা কাকে খুশি করতে করব? কেন করব? যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য না হয়ে এর ভেতরে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে, এই আমল কবুল হয় না। দুই নাম্বার শর্ত হল, ইখলাসুর রিসালাহ। ইত্তিবাহ। আমার ইত্তিবাটা ঢ়ৎব (খাঁটি) হতে হবে, অর্থাৎ আমার আমলটা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পদ্ধতিতে হতে হবে। আমি যদি আল্লাহকে খুশি করার জন্য সারারাত যিক্‌র করি, ইবাদত করি, জনকল্যাণ করি, যদি সেটা নবীজির তরীকায় না হয়, তাহলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে এটা কবুল হবে না। তিন নাম্বার হল, হালাল মাল খাওয়া। হালাল মালের উপার্জন ছাড়া আল্লাহ সেই ইবাদত কবুল করেন না। এই জাতীয়

[৩] সূরা: ইউসূফ, আয়াত: ১০৬

আরো কিছু শর্ত আছে। এগুলো আমরা আশা করি, কুরআন-হাদীসের আলোকে আলিমদের লেখনীর আলোকে দেখে নেব, ইনশাআল্লাহ।

<u>প্রশ্ন-০৩:</u> বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তাদের চিন্তাচেতনা কাজকর্ম আখিরাতমুখী না হয়ে দুনিয়ামুখী হচ্ছে। কেন হচ্ছে? কীভাবে আমরা প্রকৃত মুসলিম হতে পারব?

<u>উত্তর:</u> এখানে দুটো বিষয় রয়েছে। প্রথম বিষয় হল, মানবীয় প্রকৃতি। ছাত্ররা যখন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়, সবাই জানে বছর শেষে পরীক্ষা-রেজাল্ট; এর উপরেই আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কিন্তু দেখা যায়, একশ জনের মধ্যে দশজন ছাত্র ভবিষ্যতের চিন্তায় লেখাপড়া করে। বাকিরা কী করে– পরীক্ষা তো আসবে, আসুক, সময় হোক, এখন খেলাধুলা করি। সবাই জানে যে পরীক্ষার জন্য পড়তে হবে। পড়ে কিন্তু কম মানুষ। এটা আমাদের মানবীয় প্রকৃতির দুর্বলতা। আখিরাতমুখিতার ক্ষেত্রেও একই বিষয়। দ্বিতীয় যে বিষয়টা, এই যে মানবীয় দুর্বলতা দূর করার জন্য, সচেতনতা তৈরির জন্য, শক্তি অর্জনের জন্য, যে কর্মগুলো করা দরকার, সেটা আমরা করছি না। দুর্ভাগ্য! বর্তমান যে সভ্যতা বা আধুনিকতা বা আন্তর্জাতিক বিশ্ব– সবাই দুনিয়ামুখী। এমনকি আমরা যারা ধর্ম পালন করি বা ধার্মিক বলে মনে করি তারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়ামুখী। আমরা নামায পড়ি, চিন্তা করি নামাযটা সুস্থতা আনবে! রোযা রাখি, রোযা আলসার সারাবে– এই ধরনের চিন্তা মনে থাকে। এটা আমাদের বড় পরাজয়, বড় ক্ষতি। মুমিনের মূল চেতনা যদি আখিরাতমুখী না হয়, দুনিয়ার মজাটাই থাকে না। যদি মানুষের আখিরাতমুখী জীবনের চিন্তা না থাকে যে, আমি আখিরাত পাব, আল্লাহর সাক্ষাত পাব, অনন্ত জীবন লাভ করব, সেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহচর্য পাব; এই অনুভূতি না থাকলে আমাদের জীবনটা অর্থহীন পশুর মতো হয়ে যায়। এজন্য আমাদের

সবাইকেই আখিরাতমুখিতা অর্জনের জন্য ব্যস্ত হওয়া দরকার। কীভাবে? আখিরাতমুখিতা অর্জন করার জন্য, আসলে আল্লাহ তাআলা যেটা দিয়েছেন, এটাকে গ্রহণ করতে হবে। কুরআন বেশিবেশি পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বিশুদ্ধ জীবনী পড়েন। আখিরাতমুখিতা আসবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে আল্লাহ সম্পদের অভাব দিয়েছিলেন, এমন নয়। তিনি মদীনার জীবনে রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একপঞ্চমাংশ নিতে বাধ্য করেছিলেন। এটা আপনার, এটা আপনাকে নিতেই হবে। এরপরও, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তো সম্পদ পেয়েছেন মানুষের কল্যাণে বিলিয়ে দিয়েছেন। নিজে খুব স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শুয়ে ছিলেন, একটা চাটাইয়ের উপরে। উমার এসেছেন, ঘরের ভেতরে ঢুকেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উঠেছেন, চাটাইয়ের দাগে তাঁর পিঠটা লাল-লাল ঘা-ঘা মতো হয়ে গিয়েছিল। উমার কাঁদতে শুরু করেছেন; ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এতো কষ্ট করবেন? যেখানে পারস্য-রোমের বাদশারা কাফির-মুশরিক আল্লাহর অবাধ্য, তারা কতো আরাম করে; আপনি নবী! আপনি কেন কষ্ট করবেন? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে, কোনো রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নয়, আপনার টাকা থেকে নয়, আমি উমার নিজে কষ্ট করে আপনার জন্য একটা গদি বানিয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বকা দিলেন উমারকে। উমার! এই দুনিয়াতে উপভোগের জন্য আমি আসি নি। দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্কটা হল, একজন সফরকারী পথচারী, যিনি পথের ভেতরে চলতে চলতে একটা গাছতলায় থেমেছেন। এই গাছের ছায়ার সাথে পথচারীর যতোটুকু সম্পর্ক, এই পৃথিবীর সাথে আমার ততোটুকু সম্পর্ক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের খুব সুন্দর নমুনা দিয়েছেন:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

এই দুনিয়াতে তুমি এমনভাবে জীবনযাপন করবে, যেন তুমি পথিক অথবা প্রবাসী।[৪] ইসলাম আমাদের এটা বলে নি যে, আখিরাতের চিন্তায় দুনিয়া বাদ দাও। সংসার থাকবে, সমাজ থাকবে, ব্যবসা থাকবে, রাষ্ট্র থাকবে, পরিবার থাকবে; কিন্তু তুমি বুঝবে এই সবকিছুকে তোমার একদিন ছেড়ে দিতে হবে এবং এই আনন্দের চেয়ে বড় আনন্দ আখিরাতে রয়েছে। এটা অর্জন করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনী, কুরআন এবং হাদীস যতো পড়ব এবং আল্লাহ তাআলার কাছে যতো ইবাদত করব, ততো আমাদের ভেতরে এই চেতনা বাড়তে থাকবে। একজন ছাত্র যখন পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে বড় কিছু হওয়ার আশায়, তার এই কষ্টগুলো তাকে উজ্জীবিত করে। ঠিক তেমনি আখিরাতের আশায় আল্লাহর প্রেমে যখন আমরা দুনিয়ার কাজগুলো করব, পরিবারের জন্য উপার্জন করব, স্ত্রীকে সঙ্গ দেব, স্বামীর খিদমত করব, সন্তানদের নিয়ে স্কুলে যাব, আমি জানি এগুলো করছি আখিরাতের জন্য, এই চেতনা থাকলে সবকিছুর ভেতরে এমন আনন্দ পাব, যেটা আমরা জাগতিক চিন্তার ভেতরে পাই না।

প্রশ্ন-০৪: রিয্ক জন্ম মৃত্যু বিয়ে এটা fixed করা (নির্ধারিত) থাকে কিনা?

উত্তর: আসলে আল্লাহর ইলম অনাদি অনন্ত। মানুষকে আল্লাহ তাআলা তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তৈরি করেছেন। তবে আল্লাহ জানেন, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে কে কীভাবে চলবে। এই হিশেবে আল্লাহ অনাদি অনন্ত ইলমে, মানুষ কখন জন্মাবে কখন মরবে, এটা অবশ্যই আল্লাহর ইলমে আছে। এই আল্লাহর ইলমটা কী, আমরা জানি না। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব, যেটা আল্লাহর হুকুম। আমরা আল্লাহর বান্দা-চাকর

[৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৬৪১৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২৩৩৩

হিশেবে আল্লাহর হুকুমমতো চলার চেষ্টা করব। আল্লাহর ইলমে কী আছে, আমরা জানি না। আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেনঃ

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

আল্লাহ যা চান মুছে ফেলেন, যা চান রেখে দেন।[৫] আল্লাহ কী মুছেছেন, কী লিখবেন, আল্লাহর ইলমে কী কীভাবে আছে, মহান আল্লাহই ভালো জানেন। আমরা আমাদের সাধ্যমতো জীবনকে প্রলম্বিত করার চেষ্টা করব, চিকিৎসা করব। মৃত্যু আসলে মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নেব। আল্লাহ তাওফীক দান করেন।

প্রশ্ন-০৫: সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আমরা জানি। ঘুষ দিয়ে যে চাকরি হয়, এই বিষয়ের ব্যাখ্যাটা কী আসলে? এখানে তাকদীরের যে বিষয়টা আসে সেইটা...

উত্তরঃ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, এটা আসলে এরকম নয়। সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি হয়... একটু আগে *গীতা* পড়ছিলাম, অর্জুন তার ভাইদের সাথে যুদ্ধ করবেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন যুদ্ধ করতে; আত্মা তো অনন্ত, একজন মানুষ মারা গেলে কী হয়? মেরে ফেলবে, আবার জীবন নেবে, কাজেই যতো পার মারো। এই ধরনের কিছু যুদ্ধ উদ্বুদ্ধ করা...। তাই যদি হয়, তাহলে তো মানুষ মারায় কোনো অপরাধ থাকে না। সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, এটা বলে মানুষটাকে মেরে ফেললাম, আল্লাহর পক্ষ থেকে, আমার কী দোষ? এটা খুবই বাজে পর্যায়। আল্লাহ তাআলা অনাদি অনন্ত ইলমে জানেন...। আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তৈরি করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার ইচ্ছাশক্তি কীভাবে ব্যবহার করবে। মাহমুদুল হাসান তার ইচ্ছাশক্তি কীভাবে ব্যবহার করবে। এটা আল্লাহর জ্ঞান। আল্লাহ কাউকে বাধ্য

[৫] সূরাঃ রা'দ, আয়াতঃ ৩৯

করেন না। আল্লাহর অনাদি অনন্ত জ্ঞানে আছে, আবু তালিব, আবু লাহাব, আবু বাকর তিনজন মানুষ একযুগে জন্ম নেবে, এবং প্রত্যেককে আল্লাহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তৈরি করবেন। কিন্তু আবু লাহাব তার ইচ্ছাশক্তি কীভাবে ব্যবহার করবে, আবু তালিব কীভাবে করবে, আবু বাকর কীভাবে করবেন– আল্লাহ আগে থেকেই জানতেন। আল্লাহ কাউকে বাধ্য করেন নি। তারা নিজেরা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করেছে। কিন্তু কীভাবে করবেন, আল্লাহ জানতেন। এজন্য প্রত্যেকেই ইচ্ছাশক্তি ব্যবহারের কারণে পাপী বা পূণ্যবান হবেন। ঘুষ হারাম। ঘুষ নেওয়া হারাম, ঘুষ দেওয়া হারাম। (উপস্থাপক: এটা নিয়ে আমি বলতে পারব না যে, এটা তাকদীরে ছিল...!) তাহলে তো মানুষ খুন করে আমি বলতাম, আমার তাকদীরে ছিল!!

প্রশ্ন-০৬: আমার মা অসুস্থ হয়ে গেলে, মিটফোর্ড হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা গিয়েছে। তখন আমার আত্মীয়রা বলছে, বারডেমে নিলে ভালো হত। এটা কেমন? কুরআন-হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: আসলে খুবই দুঃখজনক, এ কথাগুলো কঠিন হারাম কথা, ঈমানবিধ্বংসী কথা। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ

'তোমার জন্য যেটা কল্যাণকর সেটা অর্জন করার চেষ্টা করো'।

وَلَا تَعْجَزْ

'অক্ষম হোয়ো না, হতাশ হোয়ো না'।

...فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ

'যদি আশানুরূপ নয় এমন বিপদে পতিত হও, তুমি যেটা চাও

সেটা হয় নি, যেমন আপনি আপনার মায়ের সুস্থতা চেয়েছিলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করুন।

فَلَا تَقُلْ لَوْ

খবরদার একথা বোলো না, যদি এটা করতাম তাহলে ওইটা হত, যদি এটা না করতাম তাহলে ওইটা হত'

فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ أَبْوَابَ الشَّيْطَانِ

'অন্তরের দরজা খুলে দেয়, শয়তান ঢুকে আত্মসাত শুরু করে, শুধু আফসোস আর হতাশা, যা হারাম যা ঈমান নষ্ট করে'। আপনার আম্মা মৃত্যুবরণ করেছেন, এটার অর্থই হল, আপনি কোথাও নেবেন না, মিটফোর্ডে নেবেন। আল্লাহ তার ওফাত দেবেন, এটা আপনি জেনে গেছেন। ঘটনা ঘটার আগে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব, ঘটনা ঘটার পর সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ছেড়ে দেব। কী বলব, এটাও আল্লাহর রাসূল (ﷺ) শিখিয়েছেন,

قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

আল্লাহ যেটা চেয়েছেন, করেছেন, আমি সেই আল্লাহর ফয়সালাতে রাজি আছি। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব, কিন্তু ফল পাওয়ার পর আর হতাশ হব না। দুশ্চিন্তা করব না। 'এইটা করলে এইটা হত, এইটা না করলে এইটা হত' এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। এগুলো বলাও হারাম। শয়তানের দরজা খোলে, আমাদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। অশান্তি আসে, হতাশা আসে। এগুলোও হারাম। কাজেই, আমরা এসব গুনাহ থেকে তাওবা করি। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের কর্ম করতে বলেছেন, ঘটনা ঘটার আগ পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করতে বলেছেন। যদি ফলাফল আশানুরূপ না হয়, আমরা হতাশ না হই। আমরা এসব না বলি যে, 'এটা না করলে এটা হত। এটা করে হয়ত এটা হয়ে গেল' এর মাধ্যমে শয়তানের দরজা

খুলবে, আর কোনো লাভ হবে না। আমরা বলব, 'আল্লাহ যেটা চেয়েছেন, সেটা হয়েছে'। আমি পরবর্তী যেটুকু করা যায় চেষ্টা করব।[৬]

প্রশ্ন-০৭: আমি একটা বিষয় জানতে চাই, কুরআন শরীফে আমি নিজে পড়ি নাই, কিন্তু শুনেছি, 'আত্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের পুঞ্জি'– এই কথাটা নাকি আছে। আরেকটা কথা, পীর সাহেবরা বলেন, নামায-রোযা সবকিছুই ব্যর্থ হয়, যদি আত্মজ্ঞান না হয়। ...আত্মা যদি আমাদের পরিষ্কার হয়, তাহলে আত্মা আমাদের সৎকর্মে সাহায্য করবে।

উত্তর: আত্মজ্ঞানে যা বলা হয়, মিথ্যা কথা বলা হয়। আপনি প্রশ্ন করেছেন, কুরআনে আত্মজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। কুরআনে কোথাও আত্মজ্ঞানের কথা নেই। একটা মিথ্যা হাদীস আমাদের সমাজে প্রচলিত:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

যে আত্মজ্ঞান অর্জন করল, সে তার রবকে চিনল।[৭] এটা মিথ্যা কথা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এটা কখনো বলেন নি। মা'রিফাত বা আত্মজ্ঞানের কোনো গুরুত্ব ইসলামে বলা হয় নি। বরং মা'রিফাতের পরেও মানুষ কাফির হয়, এটা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا

[তারা অন্যায়ভাবে সেগুলোকে (আয়াতসমূহকে) প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর তা সত্য বলে নিশ্চিত হয়েছিল।][৮]

---

[৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬৬৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৭৯

[৭] আলবানি, সিলসিলা যয়ীফা ১/১৬৫-১৬৬, হাদীস নং-৬৬

[৮] সূরা: নাম্‌ল, আয়াত: ১৪

তারা মা'রিফাতের পরেও, জ্ঞানের পরেও কুফরি করেছে। কাজেই মা'রিফাতের পরেও মানুষ...

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহর নিআমতের মা'রিফাতের পরেও তারা ইনকার (অস্বীকার) করে।[৯] কাজেই মা'রিফাত বা আত্মজ্ঞানকে ইসলামে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এ ব্যাপারে যা বলা হয়, সবই বানোয়াট কথা। আত্মজ্ঞানের যদি কোনো গুরুত্ব থাকে, তাহলে তো তা আসবে কুরআন থেকে। আত্মজ্ঞানের নামে মিথ্যা-জ্ঞান, কুরআন-সুন্নাহর বাইরের জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বলা আত্মহত্যার শামিল। কুরআন কারীমে আল্লাহ্ অন্য একটা কথা বলেছেন, আত্মজ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায় না, আল্লাহকে চিনলেই নিজেকে চেনা যায়।

نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

যারা আল্লাহকে ভুলে যাবে, আল্লাহ তাদেরকে নিজের কথা ভুলিয়ে দেবেন।[১০] اللهُ أَعْلَمُ

<u>প্রশ্ন-০৮:</u> আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে, কাদিয়ানিদের বিশ্বাসটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? আমরা যারা কুরআন-হাদীসের আলোকে জীবনযাপন করতে চাই, তাদের সাথে আমাদের ব্যবহারটা কী রকম হবে?

<u>উত্তর:</u> কাদিয়ানিদের ব্যাপারে আমাদের চেতনা হবে– যেমন একজন হিন্দু ভাইয়ের প্রতি আমাদের চেতনা, আমার পড়শি খ্রিস্টানদের ব্যাপারে চেতনা। কাদিয়ানিরা সন্দেহাতীতভাবে অমুসলিম। ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা একটা ধর্মগ্রন্থ মানেন, সকল

[৯] সূরা: নাহ্‌ল, আয়াত: ৮৩
[১০] সূরা: হাশ্‌র, আয়াত: ১৯

পয়গাম্বরকে মানেন। পার্থক্য হল, ইহুদিরা বিশ্বাস করেন, তাদের পয়গাম্বর শেষ হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন, তাদের (ইহুদিদের) পয়গাম্বরগুলোর পরে ঈসা পয়গাম্বর এসেছেন। তিনিও পয়গাম্বর। এই অতিরিক্ত বিশ্বাসের কারণেই তাদের ধর্মটা ভিন্ন হয়ে গেছে। তাদের এক গ্রন্থ, এক বিশ্বাস, এক চেতনা, এক ঐতিহ্য; কিন্তু ধর্ম এক নয়। কাদিয়ানিরা বিশ্বাস করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পরে নবী আসবেন। এবং গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি ওহিপ্রাপ্ত নবী ছিলেন। তাকে নবী হিশেবে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ। কাজেই তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মানেন, ঈসাকে মানেন, মূসাকে মানেন; কিন্তু তারা মুসলিম নন। কারণ আমাদের বিশ্বাস হল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শেষ নবী; তাঁর পরে কোনো নবী নেই। এটা কুরআনে আল্লাহ বলেছেন। হাদীস শরীফে অন্তত সত্তরটা হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্পষ্ট বলেছেন যে, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। এখানে আরেকটা বিষয় আমাদের বুঝতে হবে, প্রত্যেক নবী... যেমন ঈসা আ., এই প্রচলিত বাইবেলেই আছে, বারবার বলেছেন, আমার পরে (নবী) আসবে। তিনি বলে গেছেন, It is expedient for you that I go away ... but if I depart[11]... তোমাদের জন্য এটাই উত্তম যে, আমি চলে যাই। আমি না গেলে সেই comforter (মুক্তিদাতা) আর আসবেন না। প্রত্যেক নবী বলেছেন, আমার পরে কেউ আসবে। ব্যতিক্রম রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আমার পরে আসবেন বলেন নি, বরং বলেছেন, আমার পরে আসবেন না। এবং এটা মু'জিযা। যে বনি ইসরাঈল ইহুদি জাতির মধ্যে নবী আসতেই ছিল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পরে তাদের ভেতরে আর কেউ নবী দাবি করেন নি। শুধু মুসলিমদের ভেতরে ভণ্ড প্রতারকরা বারবার...। এটাও তিনি বলেছেন, অনেক ভণ্ড প্রতারক নবুওত দাবি করবে। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি,

---

[১১] Gospel of John ১৬:৭

প্রথমে তিনি দাবি করলেন, তিনি ওলি-আল্লাহ, বুজুর্গ, সাহিবে কাশ্‌ফ। এরপর তিনি দাবি করলেন যে, তিনি মুজাদ্দিদে যামান, মুজাদ্দিদে আযম সবচে' বড় মুজাদ্দিদ। এরপর দাবি করলেন, ইমাম মাহদি। এরপর দাবি করলেন তিনি ঈসা মসীহ। এরপর তিনি দাবি করলেন, তিনি পয়গাম্বর!! এবং তার কাছে ওহি আসে। হয়তো আর কিছুদিন হায়াত পেলে, তিনি দাবি করতেন তিনি আল্লাহ!!! এটাও তিনি মাঝেমাঝে দাবি করেছেন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। যাই হোক, তার দাবির শেষ নেই। কাদিয়ানিরা আমাদের প্রতিবেশী অমুসলিম ভাই। 'কাদিয়ানি'! কাজেই তাকে হামলা করব! না...। আমরা মুসলিমরা সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল। কাদিয়ানিদের প্রতি একটাই আমাদের আপত্তি, তারা তাদেরকে প্রতারণামূলকভাবে মুসলিম দাবি করেন। যেমন আমরা ঈসা আ.কে মানি, কিন্তু ইউরোপে গিয়ে যদি বলি আমরা খ্রিস্টান, সেটা তো হবে না। যেহেতু তাঁর পরে আমরা আরেকজনকে পয়গাম্বর মানি, এবং তাঁকেই মূল মানি... কাজেই আমরা মুসলিম। আমরা যদি বলি– যেহেতু আমরা ঈসা নবী মানি, মূসা নবী মানি– কাজেই আমরা খ্রিস্টান অথবা আমরা ইহুদি। এটা প্রতারণা হবে। কোনো খ্রিস্টান যদি বলেন, আমি মূসাকে মানি, আমি বাইবেল মানি, আমি ওল্ড টেস্টামেন্ট মানি, কাজেই আমি লবরিংয (ইহুদি সম্পর্কিত) অধিকারগুলো পাব, এটা ঠিক না, এটা প্রতারণা হবে। ঠিক কাদিয়ানিদের জন্য মুসলিম দাবি করা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পরে একজনকে নবী মেনেছেন। মানুন, সেই নবীর অনুসরণ করুন। বলুন, আমরা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির উম্মত। আমরা আরেকটা নতুন সম্প্রদায়। তাদের প্রতি আমাদের চেতনা হবে, তারা অমুসলিম একটা সম্প্রদায়। তারা আমাদের আশেপাশে আছেন, মানুষ হিশেবে তাদের হক আমরা দেব। প্রতিবেশী হিশেবে আমরা হক দেব। তবে তাদের মুসলিম দাবির প্রতি

আমাদের প্রচণ্ড আপত্তি রয়েছে। কেউ যদি মনে করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পরেও কেউ ওহি পেয়েছেন, ওহি পেতে পারেন, এই বিশ্বাসধারী মুসলিম এই বিশ্বাসের জন্য কাফির হয়ে যাবেন। তিনি কুরআনকে ইনকার করবেন। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

[মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।][১২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শেষ নবী। কাদিয়ানিরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেন, আসলে সব প্রতারকই ব্যাখ্যা দেন, সব ভণ্ডই ব্যাখ্যা দেন। আমরা ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে (ধোঁকাগ্রস্থ হবনা)। তাদের ধর্ম তাদের, আমাদের ধর্ম আমাদের। তাদের মুসলিম দাবি অত্যন্ত বড় প্রতারণা। আর কেউ যদি তাদের মনে করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পরেও একজন ওহি পাবেন, নবী আসবেন, এগুলো বিশ্বাস করার পরও কেউ মুসলিম থাকে, তাহলে ওই ব্যক্তিও অমুসলিম হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-০৯: আমার একটা রোগের জন্য অন্য একজনের কাছ একটা তাবীয নিয়েছি। নয়টা গাছের শিকড় ঢুকিয়ে তাবীযে মোড়ানো হয়েছে। এইটাতে আমি উপকার পেয়েছি। তাবীয দেওয়াতে আমার কোনো পাপ হবে কিনা?

উত্তর: প্রথম কথা হল, আপনারা অনেক শুনেছেন, অনেক সহীহ হাদীস, কয়েক ডজন সহীহ হাদীসে, তাবীযকে শিরক বলা হয়েছে। তাবীয ব্যবহার করলে বদদুআ' করা হয়েছে।

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ

---

[১২] সূরা: আহযাব, আয়াত: ৪০

[যে তাবীয ঝুলাল, আল্লাহ্ তার (মনোবাঞ্ছা) পূরণ না করুন ।][১৩]

সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে কেউ তাবীয ব্যবহার করেছেন, এটা নেই। কিন্তু ছিড়েছেন, এমন হাদীস কয়েক ডজন আছে যে সাহাবিরা তাবীয দেখলে ছিড়ে ফেলতেন, এটা কুরআনের আয়াতের তাবীয নাকি অন্য, এটা কখনো বিচার করেন নি। তাই কুরআনের আয়াত দিয়ে ঝাড়ফুঁক, এটা পছন্দ করতেন, এটা হাদীস শরীফে অনুমোদন আছে। কিন্তু লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া, এটা তারা শিরক মনে করতেন। পরবর্তী যুগে অনেক আলিম কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবীয লেখা, ব্যবহার জায়িয বলেছেন বিভিন্ন যুক্তিতে। তবে দুটো ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত রয়েছে। দাগ দিয়ে তাবীয করা সম্পূর্ণ শিরক। আরেকটা গাছগাছড়া কবিরাজি যেগুলো করা হয়। গাছগাছড়া আপনি ব্যবহার করতে পারেন ওষুধ হিশেবে খাওয়ার জন্য, কিন্তু এই গাছগাছড়া দিয়ে তাবীয করা, বিশেষ করে যে গাছগাছড়ার বলা হয়, '...শনিবারে অমাবস্যা সাতটা গাছ...' এসব যাদু! এটা ওষুধ হলে শনিবার অমাবস্যা লাগে না। এটা আপনারা সহজেই বোঝেন। এজন্য এগুলো ব্যবহার করবেন না। উপকারের বিষয়টা ভিন্ন, উপকার হতেও পারে নাও পারে! অনেক হারামের ভেতরেও জাগতিক উপকার থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে উপকারটা মানসিক হতে পারে। আমরা কখনো এই জাগতিক সামান্য উপকারকে পাওয়ার জন্য ঈমানকে নষ্ট করব না। আপনারা চেষ্টা করবেন, সুন্নাত মুতাবিক দুআ-আমল করার। আমি গতকালও বলেছি, সুন্নাতের ভেতরে যে অলৌকিকতা আছে, এটা অভাবনীয়। আপনি সুন্নাত আমল করেন। আপনারা আল্লাহর কাছে দুআ করবেন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর হবে, মজা লাগবে, ইনশাআল্লাহ। আপনার যে সমস্যা আছে, দূর হবে। আর চিকিৎসা করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চিকিৎসাতে

[১৩] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৭৪০৪; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-৬০৮৬

উৎসাহ দিয়েছেন ।

<u>প্রশ্ন-১০:</u> আমার বাবা পীরভক্ত । প্রতিবছর পীরের ওফাত দিবসে, আমাকে একটা করে খাসি দেওয়ার জন্য বলেছে । সামনে পীরের ওফাত দিবসে খাসির জন্য টাকা চেয়েছে । তো আমি এই বিষয়ে, আপনাদের কাছে মতামত জানতে চাচ্ছি যে, এটা দেওয়া..., অথবা আমার বাবা আবার মনোক্ষুণ্ন হলে সমস্যা– এইরকম আর কি । আমি আপনাদের কাছে ডিসিশনের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি ।

<u>উত্তর:</u> খুবই দুঃখজনক! আসলে পীরভক্ত হওয়া একটা পর্যায়; আমরা যেটা পীরের নামে শিরক-কুফর-বিদআত-ইলহাদ...; আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হিফাযত করুন। এই যে মৃত্যু দিবসে, মানবতার সবচে' বড় পীর, বড় মুরশিদ মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং মানবতার সবচেয়ে পীরভক্ত মুরীদ সাহাবায়ে কিরাম (রাদিআল্লাহু আজমাঈন)। আমরা যদি একটু সচেতন হতাম, আমাদের মডেল রাসূল (ﷺ) ও সাহাবায়ে কিরামকে ধরতাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তিকালে কোনো সাহাবি, তাঁর মৃত্যু দিবস পালন করেননি। ফাতিমা, আলী, হাসান, হুসাইন তাঁরা একবারও ওফাত দিবস পালন করেননি। ছাগল-গরু কালেকশনও করেননি, নিজেরাও দেননি। এই যে ওফাত দিবসে ওরস করা, মৃত্যু দিবস পালন করা, এগুলো সব ভয়ঙ্কর রকমের বিদআ'ত। যেটা আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে। আমরা যদি আল্লাহর কবুলিয়াত চাই, তাহলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতের পথে চলতে হবে। এখন আপনার জন্য দ্বিমুখি সমস্যা। পিতার হুকুম নির্দেশ পালন করা, তার প্রতি ভালো ব্যবহার করা দায়িত্ব। আপনি আপনার পিতাকে বোঝাবেন যে, দেখেন, আপনি এই যেটা চাচ্ছেন এটা গুনাহের কাজ। আমি আপনাকে গুনাহের কাজে সাহায্য করব না। আপনি টাকা চাইলে হাদিয়া দেব, এটা আপনি ছাগল কিনবেন, না গরু কিনবেন, না জুয়া খেলবেন, না

সিনেমা দেখবেন– এটার গুনাহ্ আপনার ভেতরে রাখেন। আমি আপনাকে হাদিয়া দেব। আপনার সাধ্য থাকলে, তাকে হাদিয়া দেবেন। আব্বা টাকা পয়সা চাইলে হাদিয়া দেওয়া আমাদের সাধ্যের ভেতরে আমাদের জন্য দায়িত্ব হয়ে যায় এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করা, তিনি অন্যায় করলেও, এমনকি পিতামাতা কাফির হলেও, তাদের সাথে বেআদবি করার হুকুম নেই। আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

[যদি তারা (পিতামাতা) তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না।]

আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন:

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

[আর দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে][১৪]

দুনিয়াতে ভালো ব্যবহার করতে হবে, পিতামাতা কাফির হলেও। এজন্য আমরা পিতামাতার অন্যায় বলতে পারব– 'এটা আপনি অন্যায় করছেন', কিন্তু আমরা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করতে পারব না। পিতামাতাকে বোঝানোর চেষ্টা করব। না হলে, তাদের গুনাহ্ তাদের। আর তাদের আপনি ছাগল কিনে কখনোই দেবেন না। আপনি তার হাদিয়া হিশেবে টাকা দিতে পারেন। আপনি বারবারই বোঝাবেন যে, 'এটা গুনাহের কাজ করছেন। তোমার পীরের নামেই এটাকে মসজিদে দিয়ে দাও, তোমার পীর সাদাকায়ে জারিয়ার সাওয়াব পাবে'।

<u>প্রশ্ন-১১:</u> আমাদের দেশে যে ...পীর সাহেব আছেন, ওরা যে

[১৪] সূরা: লুকমান, আয়াত: ১৫

কথাটা বলেছে যে, পীরের মাধ্যমে না হলে ইবাদত-বন্দেগি আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। দুইটা থানার লোক একই ধরনের কথা বলছে, আপনারা যেভাবে বলছেন, খুব সুন্দর পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু এই পরামর্শ তারা মানছে না। চ্যানেল আই এটা প্রচারণা করে। জাহাঙ্গীর সাহেবের মতো একজন বড় আলিম, আপনারা এটা নিয়ে বসে সমাধান করতে পারছেন না? আমি এই ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছি।

উত্তর: এটা শিরকি কথা। পীর উস্তাদ। পীরের কাছে গিয়ে শিখতে হয়। কয়েকটা ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে আছে। পীর– যদি মনে করেন, নেককার আলিমের সোহবতে গিয়ে দীন শেখার আবেগ পাব– এটা শরীআতসম্মত সুন্নাতসম্মত বিষয়। আর যদি কেউ মনে করে, পীর ধরা ফরয! এটা শরীআতবিরোধী কথা। ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি, মুজাদ্দিদে আলফে সানি, সাইয়িদ আহমাদ বেরেলবি সবাই লিখেছেন, পীর ধরা ফরয ওয়াজিব কিছুই নয়। এটা সুন্নাহসম্মত মুসতাহাব আমল। তৃতীয়ত, যদি কেউ মনে করে, পীরের মাধ্যমে না গেলে কোনো ইবাদত হবে না, আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ইবাদত করবে নবীর তরীকায়। কিন্তু 'আল্লাহ ততোক্ষণ ওটা নেবেন না, (যতোক্ষণ না) আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের মাধ্যমে যাবে', এটা একটা শিরকি চেতনা। আল্লাহ তাআলা আমাদের হিফাযত করুন।

প্রশ্ন-১২: আমার শ্বশুর বাগেরহাটের ফকিরহাটে এক আউলিয়ার মুরীদ হয়েছেন। উনারা হারমোনিয়াম দিয়ে গান-বাজনা করেন। আমি বলি এগুলো সঠিক না। উনি বিশ্বাস করতে চান না। উনি ওলি-আল্লাহয় বিশ্বাস করেন বেশি। এখন কী করব?

উত্তর: আমরা বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলিম; দুর্ভাগ্য যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্য দুইটি ভুলে গেছি।

আমরা ইবাদত করব, একমাত্র আল্লাহর। এবং সেই ইবাদতটা করব একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পদ্ধতিতে। এখন যদি কেউ নিজেই প্রতারিত হতে চায়, পকেটের পয়সা খরচ করে, ঈমান খরচ করে, নিজেকে জাহান্নামি করে, তাকে ঠেকাবেন কী করে? বাজারে প্রতারকের অভাব নেই। কোটিকোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি ইচ্ছে করে পকেটের টাকা দিয়ে যায়, আমরা কী করতে পারি? বিষয়টা হল ভাই, আপনার শ্বশুরের যে সমস্যা– আমাদের মূলত পীর একজনই, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। আমরা তাঁর তরীকায় আল্লাহর ইবাদত করব। বাকি যতো পীর-মাশায়িখ, তাদের দায়িত্ব হল মুকাব্বির হওয়া। যেমন একটা বড় জামাআতে ইমাম একজন থাকেন, মুকাব্বির থাকেন, যারা ইমামের তাকবীরকে মুসল্লিদের কাছে পৌঁছে দেন। আমাদের যতো পীর-মাশায়িখ, তারা মূলত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাত আমাদের কাছে পৌঁছাবেন। আমরা ন্যূনতম জ্ঞান থাকলে বুঝতাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাহাবিদের নিয়ে গানবাজনা করেন নি। কাজেই যে গানবাজনা করে, সে আর যায় হোক পীর হতে পারে না। গানবাজনা করা আর যাই হোক, ইবাদত হতে পারে না। এই ন্যূনতম জ্ঞান যদি আমাদের না থাকে, তাহলে আমরা প্রতারিত হবই। এই ধরনের পীরের কাছে যাওয়া, পীরকে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে মধ্যস্থ মনে করা, পীরের কারণে শরীআতবিরোধী কিছু করা, এইগুলোর মাধ্যমে ঈমানহারা কাফির-মুশরিক হয়ে যাবে। আমি দীন পালন করি, দীনটা আরও ভালো করে শেখার জন্য, কোনো নেককার মানুষ, যে পরিপূর্ণ নবীর সুন্নাতের উপর চলে, শরীআতের উপর চলে, এমন ব্যক্তির কাছে সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এর বাইরে কিছু নয়। কাজেই আপনার শ্বশুর প্রতারিত হয়েছেন। আপনার শ্বশুরের মতো লক্ষ-কোটি মানুষ প্রত্যেক দিন প্রতারিত হচ্ছেন। তাদেরকে নানানভাবে বলা হয়, আল্লাহর কাছে যেতে হলে ওয়াসীলা লাগে। ওয়াসীলা শব্দটার মিথ্যা অপব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনের

ভাষায় ওয়াসীলা অর্থ নৈকট্য! নিজের নেকআমল। আমরা এটার অর্থ করি মধ্যস্থ বা মিডিয়া। এই ব্যক্তি যে আল্লাহর মিডিয়া, এই ব্যক্তি যে আল্লাহর ওলি, এটা কে বলেছে আমাকে? কোনো সাক্ষী নেই। আমি জানি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। নিশ্চিত। আর এই যে আব্দুস সালাম, আবুল কালাম, আব্দুর রহীম– এই ব্যক্তি, যাকে আমি ওলি বলছি, এ আল্লাহর ওলি না শয়তান, মুনাফিক না কাফির, কিছুই জানি না। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, ঈমান এবং তাকওয়া হল বেলায়াত। দুটোই ভেতরে থাকে, বাইরে দেখা যায় না। আমরা ধারণা করি, যার ঈমান-তাকওয়ার আলামত আছে, তাকে ওলি বলি, ভক্তি করি। কিন্তু প্রতারিত না হই। আল্লাহ তাআলা হিফাযত করুন।

প্রশ্ন-১৩: গত কয়েকদিন আগে, মাই টিভিতে একজন ভণ্ড, কাফির-মুশরিকের উত্তরসূরি বলেছে, মাযারে নাকি সিজদা করা জায়িয! এরপক্ষে নাকি হাদীস আছে! এরকম কোনো হাদীস আছে কি না?

উত্তরঃ আসলে জালিয়াতির তো কোনো শেষ নেই। এজন্য প্রথম যেটা বলব, আমরা মানুষ; আমাদের ভুল হতে পারে। সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমরা সঠিকভাবে নাও দিতে পারি। তবে আমাদের প্রথম যেটা বুঝতে হবে, আমরা সবাই আমাদের কবরে যাব, অন্য কেউ যাবেননা। কবরে যাওয়ার পরে যদি আমরা বলি ফেরেশতাদেরকে, আমরা বুঝতে পারিনি; অমুক হুযুর টিভিতে বলেছিল, তাই করে ফেলেছি, তাহলে আপনার ওযরটা কিন্তু গ্রহণ করা হবেনা। কাজেই আপনারা তথ্যগুলো যাচাই করবেন, সদাসর্বদা যাচাই করবেন। আমরা কুরআনের আয়াত বলি, হাদীস বলি; যদি সন্দেহ হয়, তবে অন্য আলিমদের জিজ্ঞেস করবেন। যারা বলেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। আর নিজেরা নিয়মিত কুরআন পড়বেন, হাদীস পড়বেন, নিজেদের ভেতরে

রুচি তৈরি করবেন। কুরআনের নূর কলবে ঢুকাবেন। তাহলে বুঝতে পারবেন যে, কে সঠিক বলছেন, আর ভুল বলছেন। কুরআন কারীমে আল্লাহ কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

সিজদার কর্মটা একমাত্র আল্লাহর জন্য।[১৫] আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুতাওয়াতির হাদীসে, সাহাবি বিদেশে গেছেন, সিরিয়ায় গেছেন, সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, সেখানকার ইহুদি-খ্রিস্টানেরা তাদের ধর্মগুরুদের, পুরোহিতদের, ফাদারদের, বাবাদের সিজদা করে, এটাকে বলে সিজদায়ে তাহিয়্যা। এই হাদীসটা মুতাওয়াতির। অন্তত দশ-বারোজন সাহাবি থেকে বর্ণিত। মুসতাদরাক হাকিম, আবু দাউদ, তিরমিযিতে রয়েছে, অন্যান্য বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কোনো কোনো সাহাবি বিদেশে গিয়ে, পারস্যে গিয়ে, কেউ কেউ সিরিয়ায় গিয়ে, কেউ কেউ দেখেন যে সেখানের ধার্মিক মানুষেরা ধর্মগুরুদের, তাদের পীর-মাশায়িখদেরকে সিজদা করে। সাহাবিরা এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা যদি তাদের ধর্মগুরুদের সিজদা করতে পারেন, আমরা কেন আপনাকে করব না। তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেন। না, খবরদার! আমাকে সিজদা কোরো না, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করা যায় না। আমি যদি কাউকে সিজদা করতে বলতাম, যদি মানুষ মানুষকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীদের বলতাম স্বামীকে সিজদা করতে। কখনোই কোনো মানুষের জন্য সিজদাহ বৈধ নয়। রাসূল (ﷺ) মুতাওয়াতির হাদীসে বলেছেন। আমরা দীনকে বোঝার চেষ্টা করি, দীনের একটা মানদণ্ড রয়েছে। সেটা হল مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

[১৫] সূরা: জিন, আয়াত: ১৮

وَالَّذِينَ مَعَهُ: [মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ]...[১৬] । আপনারা যখনই কোনো কথা শুনবেন, ঝগড়া না করে বিচার করবেন যে, কবরের সিজদা সাহাবিরা করেছেন কিনা? কোনো সাহাবি কবরে গিয়ে সিজদা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর পূর্বপুরুষদের কবরে– ইবরাহীম, ইসমাঈলের কবরে সিজদাহ করেছেন কিনা। ... যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবিগণ ভক্তির নমুনা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তাঁরা ভক্তি করেছেন। এই ভক্তিই হল চূড়ান্ত ভক্তি। কবর-মাযার বলেন, যে কোনো জিনিসকে সিজদা করা, আল্লাহ ব্যতিত কাউকে সিজদা করা কুফর এবং শিরক। এটা আমাদের ফিকহের কিতাবগুলোকে সুস্পষ্ট রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা ভায়েরা আমরা, মাযারে যাব, যিনি আছেন, তাকে সালাম দিতে, তার জন্য দুআ করতে। আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা, চাওয়া-পাওয়া তো আল্লাহর কাছে। আমরা প্রতিদিন ৩০-৪০ বার বলছি:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই করি, চাওয়া পাওয়া (একমাত্র তাঁরই কাছে)।[১৭] মাযারে যিনি রয়েছেন, কেন তাকে সিজদা করব? মাযারবাসীকে সম্মান করতে হয় না, তার জন্য দুআ করতে হয়। আমরা সম্মান করি যে, তিনি আমাকে কিছু দেবেন। আর মাযারবাসী কিছু দিতে পারেন, এই চেতনাই শিরক। মাযারবাসী আমার কাছে পেতে চান, আমার দুআ আমার সালাম তার নেকআমল বাড়িয়ে দেবে। এজন্য মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা সুন্নাত। কবর যিয়ারত করা সুন্নত। তার কাছে কিছু চাওয়াটা শিরক।

---

[১৬] সূরা: ফাত্হ, আয়াত: ২৯

[১৭] সূরা: ফাতিহা, আয়াত: ৪

প্রশ্ন-১৪: জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে যে একটা শাখা আছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যেসব হিশাব-নিকাশ করে, গ্রহ উপগ্রহের আচরণ, তাদের পরিক্রমণ, সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় নির্ধারণ, মহাজাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্বাভাস যেমন– ধূমকেতু দেখা যাবে, কখন উল্কাপাত হবে... এসব সব মিলে যায়। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠিক আছে কিনা?

উত্তর: এখানে একটা হল জ্যোতির্বিজ্ঞান, আরেকটা জ্যোতিষিবিদ্যা। জ্যোতির্বিজ্ঞান যেটা বিজ্ঞান, এই যে গ্রহ নক্ষত্রগুলো ঘোরে এগুলোর স্টাডি করা, এর গতি নির্ণয় করা, এটার আলোকে কতো বছরে কতোবার ঘুরবে– এটা বিজ্ঞান। এটা কুরআন সমর্থন করে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার বলেছেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

[নিশ্চয় আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য][১৮]

আল্লাহ এগুলো নিয়ে চিন্তা-তাদাব্বুর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই বিজ্ঞান যেটা তথ্যভিত্তিক– ধূমকেতু কবে আসবে, চন্দ্রগ্রহণ কবে হবে, সূর্য গ্রহণ কবে হবে– এগুলো সব বিজ্ঞান। আরেকটা হল, যেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গ্রহ-নক্ষত্রের কোনো প্রভাব আছে; মানুষের ভাগ্যে, অমুক রাশিতে অমুক গ্রহ থাকলে অমুক প্রভাব হয়, এই রাশির জাতক এই। এই ভাগ্যগণনা, ভাগ্য বলা, সৃষ্টির কিছু মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, গ্রহ ধাতু বা অষ্টধাতু– এটা সম্পূর্ণ শিরক। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, একদিন রাতে বৃষ্টি হল, হুদায়বিয়ায়, রাসূল (ﷺ)

[১৮] সূরা: আল ইমরান, আয়াত: ১৯০

বললেন:

أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ

সকাল বেলায় কিছু মানুষ মুমিন, আর কিছু মানুষ কাফির হয়ে গেল। যারা বলল, অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তারা কাফির! কারণ বৃষ্টির মালিক যে আল্লাহ, এটা বলল না। আর যে বলে, আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি পেয়েছি, সে মুমিন।[১৯] কাজেই গ্রহ-নক্ষত্রের চলন নির্ণয়, ধূমকেতু ইত্যাদি (এগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞান, বৈধ); কিন্তু অমুক দিনে ধূমকেতু উঠলে ভূমিকম্প হবে, যেহেতু এই মাসে চন্দ্র সূর্যগ্রহণ লেগেছে, তাই এই এই ক্ষতি হবে, অথবা গ্রহণের সময় এইটা করলে এইটা হবে...; এগুলো সম্পূর্ণ কুসংস্কার এবং এগুলো ইসলামবিরোধী। কেউ যদি এই ধরনের শুভ-অশুভ, ভাগ্য-ভবিষ্যৎ, জ্যোতিষীদের কোনো কথা বিশ্বাস করে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

যদি কেউ কোনো জ্যোতিষী, ভাগ্যগণনাবিদ, রাশিবিদ অথবা এই ধরনের কোনো ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যায়, তার কথা বিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।[২০] তাই বিজ্ঞান আর এই ভাগ্যগণনা এক নয়। বিজ্ঞান বলতে পারে, সূর্য কতোদিনে ঘূর্ণন শেষ করতে পারে, চাঁদ কখন উঠবে, কখন ডুববে। ধূমকেতু কখন আসবে। এই জাতীয় বিষয়। আর যেটা ভাগ্য বলার চেষ্টা করা হয়, এটা কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়।

---

[১৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৮৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৯০৬

[২০] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৯৫৩৬

<u>তাহারাত/পবিত্রতা</u>

<u>প্রশ্ন-১৫:</u> কেউ পেশাব করে সাথে সাথেই পানি ব্যবহার করছে, আবার কাউকে দেখা যাচ্ছে কুলুখ করতে করতে চলে যাচ্ছে বা মানুষের সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। এই ব্যাপারে জানতে চাই।

<u>উত্তর:</u> আমরা নবীজির সুন্নাতের সাথে যোগ-বিয়োগ করে আরো তাকওয়া বাড়াতে যাই। এটাতে ক্ষতি হয়ে যায় অনেক সময়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবায়ে কিরাম, আমাদের চার ইমাম, তাঁরা পেশাবের পরে কুলুখ ব্যবহার করতেন বসে বসে। অনেক সময় শুধু পানি ব্যবহার করতেন। অনেক সময় পানি এবং কুলুখ দুটোই ব্যবহার করতেন। দুটোই বসা অবস্থায়! ঢিলা নিয়ে হাঁটাচলা করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবায়ে কিরাম, আমাদের চার ইমাম, তাবিয়ীন, তাবি'-তাবিয়িনদের যুগে ছিল না। পরবর্তী ফকীহরা বলেছেন, যদি কারোর ভয় থাকে, উঠে দাঁড়ালে পেশাব পড়বে, তারা সাবধানতাবশত একটু হাঁটাহাঁটি করবে। এটা নিয়েই আমরা ক্রমান্বয়ে বাড়াবাড়ি করেছি, বসা অবস্থায় ঢিলা এবং পানি ব্যবহার করলেই আমাদের সুন্নাত এবং তাহারাত আদায় হবে। এটা ওয়াসওয়াসার পর্যায়ে না নেওয়া উচিত।

<u>প্রশ্ন-১৬:</u> আমরা যখন প্রস্রাব করে কুলুখ ব্যবহার করি, যদি পানি থাকে তাহলে আমরা কুলুখ ব্যবহার করতে পারব কিনা?

<u>উত্তর:</u> প্রথমে বুঝতে হবে, কুলুখ ব্যবহার বলতে কী বোঝাচ্ছি। কুলুখ বলতে যদি ঢিলা নিয়ে হাঁটাচলা বুঝি, তাহলে এটা কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবিগণ, তাবিয়িগণ, আমাদের চার ইমাম কেউ কখনো করেন নি। এই হাঁটাচলাটা অনেক পরে এসেছে। এখানে দুটো বিষয় আরবিতে আছে। একটা ইসতিনজাবাইসতিজমার, আরেকটা হল, ইসতিবরা। একটা হল পানি ব্যবহার করা অথবা

ঢিলাকুলুখ ব্যবহার করা বসা অবস্থাতে পাক হওয়ার জন্য । বসা অবস্থাতেই ঢিলা ব্যবহার করে পাক হওয়া, অথবা ঢিলার পরে পানি ব্যবহার করে পাক হওয়া, আর শুধু পানি ব্যবহার করে পাক হওয়া । এভাবে পেশাবের পরে, পায়খানার পরে আপনি যদি ইচ্ছা করেন, যদি পানি থাকেও প্রথমে ঢিলা-টিস্যু ইত্যাদি ব্যবহার করে... । ইসলাম পরিচ্ছন্নতা চায়, যেন আপনি পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্ন হন, হাতে কোনো ময়লা না লাগে, এজন্য আগে টিস্যু অথবা ঢিলা ব্যবহার করে এরপর পানি ব্যবহার করা উত্তম । কিন্তু ঢিলাকুলুখ নিয়ে হেঁটে বেড়ানো এটাকে বলা হয় ইসতিবরা । অর্থাৎ সন্দেহমুক্ত হওয়া । এটা ৫০০/৬০০ বছর পরের কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন । অনেকেই, বিশেষ করে এশিয়া, ইরান; অনেক মানুষ উঠে দাঁড়ালে পেশাব পড়ার ভয় থাকে, তারা একটু সাবধান হবে যেন পেশাবটা না পড়ে । এই সাবধানতাটাকে আমরা সুন্নাহ বা দীন বানিয়ে ফেলেছি, যেটা সাহাবি-তাবিয়িদের যুগে পাওয়া যায় না, এটা হবে মানুষের প্রকৃতির উপর । যদি কেউ নিশ্চিত হন যে, পেশাব শেষে উঠে দাঁড়ালে তার পেশাব পড়তে পারে, তিনি সাবধান হওয়ার চেষ্টা করবেন । কিন্তু এটাকে ওয়াসওয়াসার পর্যায়ে নেবেন না । আর সুন্নাত হল, বসা অবস্থাতেই ঢিলা-কুলুখ এবং পানি অথবা শুধু ঢিলা-কুলুখ অথবা শুধু পানি ব্যবহার করা । পানি থাকলে পানিই যথেষ্ট, ঢিলা জরুরি নয় ।

<u>প্রশ্ন-১৭:</u> আমাদের একটা ছোট্ট বাচ্চা আছে ও প্রায়ই প্রস্রাব করে দেয় কাপড়ে । অনেক সময় সাথে সাথে change (পরিবর্তন) করা যায় না, কিন্তু নামাযের সময় চলে যাচ্ছে এমন হয় । এভাবে কি নামায হবে? নাকি পুনরায় change করে নামায পড়তে হবে?

<u>উত্তর:</u> যে বাচ্চারা এখনো মায়ের দুধ খাচ্ছে, সলিড কিছু খায়নি, একেবারেই দুগ্ধপোষ্য– এই বাচ্চাদের পেশাব, বিশেষ করে পুরুষ

বাচ্চার পেশাব (পাক না নাপাক)– এটা নিয়ে ফুকাহাদের মধ্যে ইখতিলাফ আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর একাধিক হাদীস রয়েছে যে, দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশু পেশাব করলে পানি ঢেলে দেবে। আর মেয়ে যদি পেশাব করে তাহলে ধুয়ে নেবে। এটার অর্থ কী? এটা বোঝার ক্ষেত্রে তাঁরা মতভেদ করেছেন। যেহেতু ছেলের পেশাব একটা ধারায় যায়, পানি ঢেলে ধুলেই ওটা হয়ে যায়। আর মেয়েদের পেশাব ছড়িয়ে পড়ে, এজন্য ভালো করে ধুতে হবে। কেউ বলেছেন পানি ঢেলে দিলেই চলবে। তবে ধুতে হবে, অল্প হোক, বেশি হোক। সুতরাং পেশাবের জায়গাটা ভালো করে ধুয়ে নেওয়াটাই নিরাপদ। অথবা পরির্বতন করে নেওয়াটাই নিরাপদ।

<u>প্রশ্ন-১৮:</u> বাথরুম এবং গোসলখানা একসাথে; ওই গোসলখানায় যদি আমি ওযু এবং গোসল করি, তাহলে কি জায়িয হবে?

<u>উত্তর:</u> অবশ্যই ওযু-গোসল হবে। যদি বন্ধ হয়, দেখার কেউ না থাকে তাহলে কাপড় খুলে গোসল করা বৈধ। তবে অপ্রয়োজনে উলঙ্গ না হওয়ার চেষ্টা করব। গোসলের ভেতরে কাপড় খুলে গেলে, ওযুর পরে বাথরুমের ভেতরে কাপড় খুলে গেলে ওযু ভাঙে না। এমনকি মানুষের সামনে সতর খুলে গেলে হারাম হয়, কিন্তু ওযু ভেঙে যায় না।

<u>প্রশ্ন-১৯:</u> আমার বারবার ওযু ভেঙ্গে যায়, এজন্য আমি কী করতে পারি? আমি শুনেছি, বারবার ওযু ভেঙ্গে গেলে, প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুন করে ওযু করে নামায পড়তে হবে। তারপর থেকে আমি সেভাবেই নামায পড়ি। এরপর আমার সন্দেহ হয়, আমার নামায হবে কিনা। আমি বুখারি শরীফে পড়েছি, যতোক্ষণ শব্দ না হয়, যতোক্ষণ গন্ধ পাওয়া না যায়, ততোক্ষণ পর্যন্ত ওযু ভাঙবে না। এটা একটু বুঝিয়ে বলবেন।

<u>উত্তর:</u> প্রথমত, বুখারির যে হাদীস, সেটার অর্থ হল, ওয়াসওয়াসার

পেছনে না ছুটি; আপনি নিজেই বলেছেন, মনের সন্দেহ হয়, সালাত বুঝি হল না। সবার ভেতরেই শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয়। ওযু বোধহয় হল না, আরেকবার ধুই, অথবা বায়ু চলে গেছে, ওযুটা ভেঙে গেছে, আবার ওযু করে আসি। আসলে দীন সহজ। আমরা সুনিশ্চিত না হয়ে সন্দেহের পেছনে দৌড়াব না। মনটাকে উন্মুক্ত রাখব। আমরা এমন করতে পারব না– আল্লাহ আমি এই ইবাদত করলাম, কোনো ত্রুটি নেই, তুমি কবুল করতে বাধ্য; এই রকম অবস্থায় না যাই। আমার সাধ্যমতো করেছি আল্লাহ, তুমি দয়া করে কবুল করো। এজন্য আমরা বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হই, অর্থাৎ আমি সুনিশ্চিত অনুভব করেছি, শব্দ শুনেছি বা গন্ধ হয়েছে, তাহলে ওযু ভাঙবে। এটা বলা হয়েছে হাদীস শরীফে। আপনার ক্ষেত্রে, ওযু যদি বারবার নষ্ট হয়, আপনি একবার ওযু করে সালাত আদায় করবেন। যদি এমন হয়, এই সালাতের ভেতরেও ওযু ভেঙে যায়, তাহলে আপনার সমস্যা নেই। আপনার সালাতের পূর্ণ সাওয়াব পাবেন। আমাদের বুঝতে হবে, সাওয়াব কিন্তু কতো বেশি করেছেন, এটার উপরে না, আপনি সাধ্যমতো কতোটুকু করেছেন। অর্থাৎ আপনি অনেক সূরা জানেন, আপনি বড়বড় সূরা দিয়ে সালাত আদায় করেছেন, সাওয়াব পাবেন। আপনি কোনো সূরা জানেন না, আপনি শুধু 'আল্লাহু আকবার' পড়ে সালাত আদায় করেছেন, আপনিও একই সাওয়াব পাবেন। আপনার সাধ্যমতো আল্লাহর ইবাদত করবেন, আপনি আরো ভালো করার চেষ্টা করবেন। فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[১]

<u>প্রশ্ন-২০:</u> আমরা সৌদি আরবে দেখেছি, আসরের পরে তারা ওযু করে মোজা পরেন, মাগরিব, ইশাতে পা না ধুয়ে মোজার উপরে মাসেহ করেন। এটা কুরআন হাদীসে আছে কিনা?

---

[১] সূরাঃ তাগাবুন, আয়াতঃ ১৬

উত্তর: মোজা দুই প্রকারের। একটা চামড়ার মোজা, এটাকে আরবিতে খুফ [الْخُفُّ] বলা হয়। আরেকটা হল, চামড়া ছাড়া অন্যান্য কাপড়, নাইলন বা উলের মোজা, এটাকে আরবিতে জাওরাব [الْجَوْرَبُ] বলা হয়। চামড়ার মোজার উপরে মাস্‌হ করার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা আছে। মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে। এটার মূলনীতি হল, আপনি যদি ওযু অবস্থায় মোজা পরেন, তাহলে বাসায় থাকলে পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা, আর সফরে থাকলে তিনদিন তিনরাত, মোট বাহাত্তর ঘণ্টা, আপনি ওযু করতে হাত-মুখ সবই ধোবেন, মোজার উপরের দিকে মুছে নেবেন। ভেজা আঙুল মুছে নেবেন। এ ব্যাপারে কারোর কোনো মতভেদ নেই। যদিও আমাদের দেশে মোজার উপর মাস্‌হ (তেমন) প্রচলিত নয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের মোজা কাপড়ের মোজা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাপড়ের মোজায় মাস্‌হ করতেন– এরকম কোনো সহীহ রিওয়ায়াত নেই। অনেক সাহাবি চামড়ার মোজা ছাড়াও কাপড়ের মোজায় মাস্‌হ করেছেন। অধিকাংশ ফকীহ, চামড়ার মোজার মতো কাপড়ের মোজায় মাসহ করা বৈধ বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, কাপড়ের চামড়া যদি মোটা হয়, হাঁটাচলা করা যায়, তাহলেই শুধু সেই কাপড়ের উপর মাস্‌হ করা যাবে। পাতলা হলে করা যাবে না। এজন্য চামড়ার মোজা পরলে আমরা অবশ্যই মাস্‌হ করতে পারব। আল্লাহ তাআলা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনুমতি দিয়েছেন। শরীআতসিদ্ধ বৈধ। কাপড়ের মোজা হলে, মাস্‌হ করতে পারব। পাতলা মোজার ব্যাপারে ফকীহদের মতভেদ থাকবেই। মতভেদমুক্ত আমল করাই উত্তম।

প্রশ্ন-২১: আমরা যে যিক্‌র করি, ওযু ছাড়া যিক্‌র করলে কি গোনাহ হবে?

উত্তর: জি, না। যিক্‌র এবং দরূদ ওযুসহ, ওযুছাড়া, গোসলসহ, গোসলছাড়া, হাঁটতে, বসতে, শুয়ে; সর্বাবস্থায় করবেন।

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

সর্বাবস্থায় নবীজি (ﷺ) আল্লাহর যিক্‌র করতেন।[২] এবং এটাই recommended (করণীয়)। নবীজি (ﷺ) বলেছেন, বসা, উঠা, শোয়া– কোনো অবস্থায় আল্লাহর সামান্য যিক্‌র না করলে আল্লাহ রাগ করেন এবং আমাদের জন্য এটা আফসোস হবে। কাজেই, আল্লাহর যিক্‌র সর্বাবস্থায় করবেন। ওযু হলে বেশি ভালো।

<u>প্রশ্ন-২২:</u> (নারীর প্রশ্ন) আমার মোবাইলে কাবা শরীফের ছবি আছে? আমার শরীর খারাপ হলে কি গুনাহ হবে?

<u>উত্তর:</u> না। যদি প্রকৃত কাবা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। কাবাঘর মোবাইলে থাকলে বা ছবিতে হাত পড়লে, এটাতে কোনো সমস্যা নেই। কাবা ঘরের ছবিতে হাত দিতে ওযু বা পবিত্রতা জরুরি নয়।

<u>প্রশ্ন-২৩:</u> আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মাথায় ও শরীরে যে ক্রিম বা জেল use (ব্যবহার) করি, এভাবে নামায হবে কিনা?

<u>উত্তর:</u> জি, অবশ্যই সালাত আদায় হবে। ইসলামকে আল্লাহ সহজ করেছেন। যদি কনফার্ম হই, এর মধ্যে নাপাক আছে এবং নাপাকির পরিমাণ বেশি বা এটা নাপাক বলে আলিমরা বলেন...; তাছাড়া যা কিছু আমরা ব্যবহার করি, ধরে নিতে হবে বৈধ-পবিত্র। যেমন ভ্যাসলিন, পেট্রোলিয়াম জেলি– এগুলো সবই বৈধ এবং পবিত্র। এমনকি কেরোসিন যে নাপাক, এটা আমরা বলতে পারি না। দুর্গন্ধ আছে কিন্তু নাপাক না, এটা মাটি থেকে এসেছে। এ জন্য কোনোকিছুকে নাপাক বলতে হলে শারয়ি দলীলের প্রয়োজন হবে।

---

[২] সহীহ বুখারি ১/১২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৭৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৩৮৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৩০২

সালাত/নামায

প্রশ্ন-২৪: হাদীসে আছে, নামায বেহেশতের চাবি। নামায না পড়ে কি বেহেশতে যাওয়া যাবে?

উত্তর: নামায না পড়লে জান্নাতে যাবে কিনা, এর আগে আরেকটা প্রশ্ন আছে; 'নামায ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে মুসলিম থাকবে কিনা'? আমরা যদি কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসের আলোকে চিন্তা করি, তাহলে স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, না, নামায যিনি পড়েননা ইচ্ছে করে, তাকে মুসলিম বলে গণ্য করা, কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে খুবই কঠিন। অনেক হাদীস এবং কুরআনের আয়াতেও এটা বোঝায়। মুসনাদ আহমাদের একটা ছোট্ট সহজ কথা, সাহাবায়ে কিরামগণ কোনো পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির মনে করতেননা; মুসলিম পাপ করতে পারে। কিন্তু নামায তরককারীকে তারা কাফির মনে করতেন। এরপরও যে ব্যক্তি নামাযের গুরুত্ব স্বীকার করে– নামায না পড়া কঠিনতম পাপ, আমি খুবই পাপী, এই চেতনাসহ কেউ যদি আলসেমি করে কাযা করে, সেই ব্যক্তি মুসলিম থাকবে বলে ফুকাহারা অনেকেই বলেছেন, আমরাও বলি। তবে যে ব্যক্তি মোটেও নামায পড়েন না, ওই ব্যক্তি এই পর্যায়ে থাকেননা। যে ব্যক্তি মাঝেমাঝে নামায পড়েননা, আলসেমি করে কাযা করেন, তিনি পাপী বলে নিজেকে অনুভব করেন। কিন্তু যিনি নামায মোটেও পড়েননা, তাকে যদি বলা হয়, নামায পড়ো! তাহলে সে বলবে যে, 'আরে নামায পড়ে কী হবে? নামায না পড়ে আমি ওর চেয়ে ভালো আছি! অথবা নামায না পড়লেও আমার ঈমান ভালো আছে! আমি ভালো মুসলিম'। আর নামায বাদ দিয়ে ভালো মুসলিম হওয়া যায়, এই চিন্তা করলে আর মুসলিম থাকাই যায়

না। নামাযির চেয়ে বেনামাযি কোনো ভাবে ভালো, এই চিন্তা করলে আর মুসলিম থাকা যায়না। এটা হল প্রথম বিষয়। এজন্য নামায না পড়লে বেহেশতে যাওয়ার প্রশ্ন তো নয়ই, মুসলিম আদৌ থাকে কিনা, এটা প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় হল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সহীহ হাদীসে বলেছেন:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করবেন সালাত সম্পর্কে।[১] কাজেই কেউ যদি অনেক হজ্জ করেছে, যাকাত দিয়েছে, মসজিদ বানিয়েছে, টুপি পরেছে, পাগড়ি পরেছে, আলিম-উলামাদের সম্মান করেছে। কিন্তু সালাতটা সে করে নি, তাহলে আল্লাহ এগুলো সম্পর্কে প্রশ্নই করবেন না। সালাতে ফেল করলে তাকে জাহান্নামে দেওয়া হবে। তৃতীয় যে বিষয়টা, সালাতকে আমরা কঠিন করে ফেলেছি। অনেক কিছু লাগবে– টুপি লাগবে, পাকসাফ লাগবে; কিন্তু এগুলোতে অপশন আছে, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন। কিন্তু সালাতের হাযিরা ক্ষমা হয় না, এজন্য সালাতে যে কোনোভাবে হাযিরা দিতে হবে। যদি পাক কাপড় না থাকে নাপাক কাপড়ে, কাপড় না থাকলে উলঙ্গ হয়ে, সূরা কিরাআত না জানলে শুধু 'আল্লাহু আকবর' বলে হলেও সালাতে ওয়াক্তমতো হাযিরা দেওয়া আল্লাহ ফরয করেছেন। কাজেই সালাত বাদ দিয়ে মুসলিম থাকার চিন্তা আমরা পরিহার করার চেষ্টা করি। আল্লাহ হিফাযত করুন।

প্রশ্ন-২৫: গর্ভবতী অবস্থায় নামায পড়লে পূর্বে নামায পড়লে যে সাওয়াব হত, বর্তমানে সেই সাওয়াব হবে? নাকি তার থেকে বেশি বা কম হবে?

---

[১] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৪১৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৪৬৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১৪২৫

উত্তর: মায়েদের জন্য গর্ভধারণ অত্যন্ত বড় ইবাদত। এজন্য তিনি সাওয়াব পাবেন। কিন্তু ওই সময়ে, অন্যান্য ইবাদাতের জন্য অতিরিক্ত সাওয়াবের কোনো সহীহ (বর্ণনা নেই)। আমাদের সমাজে আমি জানি, অনেক কাহিনি অনেক লিফলেট আছে, কথা আছে, যেগুলো আমরা হাদীসগ্রন্থে দেখি না। এগুলোর অধিকাংশই বানোয়াট বা আলিমের কথা। গর্ভধারণ করা, বাচ্চা পালন করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত একজন নারীর জন্য। এজন্য তিনি অত্যন্ত সাওয়াব পাবেন। প্রতি মুহূর্তে সাওয়াব পাবেন। কিন্তু এই অবস্থায় নামাযের অতিরিক্ত সাওয়াব আছে, আমার যতোটুকু জানা আছে, সহীহ বা গ্রহণযোগ্য কোনো হাদীস নেই।

প্রশ্ন-২৬: এক মসজিদের ছাদের নিচে এক পাশে কবর আরেক পাশে নামায হচ্ছে, কবরের উপরের ছাদ খোলা। এটা ঠিক হচ্ছে কিনা?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুতাওয়াতির হাদীসে, প্রায় দশজন সাহাবি থেকে বর্ণিত– আবু হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবন উমার, আয়িশা, মিকদাদ, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ, বিভিন্ন সাহাবি থেকে বর্ণিত, (তিনি) বলেছেন:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

ইহুদি-নাসারারা তাদের কোনো নবী-ওলি মৃত্যুবরণ করলে, তার কবরের জায়গায় মসজিদ বানাত। আল্লাহ তাদের উপর লানত করুক। লানতের পাবে, যারা এ কাজ করে। আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি, খবরদার! কবরে মসজিদ বানাবে না।[২] কাজেই কবরকেন্দ্রিক মসজিদ, মসজিদের ভেতরে

[২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৪৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫৩১; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৭০৩

কবরসহ মসজিদ, এগুলো মূলত অবৈধ। তবে মসজিদ আলাদা ছিল, কবর আলাদা ছিল, মসজিদ বড় করতে গিয়ে কবর ঢুকে গেছে; কবরটাকে আলাদা রাখা হয়েছে, ফাঁকা রাখা হয়েছে, কিন্তু মসজিদ আলাদা, কবরের সাইডে নামায হয়না– এরকম হতে পারে। কবরকেন্দ্রিক মসজিদ নয়, মসজিদ ছিল, কবরটা দূরে ছিল, বড় হওয়ার কারণে ঢুকে গেছে, কবরকে কবর রাখার জন্য ছাদ দেওয়া হয় নি, যেন এটা মসজিদ বলে গণ্য না হয়। এটা হয়তো শরীআতে অবৈধ হবে না। اللّٰهُ أَعْلَمُ।

প্রশ্ন-২৭: মসজিদে ঢুকে আমরা নানান ধরনের কথা-বার্তা বলি, এটা ঠিক কিনা?

উত্তর: আমরা সকলেই বিবেক দিয়েই বুঝি যে মসজিদে ঢুকে আজেবাজে কথা বলা খারাপ কাজ। তবে এই খারাপটা কতোটুকু তা বুঝতে হবে। মসজিদে প্রবেশ করে প্রথম আমাদের দায়িত্ব হল, ন্যূনতম মসজিদের যে হক, কিছু সালাত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবার বলেছেন:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

তোমাদের কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে, তাহলে অন্তত দুই রাকাআত সালাত আদায় না করে যেন মসজিদে বসে না পড়ে।[৩] কেউ যদি মসজিদে ঢুকে সুন্নাত নামায আদায় করেন বা যে কোনো নামায আদায় করে বসেন, তাহলে মসজিদের হক আদায় হল। সালাত হল মসজিদের সালাম বা হক। আমরা যদি মসজিদে ঢুকে বসে পড়ি, তাহলে তার হক না দিয়ে বসে পড়া হয়। আর যে ব্যক্তি মসজিদে সালাত আদায় করে বসেন, তার দুটো লাভ হয়। একটা লাভ হল, নামায পড়ে

[৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭১৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১০১২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২২৬০১

বসার কারণে আজেবাজে কথা মনে আসে না। আর যতোক্ষণ তিনি সালাতের জন্য অপেক্ষা করবেন, তার আমলনামায় সালাতের সাওয়াব লেখা হবে। আমরা যেসব কথাবার্তা বলি, তা যদি অন্যের সালাতের ক্ষতি করে তাহলে সেটা হারাম হয়ে যাবে। আর তা নাহলে যেটা স্বাভাবিক কথাবার্তা– যেমন কেমন আছেন, ভালো আছি– এটা বৈধ। কোনো কোনো কথার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন। যেমন মসজিদে যদি কেউ কেনাবেচার কাজ করে, এটা রাসূল (ﷺ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আবার কেউ যদি কোনো জিনিস মসজিদে হারিয়ে গেলে বলে, আমার অমুক জিনিস হারিয়ে গেছে, কেউ দেখেছেন নাকি? তখন রাসূল (ﷺ) বদদুআ করতে শিখিয়েছেন। বলতে হবে, 'তুমি তোমার হারানো জিনিসটা আর কোনোদিন যেন না পাও'। এজন্য মসজিদে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা আমাদের জন্য খুব গুনাহের কাজ। আমরা যদি মসজিদে বসে আল্লাহ তাআলার যিক্‌র-তাসবীহ করতে পারি, তাহলে আমাদের আমলনামায় অনেক সাওয়াব জমা হবে।

প্রশ্ন-২৮ঃ আযান শোনার পরে আমি দরূদে ইবরাহীম পড়ি, তারপর আযানের দুআটা পড়ি। (এটা ঠিক আছে কিনা?)

<u>উত্তরঃ</u> আযানের ক্ষেত্রে আপনি খুবই ভালো করেছেন। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমরা আশা করছি সবাই জানেন, কিছু সহজ ইবাদত আছে যেগুলো আমরা অবহেলা করি। যখন আযান দেন মুআযযিন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একাধিক হাদীসে রয়েছেঃ

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المؤَذِّنُ

যখন আযান শোনবে, নারী-পুরুষ, আপনি রান্নাঘরে থাকেন

আপনার মাথায় টুপি থাক বা কাপড় না থাক, কাপড় দেওয়া অবশ্যই আদব, মুআযযিন যে কথাগুলো বলছেন, ওই কথাগুলো বলেন।[৪] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যদি কেউ ইয়াকীনের সাথে বলে আল্লাহ তার জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে জান্নাত বরাদ্দ করবেন। এরপরে আপনি একবার দরূদ পড়বেন। এটাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আযান শেষ হলে দরূদ পড়বেঃ

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

যদি কেউ একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য আল্লাহ দশটা গুনাহ মাফ করে দেন, দশটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। এরপর তোমরা আমার জন্য ওয়াসীলা প্রার্থনা করবে।... যদি কেউ আমার জন্য ওয়াসীলা চায় তার জন্য আমার শাফায়াত পাওনা হয়ে যাবে।[৫] ওয়াসীলা অর্থ নৈকট্য! আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর (জন্য) আল্লাহর নিকটতম মর্যাদা প্রার্থনা করব। কাজেই আমরা এগুলো সবাই করব। সবাই আমরা আযানের জবাব দেব, আযানের পরে দরূদ পড়ব। আযানের পরে দুআ পড়ার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাওফীক দিন।

প্রশ্ন-২৯: তাহিইয়াতুল ওযু নামাযটা কি ওযু করার সাথে সাথেই পড়তে হয়? যদি আমি দশ-পনেরো মিনিট বা

---

[৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৬১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৮৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৫২২; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২০৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৬৭৩

[৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৮৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৬১৪

অনেকক্ষণ পরে পড়ি, তাহলে এ নামাযটা হবে?

উত্তরঃ 'তাহিইয়াতুল ওযু' ওযুর পরেই পড়তে হয়। যদি আপনার ওযুর পরে কাপড়চোপড় পরা, নামাযের প্রস্তুতির জন্য বিলম্ব হয় (তাহলে) দোষ নেই। কিন্তু ওযুর পরে আপনি যদি দুনিয়াবি কাজ করেন, এরপর পড়েন, তাহলে সেটা দুই রাকআত সালাত হবে, তাহিইয়াতুল ওযু হিসেবে গণ্য হবে না। তাহিইয়াতুল ওযু হল ওযুর পরে দুনিয়াবি অন্য কোনো কাজের আগে ওযুর হকটা আদায় করে অন্যদিকে যাবেন। এই সালাত নফল। আপনি যদি দেরি করে পড়েন নফলের সাওয়াব পাবেন। তবে তাহিইয়াতুল ওযু, ওযুর পরপর পড়ার কিছু ফযীলত কমে যাবে।

প্রশ্ন-৩০: তাহিইয়াতুল মসজিদ বা দুখূলুল মসজিদের ব্যাপারে জানতে চাই?

উত্তরঃ তাহিইয়াতুল ওযুর চেয়ে তাহিইয়াতুল মসজিদ বা দুখুলুল মসজিদ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাহিইয়াতুল ওযু নিজে আদায় করেন নি, তবে উৎসাহ দিয়েছেন। পালন না করলে আপত্তি করেন নি। আর তাহিইয়াতুল মসজিদ বা দুখূলুল মসজিদ তিনি নিজে পালন করেছেন, পালন করতে উৎসাহ দিয়েছেন। কেউ মসজিদে গিয়ে তাহিইয়াতুল মসজিদ বা দুখূলুল মসজিদ না পড়ে বসলে তাকে বকা দিয়েছেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর খুব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হল, আমরা মসজিদে ঢুকে হয় দুই রাকআত তাহিইয়াতুল মসজিদ বা দুখূলুল মসজিদ আদায় করব, অথবা যে কোনো সালাত সুন্নাতে মুআক্কাদা বা ফরযে দাঁড়িয়ে যাব। মসজিদে ঢুকে বসার আগে সালাত আদায় করে বসা হল তাহিইয়াতুল মসজিদ বা দুখূলুল মসজিদ। অর্থাৎ মসজিদের

সালামটা হল সালাত। কোনো নামায না পড়ে বসার অর্থ হল, মজলিসে গিয়ে সালাম না দিয়ে বসে পড়া। আর একটা বেয়াদবি! মসজিদের সাথেও বেয়াদবি। এজন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব। মাকরূহ ওয়াক্ত হলে সেটা ভিন্ন কথা। মসজিদে গিয়ে সময় থাকা সত্ত্বেও আমরা বসে পড়ি। অনেকে বসার পরে তাহিইয়াতুল মসজিদ বা দুখূলুল মসজিদ পড়ি। অর্থাৎ মজলিসে ঢুকে বসে 'কেমন আছেন', গল্পসল্প করে, এরপর 'আসসালামু আলাইকুম' সালাম দেওয়ার মতো অবস্থা হয়ে যায়। সুন্নাত হল, রাসূলুল্লাহ এর নির্দেশ, কর্ম হল, মসজিদে ঢুকে, বসার আগে, সালাত আদায় করতে হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। আল্লাহ তাআলা আমাদের পালন করার তাওফীক দান করুন।

প্রশ্ন-৩১: একজন ওযু করার পর মসজিদে ঢুকেছে, তাহলে এখন তার দুটি জিনিস চলে আসছে, তাহিইয়াতুল ওযু ও তাহিইয়াতুল মসজিদ বা দুখূলুল মসজিদ। দুই রাকআত নামায পড়লে...?

<u>**উত্তর:**</u> দুই রাকআত সালাত আদায় করলে তাহিইয়াতুল ওযু তাহিইয়াতুল মসজিদ দুটোই আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৩২: ফজর সালাতের সুন্নাত পড়ে, মসজিদে রওয়ানা দিয়ে দেখি এখনও সময় বাকি আছে, তখন কি তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়তে পারব? আবার আসরের নামায পড়ে যখন মাগরিবের নামায পড়তে যাব, আযানের আগে মসজিদে ঢুকে তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়া যাবে কিনা?

<u>**উত্তর:**</u> মসজিদে গেলে তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়তে হবে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। কিন্তু কিছু সময় আছে যখন সালাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন।

তার মধ্যে তিনটা সময় খুবই প্রসিদ্ধ। একটা সূর্যোদয়, আরেকটা সূর্য ঠিক মাথার উপরে, আরেকটা সূর্যাস্ত। আপনি যেটা বলেছেন, এটা সূর্যাস্তের সময়। এসময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ, বিভিন্ন হাদীসে এরকম এসেছে। এজন্য ফুকাহারা একটু মতভেদ করেছেন। এক হাদীসে নির্দেশ, মসজিদে ঢুকলেই নামায পড়বে। আরেক হাদীসে নিষেধ আছে, এই সময়ে পড়বে না। এখন একটা ব্যাপার, (আদেশের) হাদীস এবং নিষেধের হাদীস পরস্পর সামনে দাঁড়িয়ে গেল। এখন আপনি কোনটা মানবেন? এক্ষেত্রে দুই বিষয়েই মত আছে। কোনো ফকীহ বলেছেন, যেহেতু মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার বিশেষ হুকুম, কাজেই সময়টা আমরা ধরব না। অন্য ফকীহ বলেছেন, সময়টা যেহেতু বিশেষ নির্দেশ, একদিকে মুসতাহাব আরেকদিকে হারাম, কাজেই আমরা হারামকে অগ্রগণ্য করব। সুতরাং এ বিষয়ে ফুকাহাদের ইখতিলাফ রয়েছে। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে করি, যেহেতু নিষেধটা জোরাল, সেহেতু আমরা এই সময়ে সালাত না পড়ি। আমি অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকি, ঠিক সূর্যাস্তের সময় গিয়েছি, মসজিদে দাঁড়িয়ে থাকি। কারণ এই সময়ে সালাত শুরু করে শেষও করতে পারব না। সর্বাবস্থায় এই সালাত পড়া না-পড়া উভয় বিষয়ে মত আছে। সাহাবি, তাবিয়িদের থেকে মত আছে। আবদুল্লাহ ইবন উমার পড়তেন, তাঁর পিতা উমার ইবনুল খাত্তাব পড়তেন না। তাওয়াফের সালাত আদায় করে, তাওয়াফের দুই রাকআত সালাত যেহেতু ফজরের পরে সুন্নাত-নফল পড়তে নিষেধ আছে, সূর্যোদয়ের পরে পড়তে হবে, তিনি বাইরে গিয়ে সূর্য উঠার পরে পড়েছেন। এই দুটো সময়ে অন্য কোনো নফল সালাত পড়তে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই নিষেধ করেছেন। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সূর্য মধ্যগগণে থাকার সময়, সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন । এই সময়ে যদি দুখূলুল মসজিদ

জাতীয় সালাতের প্রয়োজন হয়, পড়ব কি পড়ব না, একটা বিশেষ ক্ষেত্রে contradiction (ইখতিলাফ) এর কারণে, তারা বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেখানে হারাম এবং মুসতাহাবের contradiction, সেখানে হারাম বর্জনই আমার কাছে অগ্রগণ্য মনে হয়। অন্য ফকীহর অন্য মত থাকতে পারে, কারণ দুটোই হাদীসে এসেছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

প্রশ্ন-৩৩: 'নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া...' এই নিয়তটা নাই, আমি জানি। কাউকে বললে বলে যে, বাপ-দাদা চৌদ্দগোষ্ঠী বলে যাচ্ছে ... এটা বুঝিয়ে বলবেন?

উত্তর: প্রথমেই আপনাদের বলি, এটা নিয়ে ঝগড়া করেন না। এটা দীনের এমন জিনিস নয় যে, এটা করলে কাফির-মুশরিক হয়ে গেল। বিষয়টা হল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবিগণ, তাবিয়িগণ, আমাদের চার ইমাম; তাঁরা মনে মনে নিয়ত করতেন। অর্থাৎ নামাযে দাঁড়িয়ে কী নামায পড়ছি, আল্লাহর জন্য, এটা মনের ভেতর রাখতেন, মুখে বলতেন না। সকল মাযহাব এই ব্যাপারে একমত। পরবর্তী যামানার মানুষেরা এসব করেছেন। কেউ বলেছেন মাকরূহ, কেউ বলেছেন বিদআত, কেউ বলেছেন মুসতাহাব। আর যারা করেন নি, দয়া করে এই সমস্যায় নিয়েন না, নিয়ত শেখার চেয়ে দুটি সুন্নাত দুআ মুখস্থ করা, আল্লাহ সাওয়াব বেশি দেবেন। তবে ঝগড়া করেন না।

প্রশ্ন-৩৪: নামাযে দাঁড়িয়ে 'ইন্নী ওয়াজ্জাহতু'... এটা পড়া লাগে; এখন শুনি এটা নাকি পড়া লাগে না। এটার ব্যাপারে জানাবেন?

উত্তর: 'ইন্নী ওয়াজ্জাহতু'... যেটা আমরা জায়নামাযে পড়ি, এটা

একটু আগে-পিছে হয়ে গেছে আর কি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আল্লাহু আকবার' বলার পরে পড়তেন। আমরা একটু আগেই পড়ে নিই। আমরা একটা সানা পড়ি... 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা...' উনি (রাসূলুল্লাহ) শুধু একটা পড়তেন না। 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' পড়তেন, 'ইন্নী ওয়াজ্জাহতু লিল্লাযী ফাতারাস...' লম্বা দুআ পড়তেন। আবার কখনো অন্য দুআও পড়তেন। এক্ষেত্রে সুন্নাত হল, আমরা 'আল্লাহু আকবার' বলার পরে এইটা পড়ব। নামাযে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে কোনো দুআ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো শেখান নি। আমাদের ফুকাহাগণ, চার ইমামসহ সবাই বলেছেন, 'ইন্নী ওয়াজ্জাহতু লিল্লাযী...' পড়তে হবে নামাযের নিয়ত করে, 'আল্লাহু আকবার' বলার পরে। কিন্তু পরবর্তী যুগের অনেক ফকীহ, তারা নিজেরা ইজতিহাদ করে বলেছেন, ইন্নী ওয়াজ্জাহতু... জায়নামাযে পড়া ভালো। আসলে এটা সুন্নাতের সাথে মেলে না। এজন্য আমরা এটা জায়নামাযে নয়, নামায শুরু করার পরে পড়ব। আল্লাহ কবুল করুন।

প্রশ্ন-৩৫: আমি যদি ফরয নামায এক বা দুই রাকআত পাই তাহলে সুবহানাকা...পড়া লাগবে কিনা? বা কখন পড়তে হবে?

<u>উত্তর:</u> নামাযে যদি দুই রাকআত আপনি মাসবুক হয়ে যান, আপনি সানা কখন পড়বেন, এই নিয়ে ফুকাহাদের কিছু মতভেদ আছে। সহজ কথা হল, আপনি নামায শুরু করেই সানা পড়ে নেবেন। এটা সহজ মত। যদি ইমাম সাহেব রুকুতে চলে যান তাহলে পড়বেন না। (উপস্থাপক: সালাম ফেরানোর পরে পড়বে?) এটা কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন। নামাযের শুরু কোনটাকে ধরব? এটা নিয়ে মতভেদ আছে। আপনি শুরুতে সময় থাকলে পড়বেন। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, ইমাম সালাম ফেরানোর পর যখন উঠবে তখন পড়বে।

প্রশ্ন-৩৬: যখন মুকতাদি হিসেবে নামায পড়ব, তখন সূরা ফাতিহা পড়ব কিনা?

উত্তর: সূরা ফাতিহা পড়া এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো (ইখতিলাফি বিষয়গুলো)... প্রথমেই আমরা যেটা চেয়েছি– ইসলামিক টিভি একটা সুন্দর পৃথিবীর জন্য!পৃথিবীটা সুন্দর হবে কীভাবে? আমরা ইসলামকে ভালোভাবে জানব, ইসলাম যেখানে প্রশস্ততা দিয়েছে, সেখানে মনটাকে বড় করব। ইসলাম যেটাকে নির্ধারণ করেছে, আমরা সেটাকে পালন করব। কিন্তু দুর্ভাগ্য! আমরা যেটা এখানে দেখতে পাই! এই ধরনের প্রশ্নগুলো নিজের কর্মের জন্য নয়, মানুষের সমালোচনার জন্য, বিভিন্নভাবে আমরা এটাকে ব্যবহার করি। আসলে এটা তো সুন্দর পৃথিবী হল না, আরো খারাপ হয়ে গেল। এজন্য এই বিষয়গুলো..., সূরা ফাতিহা পড়া, এবং না-পড়ার পক্ষে সহীহ হাদীস রয়েছে। সূরা ফাতিহা ইমামের পেছনে মুকতাদি পড়বেন, এই ব্যাপারে সহীহ হাদীস আছে। পড়বেন না, এই ব্যাপারেও সহীহ হাদীস রয়েছে। ইমাম মুসলিম সহীহ বলেছেন, নাসায়ির সহীহ হাদীস রয়েছে, কাজেই বিষয়টা নিয়ে সাহাবিদের যুগ থেকেই মতভেদ আছে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি সূরা ফাতিহা পড়ছেন, তিনি সহীহ হাদীস পালন করছেন। যিনি পড়ছেন না, তিনিও সহীহ হাদীস পালন করছেন। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমরা বিতর্কে না যাই। এটা নিয়ে মুসলিমদের ভেতর দলাদলি বিভক্তি না করি। কারণ বিভক্তি অনেক হয়েছে। আমরা কমানোর চেষ্টা করি।

প্রশ্ন-৩৭: আমরা অনেক সময় মসজিদে দেখি, নামায পড়ছে কিন্তু ঠোঁট নড়ছে না বা খুব আস্তে নড়ছে। তার এই সূরা কিরাআত পড়া কি ঠিক আছে?

<u>উত্তর:</u> সালাতের ভেতরে আস্তে আস্তে তিলাওয়াতের সর্বনিম্ন পর্যায় হল, আমি পরিপূর্ণ মাখরাজ উচ্চারণ করে পড়ব এবং (অন্য কোনো ফ্যানট্যান না থাকে) আমার কানে শুনতে পারব। এর কমে হলে, এটা পড়া হবে না। এটা মনে মনে ধ্যান করা হবে শুধু। এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রশ্ন-৩৮: নামাযের দুই বৈঠকের মাঝে তাশাহহুদ পাঠের সময় ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলটি কীভাবে তুলতে হয়?

<u>উত্তর:</u> ইশারা বি সাব্বাবাহ... শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করা, এটা তাশাহহুদের বৈঠকে। দুই সিজদার মাঝখানে আপনার দুটি হাতই কিবলামুখি থাকবে। হাঁটুর উপরে কিবলার দিকে মুখ করে, আপনি যখন তাশাহহুদের বৈঠকে বসবেন তখন বামহাত সোজা থাকবে, ডানহাত দিয়ে তাশাহহুদের শুরু থেকে সালাম পর্যন্ত ইশারা কিবলার দিকে থাকবে। এটাই সুন্নাত।

প্রশ্ন-৩৯:আমি সহীহ হাদীসের নিয়মে নামায পড়া শুরু করি, এতে এলাকার লোকজন আপত্তি করছেন। বলছেন, আমরা যেভাবে করি সেভাবে করো। রাফউল ইয়াদাইন করি, বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়ি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের কথামতো এগুলো বাদ দিলে সমস্যা হবে কিনা?

<u>উত্তর:</u> প্রথম কথা যেটা বুঝতে হবে, আমাদের সমাজের মানুষরা যে নামায পড়ে, এটা সহীহ হাদীস মতো একেবারেই নয়– এরকম নয়। দ্বিতীয়ত, যেটা বুঝতে হবে, কিছু কিছু বিষয়ে, যেমন ভাই দুটো কথা বলেছেন, বুকে হাত বাঁধেন... সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিমের কোনো সহীহ হাদীসে হাত কোথায় বাঁধতে হবে, বলা নেই। বলা আছে, ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখতে হবে। অথবা ডানহাত দিয়ে বাম হাতকে

ধরতে হবে। রুস্গ, সায়িদ, যিরা– এটা কোন জায়গা? এখানে না এখানে... সহীহ কোনো হাদীসে বলা নেই। বুখারি, মুসলিমের হাদীসে তো নয়। যে হাদীসগুলোতে নাভির নিচে বলা হয়েছে, ওই হাদীসগুলো দুর্বল। যে হাদীসগুলোতে বুকের উপর বলা হয়েছে, আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটা হাদীসই দুর্বল। এককভাবে সহীহ কোনো হাদীস নেই। এখানে তাউসের একটা মুরসাল হাদীস আছে আর একটা অন্য হাদীস মুআম্মাল ইবন ইসমাঈলের, ইবন খুযাইমাতে আছে। এদুটোর সমন্বয়ে এই বুকের উপরের হাদীসকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস সহীহ বলেছেন। পাশাপাশি আল্লামা ইবনুল কাইয়িম এই বুকের উপরে বাঁধাকে সহীহ বলতে রাজি হন নি। বরং ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল নাভির নিচে বা উপরে বাঁধতে বলেছেন, বুকে বাঁধাকে তিনি মাকরূহ বলেছেন। এজন্য ইবনুল কাইয়িম বুকে বাঁধার হাদীসগুলোকে সহীহ বলতে আপত্তি করেছেন। লাম ইয়াকুল আলা সাদরিহি ইল্লা মুআম্মালঃ এই একমাত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ বুকের উপরের কথা বলেন নি, সে দুর্বল। এক্ষেত্রে প্রথমে যেটা বুঝতে হবে। যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সহীহ হাদীসগুলোতে বাম হাতের উপর ডানহাত রাখতে বলেছেন, এটা আমরা যেখানেই রাখি, ইনশাআল্লাহ সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। সবগুলো হাদীস মেলালে বুকের উপরেরটা বা বুকের কাছাকাছিটা, যেহেতু বলা হয়েছে যিরা, নাভির নিচ পর্যন্ত যায় না। সহীহ হাদীসে যিরার কথা বলা হয়েছে। তারপরেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেহেতু সুনির্ধারিত কোনো সহীহ হাদীসে এইভাবে বলেন নি, কাজেই এটাই সহীহ ওইটা নয়, আমরা এই পর্যায়ে না যাই। বরং আমরা বুঝি এই দুই-তিনরকমের আছে, প্রশস্ততা আনি। আমাদের দেশের সাধারণ মুসলিম, যারা আমরা হানাফি মাযহাবের অনুসরণ করি। আমরা যে প্রচণ্ড ভুলটা করি, সেটা হল একজন মানুষ উপরে হাত বেঁধেছে,

রাফউল ইয়াদাইন করেছে তাকে দেখে কখনও বলি ওয়াহাবি, কখনও বলি কাদিয়ানি, কখনও বলি লা-মাযহাবি। অর্থাৎ লোকটা আমার ইমামের মত মানেনি, কিন্তু রাসূল (ﷺ) এর মত মেনেছে, কয়েক ডজন সাহাবির অনুসরণ করেছে, তাকে আমরা ভালো বলতে রাজি নই। তাহলে আমি খারাপ বললাম কাকে? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবিদের! কাজেই আমি একটা আমল করি, আমলটা ঠিক আছে, এই যুক্তি দিতে পারি। কিন্তু অন্য হাদীস যারা আমল করছে, আপনি বলবেন মানসুখ হয়ে গেছে। কয়েক ডজন সাহাবি আমল করেছেন, তাবিয়ীন আমল করেছেন, চার ইমামের অনেক ইমাম আমল করেছেন। আপনি কেন সেটাকে খারাপ বলবেন? এই জন্য আমরা মনে প্রশস্ততায় আনব, যেগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সবরকম আমলকে বৈধ জানি। আর ভাইকে বলব, এই মুসতাহাব বিষয়গুলো নিয়ে না আপনি আপনাকে বিপদে ফেলেন, হাত যেখানেই বাঁধেন সুন্নাত আদায় হবে। বড়জোর এখানে একটু মুসতাহাব–এইটুকু ইখতিলাফ। রাফউল ইয়াদাইন যারা বলেছেন, তারাও বলেছেন মুসতাহাব। এটা বাদ দিলে গুনাহ হবে, কেউ বলেন নি। এইজন্য মুসতাহাব বিষয় নিয়ে ঝগড়া না করি। আপনি যদি পালন করতে পারেন, আলহামদুলিল্লাহ। না হলে, এই বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য আপনি বাদ দিতে পারেন। ইনশাআল্লাহ, কোনো গুনাহ হবে না। اللهُ أَعْلَمُ

প্রশ্ন-৪০: নামাযে পুরুষ ও মহিলার তেমন কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু আসলে পার্থক্যটা কোথায়? মহিলারা জড়োসড়ো হয়ে পড়বে, আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারি না। রুকুতে পার্থক্য নাই, সিজদায় পার্থক্য নাই, সিজদা করার সময় দুইহাত একটু ফাঁকা থাকবে– সে ব্যাপারেও পার্থক্য নাই। তাহলে পার্থক্য কোথায়? একটু বিস্তারিত বললে উপকৃত হব।

<u>**উত্তরঃ**</u> পুরুষ ও মহিলার সালাতের পার্থক্য আছে কি নেই, এটা নিয়ে ফুকাহাদের মতভেদ আছে। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর পুরুষ-মহিলা সাহাবিদের সালাত শিখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দরবারে ২০/২৫ দিন থেকেছেন, ফিরে যাওয়ার সময়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমাদের বাড়িতে কে কে আছে? স্ত্রী-পুত্র-কন্যা– তাদেরকে সালাত শেখাবে। আমি যেমন সালাত পড়লাম, এরকম সালাত পড়বে। সেখানে কোনো পার্থক্য তিনি বলেননি। এজন্য কোনো কোনো ফকীহ বলেন, এদের মধ্যে ইবরাহীম নাখয়ি রাহ. খুব প্রসিদ্ধ তাবিয়ি ছিলেন, যিনি আমাদের ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর উস্তাদ এবং কুফার বড় ফকীহ মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর মত ছিল, পুরুষ এবং মহিলাদের নামায সমান। এর আগে অনেক সাহাবি মহিলা, যেমন উম্মু দারদা, খুব প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবি, তিনি অবিকল পুরুষদের মতো সালাত আদায় করতেন। পক্ষান্তরে একটা দুর্বল সনদের হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইমাম বাইহাকি তাঁর সুনানুল কুবরার মধ্যে এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মেয়েদেরকে নামাযের মধ্যে বাবু মেরে বসতে নির্দেশ দিতেন অর্থাৎ চারজানু যেটা বলা হয়। রুকু সিজদাহ আটোসাটো হয়ে দিতে নির্দেশ দিতেন। এই হাদীসটা সনদগতভাবে দুর্বল। অনেক ফকীহ ইমাম– ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদের একটা মত, ইমাম শাফিয়ি, ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুমুল্লাহ আজমাঈন); অনেকেই এই হাদীসের আমল করেছেন। পার্থক্য শুধু একটা অথবা দুটো। রুকু এবং সিজদার সময়ে হাতদুটো গুটিয়ে একটু নিচু হবে। বসার সময় চারজানু হয়ে বসবে। হাদীসে দুটো বিষয়ই আছে। চারজানু হয়ে বসার বিষয়টা আমাদের দেশের ফুকাহারা গ্রহণ করেন নি। আর সনদগতভাবে হাদীসটা খুবই দুর্বল। এই জন্য যারা গোটাসোটা হয়ে পড়েন..., বাকি যে পার্থক্যগুলো– হাত (কাঁধ

পর্যন্ত তোলা অথবা কান পর্যন্ত তোলা) তোলার দুই ধরনের হাদীসই সহীহ। ছেলেরা এই (কান) পর্যন্ত মেয়েরা ওই (কাঁধ) পর্যন্ত, এমনটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেননি। সাহাবিরাও বলেন নি। এটা ফুকাহারা তাদের নিজস্ব ইজতিহাদে বলেছেন। হয়তো মেয়েদের জন্য এটা উত্তম, ছেলেদের জন্য ওটা উত্তম। এটা একান্তই ইজতিহাদ। কোনো ছেলে যদি এমন করে, কোনো মেয়ে যদি এমন করে, সেও পরিপূর্ণ সুন্নাত আমল করল। তেমনি কিছু বিষয়– হাত বাঁধার বিষয়ে, হাত উঠানোর বিষয়ে, যেগুলো ফুকাহারা বলেন, এগুলো সহীহ, একাধিক হাদীসকে তারা ভাগ করেছেন। আর পার্থক্য মৌলিক ভাবে দুটি। রুকু এবং সিজদাহ গোটা হয়ে দেওয়া আর বসার সময় চারজানু হয়ে বসা। এই একটামাত্র হাদীস আছে এই ব্যাপারে। যে হাদীসের অর্ধেক ফুকাহারা কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন, আর অর্ধেক কেউ করেন নি। এজন্য পুরুষের মতো নামায যদি নারীরা পড়েন তার নামাযের কোনো ক্ষতি হবে, মাকরূহ হবে– এমনটা কোনো ফকীহ বলেননি। মূল মতভেদ হল উত্তম। কেউ বলেন, গোটাসোটা হয়ে পড়া উত্তম, কেউ বলেন পুরুষদের মতো পড়া উত্তম। কাজেই, আমরা সহীহ হাদীস মতো আমল করি। কেউ যদি গোটাসোটা হয়ে পড়েন– যেহেতু একটা হাদীস আছে, এবং অনেক ফকীহ গ্রহণ করেছেন, আর কুরূনে উলা, তাবিয়িদের যুগে কোনো হাদীস গ্রহণ করা হলে, এটার গুরুত্ব বেড়ে যায়। যদিও সনদগতভাবে আমরা পাচ্ছি না। এজন্য এটা নিয়ে আমরা ঝগড়া বিবাদে না যাই। এটা অতি সামান্য ব্যাপার। ফুকাহা ও সাহাবিদের যুগেও এই মতভেদ ছিল। আমরা সহীহ যেটা মনে করি, আমল করি, অন্য মতকে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করি। (উপস্থাপক: মহিলারা একটু জড়োসড়ো হয়ে নামায পড়বে, এই জড়োসড়ো ব্যাপারটা কী?) পুরুষেরা রুকু করবেন হাত দুটো সমান করে সম্পূর্ণ...।

আর মেয়েরা রুকু করবেন গুটিয়ে। সিজদায় গিয়ে পুরুষদের পেট এবং মাটির ভেতর ফাঁক থাকবে, একটা ছাগলের বাচ্চা যাওয়ার মতো। আর মেয়েরা মাটির সাথে লেপ্টে যাবে। যারা ওই দুর্বল হাদীসটা গ্রহণ করেছেন তারা এইরকম রুকু এবং সিজদাহ্‌ করার কথা বলেছেন। হাদীসের নির্দেশনা এটাই। তবে হাদীসটা সনদগতভাবে দুর্বল। আর অন্যরা বলছেন, না...; যেমন ইবরাহীম নাখয়ি (মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাতে তাঁর মত এসেছে)। তিনি বলতেন, পুরুষ এবং মেয়েদের নামায সমান।

প্রশ্ন-৪১: মহিলাদের মসজিদে জামাআতের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য আলাদা ঘর বানানো যাবে কি? ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুযায়ী নাকি মহিলাদের জামাআতে অংশগ্রহণ বৈধ নয়। এই ব্যাপারে জানতে চাই।

উত্তর: আসলেই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা ইমাম আবু হানীফা রাহ.র গ্রন্থগুলোও পড়িনা। আমরা আমাদের বুযুর্গদের নাম ব্যবহার করি এবং তাদের নামে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলি। ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান আশ শায়বানির আল মাবসূতসহ হানাফি মাযহাবের সকল কিতাবে আছে, কাতারে দাঁড়াবে প্রথমে ছেলেরা, তারপর শিশুরা, তারপর মেয়েরা। হানাফি মাযহাব অনুযায়ী যদি মেয়েরা জামাআতে নাই পড়তে পারে, তাহলে কাতারের সিরিয়ালগুলো কী জন্য লিখেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাব কুদূরিতেও লেখা আছে, প্রথমে পুরুষেরা তারপর শিশুরা...। বিষয়টা অন্য; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মেয়েদেরকে ঘরে সাধারণ নামায পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন। মসজিদে যেতে নিষেধ করতে নিষেধ করেছেন।

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

এবং

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

মেয়েরা মসজিদে জামাআতে নামায পড়তে চাইলে বাঁধা দেবে না, মেয়েদের জন্য ঘরে নামায পড়া উত্তম।[৬] পাশাপাশি ঈদের জামাআতে খুতবায় যাওয়া, খুতবা শোনা– এজন্য বিশেষভাবে উৎসাহ ও তাকীদ দিয়েছেন। কাজেই মেয়েদের জন্য মসজিদে যাওয়া বৈধ। সুন্নাতসম্মত। অনেকে বলেন, সাহাবিদের যামানায় নিষেধ হয়েছে। এটাও একটা সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। উমার রা. যেদিন শহীদ হন ওই দিনও তাঁর পেছনে মেয়েদের জামাআত ছিল এবং তাঁর স্ত্রী আতীকা বিনত নাওফিল ওই মসজিদে জামাআতে শরীক ছিলেন। যেটা সহীহ বুখারির হাদীসে রয়েছে। বিষয়টা হল, ফুকাহারা দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে এসে দেখেন, সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে, মেয়েরা বাইরে নামায পড়ার নামে গিয়ে অশালীন কাজে..., অথবা বাইরের বেহায়া যুবকেরা ইভটিজিং করে। তারা বলেন, ফিতনার ভয় থাকলে– মেয়েটা বাইরে গিয়ে আক্রান্ত হবে, অথবা কোনো অশালীন কাজে লিপ্ত হবে, এই ধরনের ভয় না থাকলে মসজিদে যাবে। ভয় থাকলে মসজিদে যাবে না, এই ব্যাপারটা খুবই যৌক্তিক। মসজিদে পড়া বৈধ কর্ম, জরুরি নয়। এই বৈধ কর্ম করতে গিয়ে যদি অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে বৈধটা না করাই ভালো। বর্তমানে আমাদের অবস্থা মোটেও তা নয়। ফুকাহারা সবাই একমত। মেয়েদের আলাদা ঘর থাকলে অবশ্যই নামায পড়তে পারবে। সারাবিশ্বের হানাফি মাযহাবের; মিশরে, তুরস্কে, ইরাকে– সেখানে মেয়েরা নামায আদায় করছে। পর্দার সাথে আলাদা ব্যবস্থা থাকলে অবশ্যই নামায পড়তে পারবে। বিশেষ করে জুমুআ-ঈদে তাদের জন্য ব্যবস্থা

---

[৬] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৫৬৬ ও ৫৬৭

করা, যেন তারা দীনের মূল ধারায় আসতে পারে। দীনের কথা শুনতে পারে।

প্রশ্ন-৪২: বুখারি শরীফে দেখলাম, নামাযের সময় কাপড় গুটিয়ো না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি তো শার্ট পরি, আমি গুটা দিই, তাহলে কি নামাযের সময় গুটা খুলে ফেলতে হবে?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন أن نكفت الثياب 'আমরা কাপড় গুটাব, অথবা রুকু সিজদায় যাওয়ার সময় কাপড়টা গুটিয়ে নেব, এটা নবীজি (ﷺ) নিষেধ করেছেন'।[৭] কাপড় গুটানো দুইরকম। পায়ের কাপড়গুলো গুটানো, অথবা বড় লুঙ্গি আছে, একটু গুটিয়ে নিয়ে রুকু সিজদা করা এগুলো মাকরূহ। নামাযের ভেতরে আমরা অবশ্যই কাপড়ের যে ভাঁজ, প্যান্ট জামা এগুলো ভাঁজ করবনা। এগুলো গুটিয়ে রাখবনা, স্বাভাবিক ছেড়ে দেব। এবং রুকু সিজদা করার সময় স্বাভাবিক করব, একটু সাইজ করে, কাপড়-চোপড় ঠিক করে করব, তা নয়। আমরা কাকে সাজদা করছি, আল্লাহর সামনে সবচে' বিনয়ী অবস্থায় যাব। কাপড় কীভাবে আছে আগেই ঠিক করে নেব। নামাযের ভেতরে আর কাপড় নিয়ে চিন্তা করব না। এটাই হল ইসলামের শিক্ষা।

প্রশ্ন-৪৩:আমরা নামাযের পরে যেসব তাসবীহ, আয়াতুল কুরসি পড়ি। এগুলো কি ফরযের পড়ে পড়ব, না সুন্নাতে মুআক্কাদার পরে পড়ব, নাকি সবকিছু শেষে পড়ব? কোনটা উত্তম?

উত্তর: দুটোই অপশন আছে। দুভাবেই পড়তে পারেন। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, যে নামাযে ফরযের পর সুন্নাতে

---

[৭] মুসনাদ শাফিয়ি, হাদীস নং-২৫৫; সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৮১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৯০

মুআক্কাদা থাকে, সুন্নাতে মুআক্কাদার পরে পড়বে। সব মাযহাবের ফুকাহারা একমত যে, সীমিত আকারের তাসবীহ্-তাহলীল হলে সুন্নাতের আগেই পড়তে পারেন। বিশেষ করে মাগরিবের পরে অনেক সময় আমরা লম্বা তাসবীহ তাহলীল করি, এগুলো, প্রয়োজনে আপনি সবগুলো (নামায) পড়ে নিয়ে করবেন। দুটোই চলবে।

প্রশ্ন-৪৪: নামাযের শেষে হাত তুলে মুনাজাত করা যাবে কিনা?

উত্তর: নামাযের পরে মুনাজাত– একাকি, নিজের মনে করাটাই সুন্নাত। দলবদ্ধ মুনাজাত যেটা আমরা করি, এটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবিরা করেননি। এটার বদলে একাকি করাটাই উত্তম। এটা আপনার আমলের জন্য। আপনি যখন করবেন, ইমাম সাহেবের সাথে না করে মাসনূন যিক্‌র করে একা করবেন। পরের সমালোচনা করা বা মসজিদে দলাদলি করার চেষ্টা করবেন না এইসব বিষয় নিয়ে। আল্লাহ তাআলা আমাদের হিফাযত করুন।

প্রশ্ন-৪৫: একদম পেছনে কেউ যদি সালাত আদায় করে, তাহলে পাশ কাটিয়ে চলে আসতে পারব কি না?

উত্তর: ছোটখাটো মসজিদে এটাকে দূরত্ব বলে গণ্য না করাই ভালো। স্বাভাবিকভাবে কিবলার দিকে নযর দিলে যতোটুকু নযর যায়, তার বাইরে দিয়ে গেলে, ইনশাআল্লাহ, অসুবিধা হবে না। অথবা যেখানে সিজদা দেওয়া হয়, সেখান থেকে তিনহাত বা দুই কাতার সামনে দিয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ, অসুবিধা হবে না। হাদীসে বারবারই,

بَيْنَ يَدَيِ المصَلِّي

অর্থাৎ মুসল্লির হাতের সামনে– সিজদার জায়গা অথবা তার

আশপাশ দিয়ে না যাওয়া, নামাযের মনোযোগ নষ্ট না হয় এদিকে লক্ষ্য রাখা ।[৮]

প্রশ্ন-৪৬: বিতর নামায আমরা যেভাবে পড়ি; যদি দুআ কুনুত না পড়ি, তাহলে সমস্যা আছে কি?

উত্তর: সালাতুল বিতরের একটা বিষয় কুনুত । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিতরে কুনুত পড়তেন । সারা বছর পড়তেন, নাকি মাঝে মাঝে পড়তেন– এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট রিওয়ায়াত নেই । ফুকাহাদের মধ্যে মতোভেদ রয়েছে । কুনুত না পড়লে কী হবে, এটার চেয়ে আমাদের অনুভব করতে হবে, কুনুত পড়লে কী হবে । আমরা তো সালাত আদায় করি আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য । আর কুনুতের মধ্যে আমরা আমাদের জীবনের সবচে' ভালো জিনিসগুলো চাই । আমি বুঝি না, আমরা চাওয়ার সুযোগগুলো কেন ছাড়ব । আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, কুনুতের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় দুআগুলো আল্লাহর কাছে বলব । কুনুতের সুন্নাত পদ্ধতি আছে । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতুল বিতরে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা শেষ করার পরে কুনুত পড়তেন । সুতরাং আমরা কুনুত পড়ব । তবে কুনুত ওয়াজিব না সুন্নাত, সারাবছর পড়ব না রমাযানে পড়ব– এ নিয়ে ফুকাহাদের ইখতিলাফ আছে । আমাদের দেশের ফুকাহারা বলেন, সারাবছর কুনুত পড়াই ওয়াজিব । আমরা একান্ত বাধ্য না হলে কুনুত পড়তেই থাকব । এটা অত্যন্ত ভালো নেক আমল । এবং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আল্লাহর কাছে চাই । আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন ।

প্রশ্ন-৪৭: ফজরের নামায, তাহাজ্জুদ আর বিতর যদি বাদ থাকে, তাহাজ্জুদের সময় শেষ হওয়ার পরে, তাহাজ্জুদ পড়ে,

---

[৮] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৫১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫০৭

বিতর পড়ে ফজর পড়া যাবে?

<u>উত্তর:</u> তাহাজ্জুদের নিয়তে, বিতর পড়ার নিয়ত যদি থাকে, হঠাৎ ফজরের আযান হয়ে গেছে বা ওয়াক্ত হয়ে গেছে, তাহলে আমরা বিতরটা পড়ে নেব। তাহাজ্জুদ আমরা বেলা উঠার পরে পড়ব। এ ব্যাপারে বিভিন্নরকম হাদীস রয়েছে। তবে ফজরের ওয়াক্তের পরেও বিতর পড়ার ক্ষেত্রে হাদীস রয়েছে আয়িশা রা. থেকে। একজন বলেছিলেন যে, ফযরের আযান হয়ে গেলে আর বিতর পড়া যাবে না। এর প্রতিবাদ করে বলেন, এমন ঘটেছে, আমি দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) সূর্য উঠার পরেও বিতর পড়েছেন। অর্থাৎ আপনি বিতর পড়বেন বলে নিয়ত করেছিলেন, হঠাৎ উঠে দেখেন ওয়াক্ত হয়েছে, আযান হয়েছে, তাহলে আপনি প্রথমে বিতর পড়ে নেবেন, পরে ফজর আদায় করবেন। তবে তাহাজ্জুদে যদি আপনি রেগুলার অভ্যস্ত হন, এটা হাদীস শরীফে এসেছে, তাহাজ্জুদের নিয়তে শুয়েছিলেন, ঘুম ভাঙেনি; সূর্য উঠার পর সে যেন সালাত আদায় করে নেয়। আল্লাহ তাআলা তাকে তাহাজ্জুদের সাওয়াবই দান করবেন। তবে হাদীসে আরও কিছু প্রশস্ততা এসেছে। কোনো কোনো হাদীসে এমনও এসেছে যে, বিতরসহ তাহাজ্জুদ পুরোটাই দিনের বেলা কাযা করার। অর্থাৎ যেটা আমরা বলি সূর্যোদয়ের আধাঘণ্টা পর থেকে সূর্য মধ্য আকাশে যাবার আগ পর্যন্ত। অর্থাৎ এই সময় সে বিতরসহ পুরো তাহাজ্জুদ কাযা করতে পারে। আবার কোনো হাদীসে আছে, বিতরসহ কাযা করলে, বেজোড় না করে জোড় করে নেবে। আসলে দীনের ভেতর অনেক প্রশস্ততা রয়েছে, আমরা যে আমলগুলো করছি, এটা সুন্দর। বিতরটা আমরা ফজরের আগে কাযা করে নেব, তাহাজ্জুদটা বেলা উঠার পরে করব। এটা হাদীসসম্মত। আবার কাউকে যদি অন্যরকম করতে দেখি– আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সকল সুন্নাতকে ভালোবাসি, যেটা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য

মনে হয়, আমল করি। আল্লাহ্ তাওফীক দান করুন।

প্রশ্ন-৪৮: মাগরিবের সালাতের তিন রাকআতের শেষ রাকআত তিনি পেয়েছেন। ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পরে বাকি দুই রাকআত কীভাবে তিনি আদায় করবেন?

উত্তর: বাকি দুই রাকআতে, আপনি উঠে দাঁড়িয়ে এক রাকআত পড়বেন, সূরা ফাতিহা এবং আরেকটা সূরা দিয়ে; তারপর বসে 'আত্তাহিয়াতু' পড়বেন। কারণ এটা আপনার জন্য দ্বিতীয় রাকআত, এরপর উঠে আরেক রাকআতে সূরা ফাতিহা আরেকটা সূরা দিয়ে পড়ে আবারো বসে সালাম ফিরিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন-৪৯: আমি একদিন তারাবীহর নামায চলাকালে মসজিদে গিয়ে দেখি নামায শুরু হয়ে গেছে। তখনো আমি ইশার ফরয নামায পড়ি নাই। তখন জামাআতে শরীক হয়ে ইশার ফরয দুই রাকআত পড়েছি, নামায শেষ করে আমি দাঁড়িয়ে বাকি দুই রাকআত আদায় করেছি। আমার নামাযটা কি হবে?

উত্তর: মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে হাম্বলি, শাফিয়ি, মালিকি মাযহাবের ফুকাহারা এটাকে জায়িয বলেন। তাঁরা বলেন, তারাবীহর পেছনে কেউ যদি ইশার নিয়ত করে, তাহলে জামাআতে নামাযের সাওয়াব হয়ে যাবে। তার নিয়ত তার, ইমামের নিয়ত ইমামের। কিন্তু অন্যান্য অনেক ফকীহ, যেমন ইমাম আবু হানীফা ও কুফার কোনো কোনো ফকীহ বলেন, যে ইমামের যে নিয়ত, ওই ইমামের পেছনে ওই সালাতের নিয়ত করতে হবে। যেহেতু আমাদের দেশে সাধারণভাবে হানাফি মাযহাবের ফতোয়া দেওয়া হয় এবং এটাই উত্তম সাবধানতামূলক ভাবে...। আপনি যেটা করেছেন, হাদীসের আলোকে অচল বলা কঠিন। কারণ, হাদীসে এসেছে, মুআয

ইবন জাবাল রা. রাসূল (ﷺ) এর পেছনে ইশার নামায পড়ে গিয়ে, এরপর নিজের মহল্লায় গিয়ে ইশার নামায পড়াতেন। তাহলে ইশার নামায মুআয নফল পড়তেন। নফলের পেছনে মুকতাদিরা ফরযের ইকতিদা করতেন। কাজেই নফল নামাযের নিয়তকারীর পেছনে ফরয নামাযের ইকতিদা হবে বলেই বোঝা যায়। এটাই আহমাদ, শাফিয়ি ও মালিকের দলীল। আর যারা বলেন, এটা হবে না, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেহেতু এরকম করেন নি, এটার উপর নির্ভর করেন। আমরা সাধারণভাবে এই ধরনের কর্ম ধাড়রফ করব (এড়িয়ে যাব)। আপনি যেটা করে ফেলেছেন, আশা করা যায়, হাদীসের আলোকে এটা অবৈধ হবে না। তবে ভবিষ্যতে এটা না করে, আপনি ইশার নামায নিজে পড়ে নেবেন, এরপর জামাআতে শরীক হবেন।

প্রশ্ন-৫০: কয়েকদিন আমি হসপিটালে ভর্তি ছিলাম, এজন্য সালাত আদায় করতে পারি নি। এই সালাতগুলো আদায় করার উত্তম সিস্টেম কোনটি?

<u>**উত্তর:**</u> আমাদের বুঝতে হবে, সালাত যেন কাযা না হয়।

لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً

[তোমরা ফরয সালাত পরিত্যাগ কোরো না।][৯] এক সালাত যেন আমরা সময় থেকে পিছিয়ে না আনি। কারণ আল্লাহ তো সালাতকে সহজ করেছেন। আমি যদি অসুস্থ হই, ওযু করতে না পারি, তাহলে তায়াম্মুম করে শোয়া অবস্থায়, যতোক্ষণ আমাদের চেতনা আছে, যেকোনোভাবে আমরা অন্তত ফরয সালাতটা যেন চোখের ইশারায় হলেও, উত্তর-দক্ষিণ যেদিকে সম্ভব মুখ করে আদায় করব। আর যদি আমি একটা সালাতের পুরো ওয়াক্ত অজ্ঞান থাকি, বেহুঁশ থাকি, তাহলে ওই সালাতটা

---

[৯] সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৪০৩৪

আমার উপরে ফরয নয়। এদিকে আমাদের সবার খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের সালাত যেন কোনোভাবেই ওয়াক্তের পরে চলে না যায়। ওয়াক্তের ভেতরে যতটুকু হাযিরা দেব, আমরা একটা পরিপূর্ণ ফরয সালাত আদায়ের সাওয়াব পাব। আর ওয়াক্তের পরে যদি কাযা করি, আর সেই কাযা করাটা, ওযরটা, সাধারণতভাবে কোনো কারণেই কাযা করা বৈধ নয়, তাহলে আমরা আদায় করার পরেও গুনাহগার হয়ে যাব, আমাদের কঠিনভাবে তাওবা করতে হবে। আপনার এই কাযা সালাত আদায় করা সর্বোত্তম পন্থা হল, যেহেতু চার-পাঁচদিনের কাযা, আপনি একসময়ে, একদিনে সুযোগমতো, যতো দ্রুত পারেন সালাতগুলো আদায় করে নেবেন। আপনি দায়ভারমুক্ত হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন-৫১: আমার অনেকগুলো সময় কেটে গেছে, আমি নামায পড়তে পারি নি। নামাযগুলো আমি হিশেব করে নিয়েছি। রোযাগুলোও হিশেব করে নিয়েছি। বিশ হাজার ওয়াক্তের মতো নামায কাযা হয়েছে। রোযার সংখ্যা তিন থেকে দুইশর মতো। এখন আমি কাযা নামায পড়ছি, রোযাও শুরু করেছি। একজন বলল যে, নামাযের কাযা করা যাবে না। এটা সত্যি নাকি?

উত্তর: আপনি রোযাগুলো অবশ্যই কাযা করবেন। রোযার ব্যাপারে কোনো বিকল্প নেই। যদি আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, অক্ষম হন সেক্ষেত্রে ফিদিয়া দিতে হবে। সালাতের ব্যাপারটা জটিল। কোনো মুমিন-মুমিনাহ দীর্ঘদিন সালাত পড়ে নি, এরকম ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে ছিল না। সালাতকে আল্লাহ এতো সহজ করেছেন, যে যতোটুকু পারবে, হাযিরা দিলেই হয়। আর সাহাবায়ে কিরাম থেকে বিভিন্ন হাদীস এসেছে, তাঁরা বলতেন, মুসনাদ আহমাদে এসেছে, আমরা কোনো গুনাহকে কুফরি মনে করতাম না; কিন্তু নামায কাযা

করাকে তাঁরা কুফরি মনে করতেন। যে নামায পড়ে না সে মুসলিম নয়। এজন্য সাহাবিদের যুগেও, সালাত পড়ে না, এমন মুসলিম কল্পনা করা যেত না! যে নামায পড়ত না সে তাওবা করে মুসলিম হয়ে নামায আদায় করত। আমাদের সমাজে বিষয়টা ভিন্ন। অনেকে মুসলিম, কালিমা পড়ি, কিন্তু গুরুত্ব না বোঝার কারণে আমরা নামায পড়তে পারি না। এদের জন্য বিষয়টা কী হবে? কুরআন কারীমে, হাদীস শরীফে অল্প কাযা, অসুস্থতার কারণে, কঠিন অবস্থায় চারপাঁচ ওয়াক্ত কাযা করেছেন, এটা অবশ্যই কাযা করতে হবে। কিন্তু অবহেলায় দশবছর সালাত কাযা করা হয়েছে, এগুলো পড়তে হবে– হাদীস শরীফে এরকম নেই, কুরআনে এরকম নেই। এক্ষেত্রে ফুকাহারা মতভেদ করেছেন। সবচে' উত্তম হবে, আপনি গভীর তাওবা করবেন। কারণ আপনি অত্যন্ত কঠিন পাপ করেছেন। আর বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবেন। আল্লাহর তাআলার কাছে তাওবা করবেন, তাহাজ্জুদ পড়বেন, আর ভবিষ্যতে যেন সালাত কাযা না হয়, এরকম চেষ্টা করবেন। অল্প কাযা হলে আমরা বলতাম কাযা করে নেন; এজন্য এতো দীর্ঘ সালাত কাযা করা, এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। হিশাব রাখাও কঠিন। আর এটা এমন পাপ, যার জন্য গভীর তাওবা করতে হবে।

প্রশ্ন-৫২: আমি ডিউটি অবস্থায় নামায পড়তে পারি না। নামায কাযা হয়ে যায়। যুহরের নামায এমনকি আসরের নামাযও। মাগরিবের নামায জামাআতে পড়ি না, এমনিই পড়ি। এখন আমি মাগরিবের ওয়াক্তে আগে যুহর, আসর পড়ব নাকি মাগরিব পড়ে এগুলো পড়ব?

<u>উত্তর:</u> প্রথমেই বলব ভাই, আপনি ডিউটির ভেতরেই ওযু রেখে অন্তত ফরয নামাযটা যে কোনো মূল্যে পড়ে (নেবেন), যেহেতু নিয়মিত (এরকম হচ্ছে)। আপনি দাঁড়িয়ে, ইশারায়, যেভাবেই

হোক, চার রাকআত নামায পড়তে তিন মিনিট সময় লাগবে। আপনি ওই অবস্থায়, ওযু রাখবেন। নামাযটা পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। নিয়মিত নামায কাযা করা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। আর এছাড়া একটু আওয়াল ওয়াক্তে, শেষ মুহূর্তে (পড়ে নেবেন)। আর যদি কাযা হয়েই যায়, মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে, তাহলে প্রথমে যুহর তারপর আসর তারপর মাগরিব পড়বেন। (যদি) মাগরিবেরও শেষ ওয়াক্ত হয় তাহলে প্রথমে মাগরিব পড়ে নিয়ে এরপর যুহর, আসর পড়বেন। তবে নামায নিয়মিত কাযা হয়ে যাওয়া আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয়। আপনি যে কোনো মূল্যে অন্তত ফরয নামাযটা সময়ের ভেতরে পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। ইনশাআল্লাহ, চেষ্টা করলে আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করে দেবেন।

প্রশ্ন-৫৩: প্রায় দুই তিন মাস ধরে, তাহাজ্জুদ নামায পড়ব পড়ব বলি, প্রতিদিন রাতে বলে শুই। কিন্তু আমি পড়তে পারি না, ঘুম থেকে উঠতে পারি না। আমি সারাদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি। কিন্তু আমি শুনেছি, তাহাজ্জুদ নামায পড়লে যেকোনো জিনিস চাইলে আল্লাহ পাক দেন। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে অনেক কিছু চাই। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে চাইলে কি আল্লাহ দেবেন? আর আমি তাহাজ্জুদ নামায পড়ব পড়ব বলে শুই, এতে কি আমার গুনাহ হয়?

উত্তরঃ প্রথম কথা হল, আপনি তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়তে শোন, এটাও একটা ইবাদত। হাদীস শরীফে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কেউ যদি তাহাজ্জুদের নিয়তের শোয়, ঘুম না ভাঙে, তাহলে নিয়ত যদি শক্ত হয়, সুদৃঢ় হয়, নিয়তের কারণে তাহাজ্জুদের সাওয়াব পেয়ে যাবে। ঘুমটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাদাকাহ হিশেবে গণ্য হবে। তবে আপনার যদি এটা অভ্যাসে পরিণত হয়, কোনোভাবেই না

পারেন, তাহলে দ্বিতীয় বিকল্প হল, ঘুমানোর আগে– তাহাজ্জুদ হবে না, কিয়ামুল লাইল হবে– আপনি রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা ঘুমানোর আগে ওযু করে দুই রাকআত, চার রাকআত, ছয় রাকআত, যা আপনি পারেন, কিয়ামুল লাইলের পর বিতর পড়ে আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। এক্ষেত্রে আপনি কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব পেয়ে যাবেন, তাহাজ্জুদের মূল রূপ। আর দ্বিতীয় হল, এইসময় দুআ কবুল হয়, কাজেই দুআ কবুল হওয়ার প্রথম সময়টা আপনি পেয়ে গেলেন, আপনি তাহাজ্জুদের সিজদায় গিয়ে যেটা চাওয়ার আছে চাইবেন। দ্বিতীয় যেটা বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে চাইলে পাবেন কিনা? অবশ্যই পাবেন। তবে নামাযের সিজদায় দুআ করার অভ্যাস করবেন। বিশেষ করে যদি তাহাজ্জুদে না উঠতে পারেন, ইশরাকের আগে ঘুমাতে যাওয়ার আগে নফল সুন্নাত যে নামাযগুলো আছে, ফরয নামাযেও আপনি মনের আবেগ দিয়ে আল্লাহর কাছে মনের কথাগুলো বলবেন। এছাড়া আমরা যে দুআ মাসূরা পড়ি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনেক দুআ মাসূরা আছে, যাতে আমাদের সুস্থতা সবলতা শান্তি সবকিছু চাওয়া হয়। এই দুআগুলো মুখস্থ করে আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই চাইবেন। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ সবই দেবেন।

প্রশ্ন-৫৪: শেষরাতে বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাযের সময়, সিজদায় গিয়ে কেমন করে আল্লাহর কাছে দুআ চাইতে হয়?

উত্তর: তাহাজ্জুদে এবং সকল সালাতে, আপনি সাধ্যমতো সিজদায় দুআ করবেন। খুবই সুন্দর হয় যদি কুরআন কারীম এবং হাদীস শরীফের দুআগুলো করেন। আপনি কুরআন কারীমের দুআ'গুলো মুখস্থ করবেন এবং হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেসব দুআ শিখিয়েছেন। এগুলো পড়বেন। সাজদায় কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত নিষিদ্ধ, তবে আপনি

দুআ করতে পারেন। কারণ দুআতে আয়াত পুরো আসে না, যেমন আমরা বলিঃ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [১০]

এটা কিন্তু পুরো আয়াত না, আগে আছে পরে আছে।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [১১]

এটাও কিন্তু পুরো আয়াত না। এজন্য আপনি দুআ'গুলো পড়তে পারেন। কোনো সমস্যা নেই। আর হাদীস শরীফে অনেক সুন্দর সুন্দর হৃদয় কেড়ে নেওয়ার মতো দুআ' আছে। একটা বাক্যে দুনিয়ার সবকিছু চাওয়া হয়ে যায়, দুনিয়া এবং আখিরাত। এগুলো আপনি হাদীসের বইতে পাবেন। সহীহ হাদীসভিত্তিক দুআর বই 'হিসনুল মুসলিম' বাজারে পাওয়া যায়, এটা খুব ভালো বই। আমার নিজেরও দুটি বই আছে। একটা 'মুনাজাত ও নামায', আরেকটা হল 'রাহে বেলায়াত'। এগুলোতে আমরা সহীহ হাদীসের দুআ' আনার চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন-৫৫ঃ তাহাজ্জুদের নামাযের দুআগুলো বাঙলায় বলা যাবে কিনা?

উত্তরঃ তাহাজ্জুদের নামাযে মাতৃভাষায় দুআ করার অনুমতি অনেক ফকীহই দিয়েছেন। আবার কোনো কোনো ফকীহ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। এজন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করব আরবি সুন্নাত লফযে দুআ করা। অপারগ হলে, আশা করি, মাতৃভাষায় দুআ করলে আল্লাহ কবুল করবেন, ইনশাআল্লাহ। তবে মাতৃভাষায় দুআ করতে গিয়ে এমন কোনো ভাষা ব্যবহার করতে পারে যেটা হয়তো ঠিক হল না, নামায ভেঙেও যেতে

---

[১০] সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২০১

[১১] সূরাঃ ইসরা, আয়াতঃ ২৪

পারে। এজন্য আরবি সুন্নাত বাক্যগুলো বলা উত্তম হবে।

প্রশ্ন-৫৬: কুরআন তিলাওয়াতের সময় সিজদার আয়াত পাওয়া যায়। তখন নামাযে যেভাবে আদায় করে সেভাবেই করব? নাকি অন্য কোনো দুআ' আছে?

উত্তর: সিজদাটা সালাতের মতোই হবে। সালাতের সিজদা যে প্রকারে করা হয়, ওইভাবেই করতে হবে। এর দুআ স্বাভাবিক 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলব। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিশেষ বিশেষ সূরা, সূরা সাদের সিজদায় দাউদ আ. কেন্দ্রিক কিছু দুআ' পড়েছেন। এগুলো আপনি মুখস্থ করতে পারেন। তাছাড়া সিজদায় আমরা যে দুআ পড়ি, সেটাই পড়ব। 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' তিনবার বলার পরে অন্যান্য দুআ'ও পড়া যেতে পারে। বসে থাকলে সিজদা বসেই করা যাবে। সিজদায় যাওয়ার সময় 'আল্লাহ আকবার' বলা, এটা সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। উঠার সময় 'আল্লাহ আকবার' বলবে, এই ব্যাপারে সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। এজন্য ফুকাহাদের মধ্যে ইখতিলাফ আছে। কেউ বলছে, 'আল্লাহ আকবার' বলে সিজদায় যাবে, তবে উঠার সময় নীরবে উঠে পড়বে। অন্যরা বলছেন, উঠার সময় 'আল্লাহ আকবার' বলবে। اللهُ أَعْلَمُ

প্রশ্ন-৫৭: কিছুদিন আগে আমি শরীয়তপুর ডামুড্যা যাচ্ছিলাম। যখন মাগরিবের ওয়াক্ত হল, তো সফররত বলে আমি মাগরিব ও ইশার সালাত একসাথে আদায় করি। যখন আমি আমার আরেক ভাইকে উদ্বুদ্ধ করি, তিনি বিষয়টাকে সেইভাবে গ্রহণ করলেন না।

উত্তর: জাম্‌উ বাইনা সালাতাইন: الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ। অর্থাৎ সফরের কারণে মাগরিব ও ইশা একসাথে পড়া এবং যুহর ও

আসর একসঙ্গে পড়া। এটা প্রায় কয়েক ডজন হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) করেছেন। সফরের সময় যুহরের ওয়াক্তে যুহর-আসর পড়ে নিতেন। অথবা আসরের ওয়াক্তে যুহর-আসর পড়তেন। মাগরিবের ওয়াক্তে মাগরিব-ইশা অথবা ইশার ওয়াক্তে মাগরিব-ইশা। এটা আমরা হজ্জে গেলে দেখতে পাই। কোনো কোনো ফকীহ্ এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে বলেছেন, নামায যেহেতু ওয়াক্তমতো ... কাজেই শুধু হাদীসের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা যাবে না। হজ্জে যেহেতু মুতাওয়াতির বিষয়, সুতরাং হজ্জের ক্ষেত্রে জমা করা যাবে। অন্যক্ষেত্রে করা যাবে না। আবু হানীফা রাহ. এই মত পোষণ করেছেন। তবে হাদীসের দিক থেকে জমা বাইনা সালাতাইন অর্থাৎ সফরে চলন্ত অবস্থায় যুহর-আসর জমা করা, মাগরিব-ইশা জমা করা, এটা অত্যন্ত শক্তিশালী মত। এবং আমাদের হানাফি মাযহাবের অনেক পুরোনো ফকীহ্ এটা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ বিভিন্ন সময়ে এটার অনুমতি দিয়েছেন। অনেক হানাফি ফকীহ্ করেছেন। কাজেই এটা যেহেতু সহীহ্ হাদীসে এসেছে... এটা যদি কেউ না করেন, এটার উপরে আপত্তি না করি। যদি কেউ করেন, যেহেতু সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আমাদের মাযহাবের অনেক আলিম এটা গ্রহণ করেছেন এবং সবচে' বড় কথা, এটা রাসূল (ﷺ) এর যুগে সাহাবিরা করেছেন। তাঁর ওফাতের পরেও অগণিত সাহাবি এটা আমল করেছেন। কাজেই এইসব আমলের কারণে যদি কাউকে গোমরাহ বলি, তাহলে আমাদের মনে হবে যে সাহাবিরাও, যাঁরা নবীজির ওফাতের পরে জমা করতেন, তাঁরাও বুঝি গোমরাহ হয়ে গেল! আল্লাহ তাআ'লা হিফাযত করুন।

প্রশ্ন-৫৮: আমার আবাসস্থল ঢাকা থেকে শ্বশুরবাড়ির দূরত্ব হচ্ছে ২৫০-৩০০ কিলোমিটার, আবার শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়ির দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার। যদি আমি ১৫ দিনের কম

সফর করি, সেক্ষেত্রে আমার নামাযের নিয়ম কী হবে?

উত্তর: আপনার শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ স্বামীর বাড়ি যদি হয়, তাহলে আপনি স্বামীর বাড়িতে গেলে অবশ্যই পূর্ণ করবেন। পথে চলাকালীন আপনি মুসাফির থাকবেন। দুই রাকআত পড়বেন। আর যখন বাড়িতে পৌঁছে যাবেন, একদিনের জন্য হোক আর পনের দিনের জন্য হোক, সেখানে আপনাকে পুরো নামায পড়তে হবে। যেহেতু ওটা স্বামীর বাড়ি, আপনার বাড়ি; সেখানে আপনাদের অধিকার আছে। আর পিতার বাড়িতেও তাই। পিতার বাড়িতে জামাই অবশ্য মুসাফির। কিন্তু কন্যা মুসাফির নাকি মুকীম, এই নিয়ে ফুকাহারা বিভিন্ন মত বলেছেন। কারণ, বিবাহের পরে কন্যার বাড়িতে নিজস্ব কোনো জায়গা নেই; ঘর নেই, ভাইয়ের ঘরে যেতে হয় ইত্যাদি। সর্বাবস্থায়, আপনি পিতার বাড়িতে যাওয়ার সময় মুসাফির থাকবেন। আর পিতার বাড়িতে যদি আপনার নিজস্ব ঘর থাকে বা থাকার ব্যবস্থা থাকে, পিতার মৃত্যুর পরে আপনি সম্পত্তি পেয়েছেন, নিজের ঘর না করলেও, থাকার ঘর আছে; সেক্ষেত্রে আপনি সেখানে পৌঁছানোর সময় মুকীম হয়ে যাবেন।

প্রশ্ন-৫৯: ইশার আযান হওয়ার দুইঘণ্টা পর আমি বাসায় পৌঁছলাম, কসরের দূরত্ব থেকে। মুকীম হলাম। দুইঘণ্টা পর যখন আমি ইশার নামায পড়ব, সেটা কি কসর পড়ব নাকি পুরো চার রাকআতই পড়ব?

উত্তর: আপনি ইশার ওয়াক্তেই প্রবেশ করেছেন। ইশার আযানের দুইঘণ্টা পরেও ইশার ওয়াক্ত থাকে। পুরোপুরিই থাকে। আপনি ইশার ওয়াক্তের ভেতরে বাড়িতে ঢুকলেই পুরো পড়তে হবে। ওয়াক্ত পার হওয়ার পরে যদি বাড়িতে ঢোকেন, তাহলে আপনি মুসাফির অবস্থার নামায পড়বেন।

প্রশ্ন-৬০: আমি যেখানে নামায পড়ি, তার পাশে আমার হাজব্যান্ডের ছবি। ওটাকে আমি উল্টিয়ে রেখে নামায পড়েছি। আমার হাজব্যান্ড বলেছে, হাজব্যান্ডের ছবি রাখা যায়...

উত্তর: স্বামীর ছবি দেখা যায়। কিন্তু ঘরের ভেতরে স্বামীর ছবি হোক, আর যার-ই ছবি হোক, যে কোনো ছবি থাকলেই ওই ঘরে ফেরেশতা ঢুকবে না এবং সেখানে নামায পড়লে নামায কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্বামীর ছবি, স্ত্রীর ছবি দেখা বৈধ। তবে নামাযের সময়...। এমনকি অন্যান্য সময়, আমরা ছবি টানানোর এই বদ-রুসুম (কুপ্রথা), যারা অন্তত আল্লাহর পথে চলতে চান...। স্বামীর প্রতি ভক্তি থাকবে, কিন্তু স্বামীর ছবির প্রতি কোনো ভক্তি নেই। পিতার জন্য ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকবে, দুআ' থাকবে, কিন্তু ছবি টানানো ঘরে, প্রিয়জনদের, এটা খুব কঠিন গুনাহের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে ঘরে ছবি ছিল সে ঘরে প্রবেশ করেননি। রহমতের ফেরেশতারা প্রবেশ করেননা বলে বারবার বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের অকারণ পাপ থেকে হিফাযত করুন।

মৃত্যু/জানাযা/কাফন-দাফন/যিয়ারত

প্রশ্ন-৬১: মুর্দাকে যখন গোসল করানো হয়, তখন গরম পানিতে বরই পাতা জাল দিয়ে, সেই পানি ব্যবহার করা হয়। আমি জানতে চাই, কুরআন-হাদীসের আলোকে এই নিয়মটা কতোদিন পূর্ব থেকে চালু হয়েছে?

উত্তর: এটা হাদীস শরীফে এসেছে, 'সিদ্‌র' [السِّدْرُ]; যেটা আরব দেশের বরই ধরনের। এই সিদ্‌র পাতা যার মধ্যে ক্ষার এবং তৎকালীন সময়ে সাবান হিসেবে ব্যবহার হত। ওই সময়ে সাবানের প্রচলন ছিল না। ইসলাম তো সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য। গ্রামের মানুষ, শহরের মানুষ, primitive মানুষ, শিক্ষিত মানুষ– সবার জন্যেই ইসলাম। ইসলামের বিধানগুলো অতি সহজ, জীবন ঘনিষ্ঠ, সহজেই লোকে পালন করতে পারে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুর্দাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য এই বরইের পাতা জাতীয় সিদ্‌র পাতার পানি দিয়ে গোসল করার কথা বলেছিলেন। এটা হাদীস শরীফে এসেছে।

প্রশ্ন-৬২: আমাদের এলাকায় কেউ মারা গেলে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার বার কালিমা পড়ে তারপর কবরে নেওয়া হয়, এতে নাকি কবরের আযাব মাফ হয়ে যায়। কথাটা কি ঠিক?

উত্তর: আমরা যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইসলাম চাই তাহলে সেটা হবে একরকম, আর যদি আমরা প্রচলিত ইসলাম চাই, সেটা হবে আরেক রকম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবিদের যুগে তাকান, সেখানে কখনো পাবেন না, কোনো আলিম দেখাতে পারবেন না যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সন্তানের মারা যাওয়ার সময় কিংবা সাহাবিগণ তাঁদের আপনজন মারা যাওয়ার সময় কেউ কখনো মৃত্যুর পরে কালিমা খতম

করেছেন; প্রচলিত যতো খতম আছে– কালিমা খতম, দুআ' খতম– সবই আমাদের পরবর্তী যুগের বানানো। ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যে, মৃত্যুর পর মূলত দুটো জিনিসের দায়িত্ব আমাদের থাকে। একটা হল, তার জন্য সাদাকা করা, দান করা, বিশেষ করে সাদাকায়ে জারিয়া ওয়াকফ্ করা। আরেকটা হল, তাদের জন্য দুআ' করা। আমরা চিন্তা করি, শুধু দুআ' করা, একটু শুকনো হল, আমরা দুআ'র আগে আরো কিছু পড়ে দিই। আসলে ইসলামে এটা বলা হয়নি। কুরআন এবং সুন্নাহয় দুআ' করতে বলা হয়েছে। আপনি যখনই তার রহমত, মাগফিরাতের জন্য দুআ' করবেন, দুআ' কবুল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তির আমলনামায় সাওয়াব জমা হয়ে যাবে! আপনাকে দুআর আগে কিছু কালিমা পড়ে নিতে হবে, এগুলোর সাওয়াব দিতে হবে– এইভাবে কখনোই কোনো হাদীসে আসে নি। এগুলো বিভিন্ন প্রচলিত গল্প, বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের দীনের ভেতরে প্রবেশ করেছে। সবচে' ভালো হয়, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতের মধ্যে থাকতে পারি। মানুষের ইন্তিকালের পর সাদাকায়ে জারিয়া করব আর দুআ' করব। কালিমা খতম করলে কবরের আযাব মাফ হবে, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ধারণা। কুরআন কারীম কিংবা সহীহ হাদীস, এমনকি যয়ীফ হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়না।

<u>প্রশ্ন-৬৩:</u> অনেক সময় মাযারে ঢোকার সময় জুতা খুলতে বাধ্য করা হয়। কবরের আশেপাশে যাওয়ার জন্যে কি আমরা জুতা খুলতে বাধ্য?

<u>উত্তর:</u> হারাম শরীফে কাবা ঘরের মাতাফের ভেতরে আমরা জুতা পায়ে দিয়ে তাওয়াফ করি এবং করা বৈধ। কারণ রাসূল (ﷺ) ও সাহাবিগণ করেছেন। মসজিদে নববির ভেতরে, মসজিদে

হারামের চত্বরেও আমরা জুতা পায়ে চলি, এটা বৈধ এবং হাদীসে নির্দেশ আছে। জুতা খোলাটাকে ধর্মীয় পবিত্রতা মনে করা ইহুদি-খ্রিস্টানদের অন্ধ অনুকরণ করা ছাড়া কিছুই না। হাদীসে এসেছে, সাহাবিরা প্রশ্ন করেছেন, ইহুদি-খ্রিস্টানরা জুতা খুলে ইবাদত করে, আমরা কী করব? (রাসূল বলেছেন) তোমরা জুতা পায়ে দিয়ে সালাত আদায় করো। কাজেই জুতা পায়ে দিলে ধর্মীয় পবিত্রতা নষ্ট হবে; এটা সম্পূর্ণ ইহুদি-খ্রিস্টানদের চেতনা। কবরের আশেপাশের জায়গাকে ধর্মীয় পবিত্র মনে করা আরো অবৈধ। কোনো ব্যক্তি যদি কোথাও শুয়ে থাকেন, আমরা তার কবর যিয়ারত করব স্বাভাবিকভাবে। কবর যিয়ারতের জন্যে ওযু করাও জরুরি নয়। আমরা তাকে সালাম দেব, তার জন্য দুআ করব, চলে আসব। দুর্ভাগ্য যে, কবরগুলোকে আমরা ভক্তি করতে করতে পূজার পর্যায়ে নিয়ে গেছি। যে ইবাদত আমরা মসজিদে না করি, তার চেয়ে ভক্তি কবরকে করি। আমি নিজে দেখেছি, ডিআইটির পাশে একটা মসজিদ আছে এবং পাশেই একটা মাযার আছে। মসজিদে নামায পড়ে গিয়ে দেখলাম, মাযারের পাশে কী আবেগভরে কাঁদছেন এক ভদ্রলোক। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহ. লিখেছেন, যারা মাযারের পাশে এইভাবে কাঁদে, তারা যদি মাযারের পাশে না কেঁদে হাটে-বাজারে-গানের দোকানের পাশে বসে আল্লাহর কাছে কাঁদত তাহলে ভালো হত। আল্লাহ, যিনি সবকিছু দেখছেন, রাব্বুল আলামিন, রহমান, রহীম; তাঁকে ভুলে গিয়ে আমরা মনে করছি, এই বুযুর্গ শুয়ে আছেন, তিনি বোধহয় আমার ডাকটা তাড়াতাড়ি শুনবেন। সুতরাং কবর মাযারের কোনো sanctity (ধর্মীয় পবিত্রতা) নেই। তবে কবরের ভেতরে জুতা পায়ে দিয়ে যাওয়া নিষেধ আছে। গোরস্থানের ভেতরে কবরের উপরে জুতা পায়ে দিয়ে নিষেধ আছে। কবরের আশেপাশে জুতা পায়ে দিয়ে যাওয়া বা কোনো পীরের দরবারে জুতা খুলে যাওয়া, এটা একদিকে ইহুদি-খ্রিস্টানদের অন্ধ অনুকরণ, আরেকদিকে আমরা রাসূল

(ﷺ) এর মসজিদে নববি, মক্কা, মদীনার চাইতে আমাদের ঘর-দুয়োরকে বেশি পবিত্র মনে করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হিফাযত করুন। সহীহ চিন্তা করার তাওফীক দান করুন।

প্রশ্ন-৬৪: জানাযার নামাযে অনেক সময় আমরা জুতা খুলে দাঁড়াই, এটা জরুরি কিনা? কুরআন সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: জুতা যদি পাক হয়, তাহলে জুতা পরে সালাত আদায় করা যাবে। যদি জুতা পাক থাকে, জুতার মাথা নরম হয় তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও আদায় করা যাবে। হাদীস শরীফে এসেছে, তোমরা যখন মসজিদে আসবে, তখন জুতায় যদি ময়লা না থাকে তাহলে জুতা পরেই সালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও অনেক সময় জুতা পরে সালাত আদায় করেছেন। যে জুতায় পা কিবলামুখি থাকে, পাগুলো মাটিতে লাগে, নরম। ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মে পবিত্র স্থানে জুতা পায়ে দিয়ে ধর্মীয় পবিত্রতার সাথে contradictory (সাংঘর্ষিক)। এজন্য তারা জুতা খোলেন। আর ইসলামে বলা হয়েছে জুতা খোলাটা পবিত্রতা নয়, পরিচ্ছন্নতার অংশ। জুতায় যদি ময়লা না থাকে তাহলে জুতা পরে সালাত আদায় করা যাবে। জানাযার সালাতেও একই কথা। নাপাকি না থাকলে নিঃসন্দেহে সালাত আদায় করা যাবে। তবে সন্দেহ থাকলে আমরা খুলে রেখে মাটিতে দাঁড়াব। এটাই উত্তম হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন-৬৫: যখন সূর্য উদিত হয়, ওই সময়ে জানাযার নামায পড়া যায় কি না?

উত্তর: এক্ষেত্রে আমার যতোটুকু জানা আছে– সূর্যোদয়, সূর্য ঠিক মধ্যাহ্নে থাকা এবং সূর্য ঠিক যখন অস্ত যায়– এই তিন সময়ে সকল প্রকার নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমি বা হারাম বলেছেন

অনেকে। কারণ হাদীস শরীফে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। দুই সময়ে নফল পড়া নিষেধ করা হয়েছে, আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত এবং ফযরের নামায শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। জানাযার নামায নফলের সময় পড়া যায়, ফজরের নামায শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নফল যে সময় মাকরূহ, জানাযা সেসময় বৈধ। কিন্তু সকল প্রকার নামায যে সময় নিষেধ, সূর্যোদয়, সূর্য ঠিক মধ্যাহ্নে থাকা এবং সূর্য ঠিক যখন অস্ত যাওয়ার সময়, এই তিন সময়ে সকল নামাযই এবং জানাযার নামাযও অবৈধ। এই ব্যাপারে সাহাবি তাবিয়িদের আকওয়াল..., বুখারিতে আয়িশা রা. একটা কথা আছে, তাওয়াফের নামাযের বিষয়ে। সবমিলিয়ে আমার জানা মতে, এই ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই ফুকাহাদের ভেতর। আমার জানা, সবাই বলেছেন এই তিন সময়ে জানাযার নামাযসহ সকল নামাযই হারাম। اللهُ أَعْلَمُ

<u>প্রশ্ন-৬৬:</u> স্বামী স্ত্রীর জানাযা করতে পারবে কিনা?

<u>উত্তর:</u> স্বামী তার স্ত্রীর জানাযা অবশ্যই পড়াতে পারবেন। জানাযা পড়ানোর ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হল, এলাকার গভর্নর বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল অথবা এলাকার মসজিদের ইমাম, তারা পড়াতে পারেন। আর আত্মীয়স্বজন, যারা দরদ দিয়ে দুআ' করবেন, স্বামী, পিতা, ছেলে– এরা জানাযা করা ভালো।

<u>প্রশ্ন-৬৭:</u> বর্তমানের এই পৃথিবীতে সাধারণ মানুষ যদি মারা যায়, তাহলে তাদের জানাযাতে ফেরেশতা আসা সম্ভব কিনা?

<u>উত্তর:</u> বোন বলতে চাচ্ছেন, আমাদের যুগের কোনো মানুষের জানাযায় ফেরেশতা হাযির হতে পারেন কিনা? আসলে সব যুগেই

ভালো মানুষ আছেন। এবং এই ভালো মানুষগুলো অনেক সময় মাশহুর নয়, প্রসিদ্ধ নয়। যারা সাধারণ মানুষ সমাজে, এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ

অনেক সরল সোজা সাধারণ মানুষ, মাথার চুল উশকো-খুশকো, গায়ে ময়লা জামা, পায়ে জুতা নেই, সমাজের লোক কেউ গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু আল্লাহর কাছে এতো প্রিয়, যদি আল্লাহর কাছে কসম করে বলে, আল্লাহ, এই কাজ করতে হবে, আল্লাহ কবুল করে নেয়।[১] আমরা যারা প্রসিদ্ধ, তাদের হৃদয়ে অহঙ্কার আছে, বিভিন্নরকমের ময়লা জমে, আমাদের সমস্যা বেশি। এজন্য সমাজে ভালো মানুষ আছেন, থাকবেন। অবশ্যই আসতে পারেন ফেরেশতা। তবে কেউ যদি দাবি করে, আমার অমুকের জানাযায় ফেরেশতা এসেছিল, তাকে একটা মিথ্যাবাদী দাজ্জাল মনে করবেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফেরেশতা দেখেছেন। উনি দেখলেন কী করে? যদি বলেন, কাশ্‌ফ করে। কাশ্‌ফ ব্যক্তিগত অনুভূতি, এটা বলার সাথে সাথে বাতিল হয়ে যায়। অমুক বুযুর্গের (জানাযায়) ফেরেশতা এসেছেন, আমি ফেরেশতা দেখেছি...। এজন্য সাহাবায়ে কিরামদের যুগে দেখেন, তাবিয়িদের যুগে দেখেন, কেউ কখনোই বলেননি যে, অমুকের জানাযায় ফেরেশতা এসেছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, অমুক সাহাবির জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা এসেছে। এটা ভিন্ন কথা, তিনি তো রাসূল ছিলেন। তাঁর ওফাতের পর সাহাবি-তাবিয়ি কেউ বলেননি। একটা জিনিস সবাই মনে রাখবেন, কেউ যদি দাবি করে, আমি আল্লাহর ওলি বা ওই ব্যক্তি আল্লাহর ওলি, তিনি আল্লাহর অমুক পর্যায়ের ওলি ইত্যাদি, তাহলে সবই

---

[১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-২৮০৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৮৫৪

ভণ্ডামি। কারণ কে আল্লাহর ওলি, কেউ জানেননা। যারা আল্লাহর প্রকৃত নেকবান্দা ছিলেন, বড়বড় বুযুর্গ, তারা কান্নাকাটি করছেন যে, মৃত্যুর পরে কী হবে আমি জানিনা। সম্ভাবনা আছে, কিন্তু দাবি করলে এটা ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্ন-৬৮: জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়ার পর ছোট সূরা মিলানো যাবে কিনা?

উত্তর: জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা হাদীসে এসেছে। আমরা একাধিকবার বলেছি, আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা. জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা বা কুরআনের কিছুই তিলাওয়াত করতেননা, এটা সহীহ সনদে মুয়াত্তা ইমাম মালিকে এসেছে। আবু হুরায়রা রা. থেকেও এই কথা মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদে এসেছে। সহীহ সনদে। পক্ষান্তরে বুখারি ও অন্যান্য গ্রন্থে সহীহ সনদে এসেছে, আবু সায়ীদ খুদরি, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা., তাঁরা সূরা ফাতিহা পড়েছেন, এটাকে সুন্নাত বলেছেন। কাজেই সূরা ফাতিহা পড়া সবার মতেই উত্তম এবং উচিত। সূরা ফাতিহার পরে অন্য কোনো সূরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জানাযায় পড়েছেন অথবা সাহাবিরা জানাযায় পড়েছেন, এটা কোথাও আমরা দেখতে পাই নি। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবিদের সুন্নাতের বাইরে এইটা; অন্য কোনো সাধারণ হাদীসের আলোকে এটা এখানে সংযোজন করা ঠিক হবেনা। যেমন একটা সাধারণ হাদীস আছেন:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

সূরা ফাতিহা এবং কিছু সূরা না পড়লে নামায হবেনা।[২] এই সাধারণ, জেনারেল কথা, যেটা সাধারণ সালাতের কথা, এটাকে জানাযার সালাতের ভেতরে এনে, তারপর অন্য কোনো সূরা সংযোগ করা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবিদের সুন্নাতের বাইরে।

[২] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৮২২

এটা উচিত হবেনা।

প্রশ্ন-৬৯: স্বামী স্ত্রীকে কবরে নামাতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ কবরে নামানো নিয়ে ফুকাহাদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। সেটা হল, অনেক ফকীহ বলেছেন, বিবাহের সম্পর্ক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ জাগতিকভাবে। আখিরাতের বিষয়টা আলাদা। এটার প্রমাণ হিশেবে তারা বলেন যে, একজন যখন একজনের স্ত্রী থাকেন, ওই স্বামী ওই স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করতে পারেননা। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পরপরই পারেন। তাহলে বোঝা গেল, মৃত্যুর সাথে সাথেই তার বৈবাহিক সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে। কাজেই তিনি তাকে আর স্পর্শ করতে পারবেন না, দেখতে পারবেননা– এটা একটা মত। এ মতের বিপরীতে মত হল, স্ত্রীর সম্পর্ক রয়েছে, তিনি গোসল করাতে, স্পর্শ করতে পারবেন। এটার প্রমাণ হিশেবে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কন্যা ফাতিমা রা.র দাফন-কাফন আলী রা. করেন। আবু বাকর রা. তাঁর স্ত্রীর জানাযা গোসল করান। এছাড়া অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কন্যা উসমানের স্ত্রী ইন্তিকাল করলে উসমানকে কবরে দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। হাদীসটা বিভিন্ন রকমের। এটা আরেকটা ফিকহি মত। যেহেতু ফিকহি মতের ভিন্নতা রয়েছে, প্রত্যেক মতের পক্ষেই কিছু দলীল আছে এবং এই ভিন্নতা আমাদের বানানো নয়, সাহাবি-তাবিয়িদের যুগ থেকেই, কাজেই এক্ষেত্রে আপনি যেকোনো মত গ্রহণ করতে পারেন। তবে আমরা যেটা বারবারই বলছি যে, আমরা এটাকে পারস্পরিক কলহ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য ব্যবহার না করি। আমাদের বুঝতে হবে যে, ইসলামের মতভেদ বিষয়গুলো খুব সামান্য, মৌলিক কোনো বিষয়ে নয়। এগুলো ইসলামের প্রশস্ততা। এবং ইসলাম যে গবেষণার সুযোগ দিয়েছে তার প্রকাশ। আপনি যেটাকে ভালো

লাগে গ্রহণ করেন। এটার বিষয়ে ঝগড়াঝাঁটিতে যাবেননা।

<u>প্রশ্ন-৭০:</u> (এক নারীর প্রশ্ন) আমার একটা প্রশ্ন ছিল, ঘরে বসে কবর যিয়ারত করা যায় কি না? করা গেলে এটার নিয়মটা কী?

<u>উত্তর:</u> কবর যিয়ারত আর মাইয়েতের জন্য দুআ দুটি বিষয়। যিয়ারত মানে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া। আর ঘরে বসে আপনি মাইয়েতের জন্য দুআ করতে পারেন। যিয়ারত খুব গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরি কোনো বিষয় নয়। এটা মুসতাহাব ইবাদত। আপনি সুযোগ পেলে হয়তো যিয়ারত করলেন। আয়িশা রা. তাঁর ভাইয়ের জন্য একবার কবর যিয়ারত করেছিলেন। এজন্য বারবার কবর যিয়ারত করা খুব জরুরি বিষয় নয়। যিয়ারত করতে না পারলে ঘরে বসে দুআ করবেন। আপনার প্রিয় মাইয়েতের জন্য– তাদের মাগফিরাত দেন, রহমত দেন, আল্লাহ তাদের গোনাহগুলো মাফ করেন, তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন, ইত্যাদি দুআ' করবেন।

<u>প্রশ্ন-৭১:</u> আমার প্রশ্নটা হল, আমার একটা বোন তিনবছর আগে মারা গেছে। প্রেগন্যান্সি অবস্থায় মারা গেছে, চার মাসের প্রেগন্যান্ট ছিল, কিন্তু প্রেগন্যান্সির কারণে না। সমস্যাটা হল, ওর শ্বাসে সমস্যা ছিল, শ্বাসকষ্ট থেকে মারা গেছে। চার মাসের প্রেগন্যান্ট অবস্থায় ছিল। অনেকের কাছে শুনি যে, এই অবস্থায় মারা গেলে বেহেশতে যায়, মানে অনেকে অনেক কথা বলে। হুযুরের কাছে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই।

<u>উত্তর:</u> আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত নসীব করেন। আসলে হাদীস শরীফে এসেছে:

الْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا نِفَاسُهَا فَهِيَ شَهِيدَةٌ

যদি কেউ নেফাসে মারা যায় অর্থাৎ প্রেগন্যান্সি বা সন্তান জন্ম

দিতে বা প্রেগন্যান্সির কারণে তাহলে সে শহীদ।[৩] আপনি যেটা বলেছেন, প্রেগন্যান্ট ছিল; কিন্তু তার মৃত্যুর কারণ প্রেগন্যান্সি নয়। সর্বাবস্থায় তিনি প্রেগন্যান্ট অবস্থায় মারা গিয়েছেন এবং একটা কঠিন অসুখে হঠাৎ মারা গিয়েছেন। আর এখানে যতোগুলো হাদীস রয়েছে, ওফাতের ক্ষেত্রে; সেক্ষেত্রে মূল থিমটা আমরা বুঝি, সেটা হল অস্বাভাবিক মৃত্যু! হঠাৎ মৃত্যু! অতিকষ্টের মৃত্যু! স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এই ধরনের সকল মৃত্যুই রাসূল (ﷺ) শাহাদত হিশেবে গণ্য করেছেন। কারণ যে মুমিনটা স্বাভাবিকভাবে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য পেল না, একটা কঠিন দুর্ঘটনায় মারা গেল, কঠিন রোগে মারা গেল, কলেরায় মারা গেল– সে একটা নিআমত থেকে বঞ্চিত হল, একটা কষ্ট পেল– আল্লাহ এই কষ্টের বিনিময়ে তাকে শাহাদাত নসীব দিলেন। আমরা আশা করি, আল্লাহ আপনার বোনকে শাহাদাত নসীব দেবেন। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। (উপস্থাপক: এটা কি সবার উপরেই প্রযোজ্য? নাকি যিনি দীনের উপরে থাকবেন?) ...মূল বিষয়টা বুঝতে হবে, অন্তত শিরকমুক্ত ঈমান ও বিদআতমুক্ত আমল তো লাগবেই। আমরা যতোকিছু বলি, শুক্রবারে মারা গেছে বা মদীনা শরীফে মারা গেছে, মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করলে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তার সাক্ষ্য দেবেন, ইত্যাদি। সহীহ হাদীস। তাহলে আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল মারা গিয়েছেন...? এখন বিষয়টা হল, ঈমান এবং ন্যূনতম নেক আমল যদি না থাকে, তাহলে এই ধরনের কোনো ফযীলতই প্রাপ্য হয় না।

<u>প্রশ্ন-৭২:</u>আমার হাজব্যান্ড কিছুদিন আগে সুইসাইড করেছে। উনি তো মারা গেলেন, তার জন্য আমি কী দুআ করতে পারি?

<u>উত্তর:</u> খুবই দুভার্গ্যজনক। আসলে আমরা যে জীবন উপভোগ

---

[৩] তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং-৬৬; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস নং-৯৫৫০

করতে চাচ্ছি, আধুনিক সভ্যতা আমাদের জীবন উপভোগ করতে শেখায়। আসলে উপভোগ নয়, আমাদেরকে মরতে শেখায়। এই যে দুই মিনিটের উপভোগ, এই যে বেলেল্লাপনা, এই যে আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদেরকে সুইসাইড, পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি– ক্রমেই জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। আমাদের তো, এখন ইউরোপ আমেরিকার পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিজীবন আরো অনেক দুর্বিসহ হয়ে গিয়েছে। প্রথমকথা, আত্মহত্যাকে হাদীস-কুরআনে কঠিনতম অপরাধ বলা হয়েছে, বিশেষ করে হাদীসে। বিভিন্ন হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে সে অনন্তকাল জাহান্নামে ওইভাবেই শাস্তি পেতে থাকবে; যে বুকে ছুরি দেবে, অনন্তকাল বুকে ছুরি দিতে থাকবে। তারপরও আমরা আত্মহত্যাকারীকে কাফির বলি না। তবে আত্মহত্যার মধ্যে সবচে’ বড় কুফরি হল, হতাশ হওয়া, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। কারণ যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করেন, তিনি বোঝেন আমার এই জীবনের কোনো মূল্য নেই। আমি আর আল্লাহর রহমত পাব না। আমার আর কোনো আশা নেই। নিরাশাটা একটা কঠিন অপরাধ, এমনকি কুফরির মতো।

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ[৪]

আত্মহত্যাকারীর জন্য দুআ করতে আমরা নিষেধ করছি না সরাসরি। তবে তিনি ভালো মৃত্যুবরণ করেন নি। আপনার নিজেকে সান্ত্বনা দিতে হবে। আপনি যদি তার প্রতি কোনো অন্যায় করে থাকেন, আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করবেন, তার জন্য স্বাভাবিক ক্ষমা চাইতে পারেন, আশা করি অপরাধ হবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জীবনকে বুঝতে এবং আল্লাহর রহমতে জীবনকে সিক্ত করতে, রহমতের আশায় জীবনকে উজ্জীবিত করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন।

---

[৪] সূরা: ইউসূফ, আয়াত: ৮৭

দুআ'/আমল

প্রশ্ন-৭৩: কী এমন দুআ' বা আমল আছে, যার মাধ্যমে কুরআন শরীফের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়?

উত্তর: কুরআন কারীমের প্রতি আপনার ভালোবাসা আছে এবং অকৃত্রিম ভালোবাসার যে আবেগ আছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি আমাদের এবং আপনাকে কুরআন কারীমের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা অর্জনের তাওফীক দান করুন। কুরআন কারীমের প্রতি ভালোবাসা অর্জন করতে হয়। ভালোবাসা দুইরকম। একটা প্রাকৃতিক, মা-বাবা, আশেপাশে যারা থাকেন, দেশ-সমাজ– এটা প্রাকৃতিক। আরেকটা ভালোবাসা অর্জন করতে হয়, কোনো বিষয়ের প্রতি, কোনো আর্দশের প্রতি। কুরআনের প্রতি ভালোবাসা অর্জন করতে হয়। এর কোনো শর্টকাট পথ নেই। আপনি দুআর কথা বলেছেন, আপনি সরাসরি আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। কিছু দুআ' আল্লাহ তাআলা, রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে শিখিয়েছেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الماءِ البَارِدِ

এবং

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ[১]

---

[১] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৪৯০, ৩৪৯১

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল্লাহকে বলতেন, আপনার ভালোবাসা আপনার প্রেম, যার ভালোবাসা আমার জন্য উপকারে আসবে তার প্রেম, দরিদ্রদের প্রতি প্রেম আমাকে দান করুন। এ ধরনের দুআ করতে পারেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, কুরআনের প্রতি ভালোবাসা, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা হল ঈমানের অংশ। তবে অনুসরণহীন ভালোবাসা আমাদের বিশেষ কোনো কাজে আসবে না। আমরা সবাই কুরআনকে ভালোবাসি। মুসলিম যতোই দুর্বল ঈমানের হোক, কুরআনকে কেউ যদি লাথি মারে, কুরআনকে অবমাননা করে, আমরা জীবন দিয়ে হলেও রক্ত দিয়ে হলেও একে প্রতিহত করি। এটা আমাদের কুরআনের প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু এই কুরআনের কথা আমরা মানতে রাজি নই। কুরআনের কথাই যখন কেউ বলে, নামায পড়তে হবে, পর্দা করতে হবে, এটাকে আমরা মোটেও গুরুত্ব দিই না। এই যে অদ্ভুত ভালোবাসা, প্রচণ্ড ভালোবাসি আল্লাহর কালাম, বিশ্বাস করি, এটা আল্লাহর কালাম; কিন্তু কুরআনের কথা মানতে রাজি নই। কুরআনের ভালোবাসা অর্জন করতে হলে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করুন। কুরআনের তরজমা বুঝুন। কুরআন পড়ে চোখের পানি ফেলার মতো অবস্থা অর্জন করুন। যেটা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

[এতে (কুরআন তিলাওয়াতে) তাদের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে][২]

এভাবে কুরআনের যতো চর্চা করবেন, কুরআনের যতো কাছে থাকবেন, কুরআন ততো আপনাকে ভালোবাসবে, আপনি ততো কুরআনকে ভালোবাসবেন। কুরআন কারীমের অকৃত্রিম ভালোবাসা অর্জনের একমাত্র উপায় হল কুরআনের সোহবত।

---

[২] সূরাঃ যুমার, আয়াতঃ ২৩

তাকে সাথে রাখা, তার সাথে থাকা, তার সাহচর্য কখনো না ছাড়া। বিশেষ করে, দিনে কিছু তিলাওয়াত, রাতে কিছু তিলাওয়াত, সালাতে কিছু তিলাওয়াত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ (أَمَامَهُ) قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ

যদি কেউ কুরআনকে তার সামনে রাখে, তাহলে কুরআন তাকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে।[৩] এটাই হল কুরআনের প্রতি ভালোবাসা অর্জনের প্রকৃত আমল। এর পাশাপাশি আপনি নিজেই দুআ করবেন, আল্লাহ আমাকে কুরআনের প্রতি ভালোবাসা অর্জনের তাওফীক দিন। সিজদায় গিয়ে দুআ করবেন। এছাড়া খাস কোনো সহীহ দুআ, শুধু কুরআনের ভালোবাসার জন্য, আমার চোখে পড়েনি। আমরা সহজ যেটা চাই, জীবনে খুব দ্রুত বড় লোক হওয়া, খুব সহজে সুস্থ হওয়া, খুব সহজে উপার্জন করাটা প্রকৃতিবিরোধী চিন্তা। দীনপালন জীবনের ঘনিষ্ঠ বিষয়, এটাকে প্রতিনিয়ত কর্মের মাধ্যমে...। আপনার চেতনা খুবই ভালো। দুআ আপনি করবেন আল্লাহর কাছে কুরআনের প্রেম অর্জনের জন্য, পাশাপাশি কুরআনের সাহচর্য গ্রহণ করুন। সুতরাং কুরআনকেন্দ্রিক কিছু মাসনূন দুআ আছে, এগুলো মুখস্থ করুন।

<u>প্রশ্ন-৭৪:</u> কী কী আমলের কারণে মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে?

<u>উত্তর:</u> বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে হলে, জীবনটাকে আল্লাহর কথামতো চালাতে হবে– এটা মূল কথা। তবে ফরয-ওয়াজিবের পাশাপাশি ঈমানকে বিশুদ্ধ করা এবং ফরয-ওয়াজিব দায়িত্ব পালন করা– এর কোনো বিকল্প নেই। এর বাইরে বিনা হিশেবে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। আপনার ঈমান

---

[৩] সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-১২৪

বিশুদ্ধ হবে, নামায-রোযা, পিতামাতার দায়িত্ব,সমাজের দায়িত্ব, কর্মের দায়িত্ব, ফরয ইলম শিক্ষা–এগুলো করার পরে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার একটা সহীহ হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মতের একটা বড় সংখ্যা (৭০ হাজার বা অনুরূপ সংখ্যা) বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, যারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করত, কোনো ঝাঁড়ফুক দুআ-তাবীয ব্যবহার করত না। এটা সহীহ হাদীস; বুখারি-মুসলিম, অন্যান্য কিতাবে এসেছে। মূল ব্যাপার হল, আমরা ঈমান এবং তাকওয়া অর্জন করব। এরকম আরো অনেক আমল রয়েছে, যেগুলো করলে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দেবেন বলেছেন। কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর আয়াতুল কুরসি পড়ে, তার জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না।এরকম আরো কিছু আমল আছে, যেগুলো নফল-মুসতাহাবের পর্যায়ের; ফরয-ওয়াজিব ঠিক থাকলে এগুলো আমাদের কাজে লাগবে। (উপস্থাপক: বিষয়গুলো বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের ভুল হয়ে থাকে, এই হাদীসগুলো পেলে আমরা মনে করি এই আমল করলেই বুঝি জান্নাতে চলে যাবে)। ...এটা শুধু শ্রোতা দর্শকদের ভুল নয়, আমরা যারা আলিম-উলামা ওয়ায-নসীহত করি, আমরা শবে বরাত নিয়ে, যিক্‌র নিয়ে, যিয়ারত নিয়ে, মুসতাহাব-নফল ইবাদাতকে এতো বেশি হাইলাইট করি, এতো ফযীলত বলি, অনেক সময় দর্শক বিভ্রান্ত হন, যে, বোধহয় আমার আর ফরযের দরকার হবে না। অথবা আমরা এতোকিছু পেয়েছি যে, আর লাগবে না। এজন্য কুরআনের মানহাজ সব চাইতে ভালো। আপনি কুরআন পড়েন, দেখবেন নফল-মুসতাহাবের এতো গুরুত্ব দেয়া হয় নি। ফরয-ওয়াজিব, বান্দার হক, ওযনে কম না দেওয়া, পিতামাতার দায়িত্ব, প্রতিবেশির দায়িত্ব সবচে' বেশি বলা হয়েছে। এগুলোর পাশাপাশি আমাদের নফল-মুসতাহাব পালন করতে হবে।

প্রশ্ন-৭৫: বড়দের কিংবা ছোটদের যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা বাইরে পাঠানো হয়। কীভাবে এবং কোন কাজ করলে নিরাপদে যাবে এবং সেখানে অবস্থান করবে এবং নিরাপদে ঘরে ফিরে আসবে? এটা আমার জানার বিষয়।

উত্তর: আমাদের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটা মৌলিক মূলনীতি দিয়েছেন:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

যদি কোনো জনপদের মানুষ দুটি গুণ অর্জন করত– বিশুদ্ধ ঈমান অর্থাৎ আখিরাতমুখিতা, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার চেতনা আর তাকওয়া, অর্থাৎ যে কাজ করলে আল্লাহ নারায হন, এটা আমরা করব না। এই তাকওয়া ঈমান যদি আমাদের সমাজের অধিকাংশের ভেতরে আসত, দুর্নীতি অন্যায় অনাচার কমে যেত এবং আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়ার সকল বরকত, আসমান যমিনের বরকত দিয়ে আমাদের সমাজটা ভরিয়ে দিতেন।[৪] আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি তাকওয়া, ঈমান না আনে, তাহলে নিরাপত্তার অভাব থাকবেই। আমাকে একবার একভাই প্রশ্ন করেছিল যে, মসজিদে গেলে জুতা চুরি হয় কেন? আমি বললাম যে, দেখেন ভাই, যে সমাজে রাস্তায় গেলে পকেট চুরি হয়, সচিবালয়ে গেলে পকেট চুরি হয়, সমাজের বিভিন্ন জায়গায় গেলে ঈমান চুরি হয়, অনেক সময় জীবন চলে যায়, আপনি রাস্তায় বের হয়েছেন, জীবন নিয়ে ফিরবেন কিনা এটাই জানেন না, সেখানে মসজিদের বাইরে জুতাটা চুরি হতে পারবেনা, এমনটা হয় না। মসজিদের ভেতরে যে জুতা চুরি হয়না, এটা অন্তত ভালো অবস্থায় আছে। সবাই মিলে যদি আমরা ঈমান এবং তাকওয়াকে উজ্জীবিত না করতে পারি, নিরাপত্তার অভাব থাকবেই। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সুন্দর সুন্দর দুআ শিখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

---

[৪] সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ৯৬

বাড়ি থেকে বেরানোর সময় যে দুআটা পড়তেন:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

(অর্থ) আমি আল্লাহর নামে বেরোলাম, আল্লাহ্ আমি আপনার উপর তাওয়াক্কুল করছি। আল্লাহ্ আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি যেন কারো ক্ষতি না করি, কেউ যেন আমার ক্ষতি না করে, আমি যেন পা পিছলে না যায়, কেউ যেন পা পিছলে না দেয়। আমি যেন বিভ্রান্ত না হই, কেউ যেন আমাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। আমি যেন কারো উপর যুলুম না করি, কেউ যেন আমার উপর যুলুম না করে।[৫] এই মাসনূন দুআটা বাসা থেকে বের হওয়ার সময় অবশ্যই পড়বেন। ডান পা বাইরে দিয়ে পড়বেন। বাড়িতে ঢোকার দুআ আছে। পথে চলার দুআ আছে। ফজরের সালাতের পর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খুব সুন্দর একটা দুআ করতেন সারাদিনে সামগ্রিক নিরাপত্তার দুআ। সহীহ হাদীস ভিত্তিক দুআর গ্রন্থে পাবেন। আমার দু'একটা বইয়ে এটা আছে (*রাহে বেলায়াত* ও ***সহীহ মাসনূন ওযীফা***)। এই দুআ'গুলো পড়বেন, বাচ্চাদের পড়াবেন সকাল-সন্ধ্যায়:

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

এইটা তিনবার সকাল, তিনবার সন্ধ্যায় পড়বেন।[৬]

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

এগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সকালে-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়তে

---

[৫] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৪২৭

[৬] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৮৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৩৮৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৩৮৬৯

বলেছেন।[৭] ছোট বাচ্চারা যারা পড়তে না পারে, তাদেরকে পড়ে ফুঁ দিতে পারেন। এগুলো আমাদের স্বাভাবিকভাবে আসমানি-যমিনি বালা-মুসীবত থেকে হিফাযত করবে।

<u>প্রশ্ন-৭৬:</u> 'আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান নার'। 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতাল ফিরদাউস...' এই দুআর যে ফযীলত লেখা আছে, সেই ফযীলত কি হবে?

<u>উত্তর:</u> আপনি কোন বই থেকে জেনেছেন, জানি না। তবে'আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান নার' এটা সহীহ হাদীসে এসেছে, সাতবার যদি কেউ সকালে এবং সন্ধ্যায়; মাগরিব ও ফযরের সালাতের পরে দুনিয়াবি অন্যকোনো কথা বলার আগে বলে, তাহলে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে হিফাযত করেন। 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতাল ফিরদাউস...' এই ধরনের দুআ করতে নবীজি উৎসাহ দিয়েছেন। তবে এগুলোর ফযীলতের ব্যাপারে সহীহর পাশাপাশি...। আমাদের দেশের একটা অভ্যাস হল, বিভিন্ন সাধারণ অনেক কিতাবে সহীহ ফযীলতের পাশাপাশি বানোয়াট অনেক ফযীলত পাওয়া যায়। আপনি এই ব্যাপারে *মিশকাত শরীফ, রিয়াদুস সালিহীন, কিতাবুল আযকার* ইত্যাদি বই পড়লে সহীহ ফযীলত জানতে পারবেন।

<u>প্রশ্ন-৭৭:</u> আমি প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করি, শুক্রবারে সূরা কাহ্‌ফ পড়ি। এটা ঠিক আছে কি? এর ফযীলত জানতে চাচ্ছি?

<u>উত্তর:</u> প্রথমেই আপনাকে মুবারকবাদ জানাই, কংগ্রাচুলেট করি, আল্লাহ আপনাকে এই তাওফীক দিয়েছেন। প্রথম বিষয় হল, আমি আশা করি, আপনি কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন,

---

[৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৭০৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৬০৪; আসার আবু ইউসূফ, হাদীস নং-২১৪

কুরআনটা অর্থসহ বুঝে পড়লে কুরআনের হক তিলাওয়াত হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেছেন:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা কিতাব 'হক তিলাওয়াত' করে, এরাই হল ঈমানদার।[৮] আর হক তিলাওয়াতের অর্থ হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করা। অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করলে কুরআনের আদব হবে...। বিষয়টা অনেকটা এরকম হবে যে, হুযুর আমার জামা নেই, জামা ছাড়া নামায পড়লে নামায হবে কি? নামাযের সাওয়াব পাব কিনা? আমি অবশ্যই আপনাকে বলব, হ্যাঁ, জামা না থাকলে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে নামায হবে। আপনারা যদি আমার এই উত্তর থেকে বোঝেন যে, যাক! হুযুরযেহেতু বলেছে, আজ থেকে খালি গায়েই নামায পড়ব! জামা আর গায়ে দেব না! তাহলে ওই একদিন আপনার সাওয়াব হয়েছিল, পরবর্তীতে রীতিতে পরিণত করার জন্য গুনাহ হতে থাকবে। কুরআন অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করাটাও একই রকমের। কেউ কুরআন বোঝার ক্ষমতা রাখেন নি, পড়ছেন, বোঝার ইচ্ছা আছে, অন্তত আল্লাহর মুহাব্বত নিয়ে তিলাওয়াত করছেন, ইনশাআল্লাহ সাওয়াব হবে। কিন্তু আমরা কুরআন অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করার যে রীতি বানিয়েছি, এটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশবিরোধী, কুরআনের নির্দেশবিরোধী, সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাতবিরোধী। আপনি তিলাওয়াত করেন, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আশা করি পাশাপাশি অর্থটা বোঝার চেষ্টা করবেন। হৃদয়ে কুরআনের নূর আসবে। প্রতিদিন তিলাওয়াত করবেন, অল্প হোক বেশি হোক। নিয়মিত ইবাদতে সাওয়াব বেশি হয়।

---

[৮] সূরা: বাকারা, আয়াত: ১২১

أَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

আল্লাহর কাছে প্রিয়তম নফল ইবাদত হল, যেটা নিয়মিত করা হয়, অল্প হোক।[৯] প্রতিদিন পাঁচ আয়াত, একদিন বিশ আয়াত মাঝেমাঝে না করার চেয়ে অনেক ভালো। সূরা কাহ্ফ শুক্রবার দিনে অথবা রাতে তিলাওয়াত করা, এটা সহীহ হাদীসে এসেছে, এটার বিভিন্ন ফযীলত এসেছে। আমার এই মুহূর্তে যে ফযীলত মনে আসছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কেউ সূরা কাহ্ফ শুক্রবারে পড়লে আল্লাহ পরবর্তী এক সপ্তাহ পর্যন্ত আসমান-যমিন তার জন্য নূরে ভরপুর করে দেন।

<u>প্রশ্ন-৭৮</u>: আল্লাহ পাকের কাছে যদি কোনো একটা মনের ইচ্ছা বা বাসনার কথা তুলে দুআ করা হয়, আর সেটা পূরণের যদি জায়গা থাকেও, আল্লাহ পাক কেন সেটা কবুল করেন না?

<u>উত্তর</u>: বোন, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। আসলে কোনো দুআ আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বোন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ সব দুআ' কবুল করেন।

مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ

মানুষ ব্যস্ত হলে আর দুআ' কবুল করেন না। ব্যস্ততার অর্থ আবার বলেছেন, যে আমি অনেক আল্লাহকে ডাকলাম, আল্লাহ কবুল করল না, আমার দুআ বোধহয় কবুল হবে না। ওই দুআ আল্লাহ কবুল করেন না।[১০] বিষয় হল বোন, আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, আমি অনেক দুআয় দেখেছি, না, এটা হল না, অনেক বছর পর দেখেছি আল্লাহ সব দুআয় নিয়ে

---

[৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৬৪৬৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২৬৩৪৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৩৬৮

[১০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৭৩৫; মুসনাদ বাযযার, হাদীস নং-৮২০৫

নিয়েছেন, কোনোটাই বাদ থাকে নি। এবার আমি প্রথম কথাটা বলি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বান্দা যখন দুআ করে আল্লাহর কাছে, আল্লাহ তখন সেই দুআ কবুল করেন এবং উত্তর দেন তিন পথের এক পথে। হয় যেটা চেয়েছেন সেটাই দেবেন, অথবা ওর বদলে অন্যকোনো অকল্যাণ অমঙ্গল রোধ করে দেবেন, অথবা এই দুআর বিনিময়ে জান্নাতে তার জন্য বড় নিয়ামত রেখে দেবেন। বোন, আল্লাহ আমাদের জন্য কোনটা চেয়েছেন, জানি না। এছাড়া আমরা যখন একটা বিষয় চাই, একটা মানুষ বিবাহ চাচ্ছে, একটা ছেলেকে বা একটা মেয়েকে, মনে করছে এটাই ঠিক! আমরা তো গায়িব জানি না। কিন্তু ওই বিবাহ হল না, অন্য জায়গায় বিবাহ হল, দেখা গেল, সে ভালো আছে। আসলে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক? আমরা অবশ্যই জোর দিয়ে চাইব যে, আল্লাহ আমাকে এটা দিতেই হবে, তবে আপনি হতাশ হবেন না। এই কথাটা কখনোই মনে করবেন না যে, আমি অনেক চেয়েছি আল্লাহ দিলো না। না, আল্লাহ অবশ্যই দেবেন, ইয়াকীন রাখেন, আর আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আল্লাহ কোনো দুআ ফিরিয়ে দেন না, দুনিয়াতেই দেন, একটু সবর করতে হয়।

<u>প্রশ্ন-৭৯:</u> টিভি দেখে যিক্‌র আযকার করা যাবে কিনা? দরূদ শরীফ পড়া যাবে কিনা?

<u>উত্তর:</u> টেলিভিশন মানে বাস্তবে যা দেখেন। আপনি যদি ওয়ায শোনার সময় যিক্‌র করেন, এটা ইবাদত। আর গান শোনার সময় যিক্‌র করলে গুনাহ। কাজেই টেলিভিশনে যদি দীনের আমল দেখেন, এটা একইরকম সাওয়াব এবং ইবাদতের কাজ। সেই সময়ে আপনি যিক্‌র করতে পারেন। আর যদি অন্য শরীআতবিরোধী কিছু দেখেন, সেই সময় যিক্‌র করলে গুনাহ তো হবেই; হয়তো ঈমানের পরিপন্থি হতে পারে।

প্রশ্ন-৮০: ...আমার আরেকটা সন্তান হবে, ...তারিখে ডেট দিয়েছে। এখন মনে হয় যে আমি মারা যাব! এরকম আমার ভয় লাগে, এখন আল্লাহর কাছে কীভাবে আমার পেছনের গুনাহগুলো মাফ চাইব?

উত্তর: আমরা আপনার জন্য দুআ‘ করি, আল্লাহ তাআলা আপনাকে নেক আমলময় দীর্ঘ হায়াত দান করুন। আপনার হাফিয সন্তানকে দীর্ঘদিন উপভোগ করার তাওফীক দান করুন দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। এই ধরনের চিন্তা মনে আসতে দেবেননা। মৃত্যু আসবেই। মৃত্যুর আগে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়া ভালো, মৃত্যুর চিন্তায় নিজেকে অস্থির করার দরকার নেই। তৃতীয়ত, গুনাহ মাফ। গুনাহ মাফ শুধু মৃত্যুর চিন্তায় নয়, প্রতিদিনই। গুনাহ মাফ আমাদের নিয়মিত করতে হবে। দু‘টি কারণে। আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

যারা আবেগে-অজ্ঞতায় হঠাৎ করে পাপ করে ফেলে দ্রুত তাওবা করেন, তাদের তাওবা কবুল করা আল্লাহর দায়িত্ব।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

আর যারা অনবরত পাপ করেই যায়। মৃত্যু এসে যাওয়ার পর বলে, এখন তাওবা করলাম, ওদের তাওবা কবুল করা আল্লাহর দায়িত্ব নয়।[১১] এখানে অনেকে বলবেন, হাদীসে আছে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুল হয়। এটা কাদের জন্য? যারা নিয়মিত তাওবা করে, মৃত্যুর আগে কিছু পাপ হয়েছে আবার তাওবা করেন নিশ্চয়ই আল্লাহ কবুল করবেন। কিন্তু আমি পাপ জমা করে

[১১] সূরা: নিসা, আয়াত: ১৭-১৮

রেখেছি, সঞ্চিত রেখেছি, দিনের পর দিন, মরার আগে ক্ষমা চেয়ে নেব। আল্লাহ কুরআনে তো বলেছেন, সূরা নিসায়, যারা পাপ জমা করে রাখে, করেই যায়, তাদের তাওবা কবুল করা আল্লাহর দায়িত্ব না। এইজন্য আমরা প্রতিনিয়ত তাওবা করব। তাওবা করার নিয়মটা হল, যে কোনো ভাষায়, মাতৃভাষায়, বাঙলাভাষায়, আল্লাহর কাছে... আল্লাহ আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। তাওবা হল, আপনার অতীত পাপের জন্য ভয়ঙ্কর অনুতপ্ত হওয়া যে, আল্লাহ আমি অনুতপ্ত, অনুতাপটা হৃদয়কে দগ্ধ করবে। দ্বিতীয়ত, আর কোনোদিন আল্লাহ এগুলো করব না, এই নিয়ত করা। তৃতীয়ত, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। এই তিনটা মূলত পাপের তাওবা। আর যদি বান্দার হক জড়িত থাকে, কারো গীবত করেছেন, কারো পয়সা দেন নি, ওযনে কম দিয়েছিলেন, পাওনা বাকি ছিল, তাদেরকে সেটা পরিশোধ করা তাওবার অংশ। এই অনুতাপ অনুশোচনাসহ যে কোনো ভাষায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারেন। সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, দুই সিজদার মাঝখানে ক্ষমা চান। রাতের নামাযে ক্ষমা চান। পাশাপাশি কিছু মাসনূন ইস্তিগফার আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিখিয়েছেন, এগুলো সকাল-সন্ধ্যা সিজদায় করতে পারেন। যেমন সাইয়িদুল ইস্তিগফার। সহীহ বুখারি[১২] ও অন্যান্য কিতাবে আছে। অন্য আরেকটা মাসনূন ইস্তিগফার আছে:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ[১৩]

এই ধরনের মাসনূন ইস্তিগফার, এগুলো পড়ে পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করবেন।

প্রশ্ন-৮১: যখন কোনো পাপ কাজ হয়ে যায়, তখন সেই গুনাহটা লেখার পূর্বে নির্দিষ্ট ফেরেশতা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, এই

[১২] হাদীস নং-৬৩০৬

[১৩] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫১৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৫৭৭

নির্দিষ্ট সময়টা কতক্ষণ?

উত্তর:আসলে এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে বিভিন্নরকম এসেছে। কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন যে:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ

আল্লাহ তাআলা রাতের বেলা হাত বাড়িয়ে দেন যে, দিনের বেলায় যারা পাপ করেছ তারা এখন তাওবা করো, আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেব। রাতের বেলা যারা অন্যায় করেছ, পাপ করেছ তারা দিনের বেলা তাওবা করো, আমি মাফ করে দেব।[১৪] কোথাও দেখা যায় যে সন্ধ্যা পর্যন্ত বা পরের দিন সকাল পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়, দেখি বান্দা তাওবা করে কিনা, তাহলে আর লেখা হবে না। বিভিন্ন রকমের (বর্ণনা) পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করতে চান, আল্লাহ ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। এজন্য একটা পূণ্যের জন্য অগণিত সাওয়াব, একটা পাপের নিয়ত করলেও আল্লাহ গুনাহ দেন না, কর্ম করলে একটা গুনাহ হয়, তাও আল্লাহ ক্ষমা করার জন্য ব্যস্ত থাকেন। আল্লাহ কবুল করেন।

প্রশ্ন-৮২: আমার পাঁচবছর ছয়মাস বিবাহ হয়েছে, কিন্তু আমার কোনো সন্তান হচ্ছে না। এজন্য আমি কী আমল করতে পারি?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً

আল্লাহ যতো অসুস্থতা দিয়েছেন, প্রত্যেক অসুস্থতার জন্য আল্লাহ

[১৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৭৫৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৯৫২৯

ওষুধ নাযিল করেছেন, অর্থাৎ দিয়েছেন।[১৫] কেউ জানেন, কেউ জানেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন হাদীসে বলেছেন-تَدَاوَوْا: তোমরা চিকিৎসা করো।[১৬] কাজেই আমরা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার চেষ্টা করব সাধ্যমতো। পাশাপাশি দুআর ক্ষেত্রে কুরআন কারীমে সন্তানহীন নবীগণের দুআর কথা বলা হয়েছে। যাকারিয়া আ. বারবার দুআ চেয়েছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে:

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً[১৭]

এই ধরনের দুআগুলো আপনারা করবেন। হাদীস শরীফে, সন্তানের জন্য খাস দুআ আমার জানা নেই। তবে অত্যন্ত আবেগময় কিছু দুআ আছে, যেটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এই দুআ বললে আল্লাহ তার বিপদ এবং মনের কষ্ট দূর করে দেন। মনের বাসনা পূরণ করেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ غَمِّي

এ দুআটা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যার মনে ব্যাথা বেদনা

[১৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৫৬৭৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৩৪৩৯; জামিউল উসূল ৭/৫১৪

[১৬] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৮৫৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২০৩৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৩৪৩৬

[১৭] সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ৮৯; সূরা: আল ইমরান, আয়াত: ৩৮

আছে, তিনি এই দুআ বারবার পড়লে, আল্লাহ তার মনের কষ্ট দূর করে দেবেন।[১৮] এই ধরনের আরও কিছু দুআ রয়েছে। আপনারা সহীহ হাদীস নির্ভর দুআর বইগুলো পড়ে এগুলো জানবেন। আসলে মুমিনকে ইলম অর্জন করতে হবে এবং মুমিনের সম্পর্ক হবে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে। এখানে আমরা বড়জোর শেখাতে পারি, আমরা কিছু করতে পারি না। আমার রাহে বেলায়াতবইটা এই বিষয়েই লেখা। আল্লাহর ওলি হওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল নির্দেশিত পথ। এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশিত অনেক দুআ বাঙলা অনুবাদসহ এসেছে। আপনারা পড়তে পারেন। হিসনুল মুসলিম, কিতাবুল আযকার, ইমাম নববির অন্যান্য বইগুলো পড়লে আপনারা এই জাতীয় দুআগুলো পাবেন। এগুলো আপনারা আরবিসহ পড়বেন। আরবি যতদিন মুখস্থ না হয়, বাঙলায় অর্থটা আল্লাহ তাআলার কাছে আবেগ দিয়ে প্রকাশ করবেন। সিজদায় আল্লাহর কাছে দুআ করবেন, বিশেষ করে তাহাজ্জুদের সিজদায়। আমরা দুআ করি, আল্লাহ আমাদের দুআ কবুল করেন। দুটি বিষয় আমরা সম্পূরক বলতে চাই। একটা হল, দুআ কবুল অবশ্যই আল্লাহ করেন। তবে দুআ কবুল করার কিছু শর্ত আল্লাহ তাআলা, রাসূল (ﷺ) বলেছেন। আল্লাহ অনেকসময় শর্ত ছাড়াও দুআ কবুল করেন। আমরা গুনাহগার, সব শর্ত আল্লাহ দেখলে তো আমরা হেরে যাব। তবে শর্ত পূরণ না হবার কারণে অনেক সময় দুআ কবুল হয়। যেমন হালাল মাল নির্ভর হওয়া। হারাম থেকে বিরত থাকা, সবসময়, বিপদ না হলেও আল্লাহর কাছে দুআ করা, মানুষদের উপকার করা, নেকআমল করে দুআ করা, আল্লাহর সরাসরি বিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত না হওয়া, সুন্নাতের অনুসরণ করা, ভালো ভালো সময়ে দুআ করা, এগুলো দুআ কবুল হওয়ার precondition (পূর্বশর্ত) বা কিছু আদব। এগুলোর দিকে

---

[১৮] মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং-২৯৩১৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৩৭১২

লক্ষ্য রাখতে হবে। দ্বিতীয় যে বিষয়টা বুঝতে হবে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ সবার দুআ কবুল করেন-

مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ

যে ব্যক্তি ব্যস্ত হয়, তার দুআ আল্লাহ কবুল করেন না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ؟

ব্যস্ত হওয়ার অর্থ কী? তিনি বলেন, অনেক সময় বান্দা বলে,

قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي

আমি আল্লাহকে অনেক বলেছি, আল্লাহ আমার দুআ কবুল করে নি, হবে না। এই মানুষ যখন হতাশ হয়ে ছেড়ে দেয়, তখন তার দুআ কবুলের পথ বন্ধ হয়ে যায়।[১৯] আমরা ইয়াকীনের সাথে বিশ্বাস নিয়ে, বারবার চাইতে থাকব। আমরা জানি না, এখন যেটা চাচ্ছি সেটা উত্তম নাকি একটু পরে উত্তম। কাজেই হতাশ না হয়ে আমরা সবসময় চাইতে থাকব। আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। সূরা ফুরকানের শেষ পৃষ্ঠায় [আয়াতঃ ৭৪]:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

এই দুআটাও, সন্তানসন্ততি যারা আছে, স্বামী-সন্তান-স্ত্রী সবার জন্য পারিবারিক শান্তি নিরাপত্তার জন্য।

প্রশ্ন-৮৩: প্রায় সময় আমাদের মনের মধ্যে ভালো চিন্তা এবং খারাপ চিন্তা আসে। এজন্য আমাদের কী হবে? ভালো চিন্তার জন্য কি আমরা সাওয়াব পাব? আর খারাপ চিন্তার জন্য গুনাহ হবে?

---

[১৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৭৩৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৬০৪

উত্তর: প্রতিনিয়তই বিভিন্ন সময়ে ভালো-মন্দের চিন্তা আসে। তবে আমি উত্তর দেওয়ার আগে একটা অনুরোধ করব। এই যে আমরা অলস সময় কাটাই ভালো অথবা মন্দ চিন্তা করে; এরচে' অতি সহজে আমরা অতি লাভবান হতে পারি, যদি অলস সময়টা আল্লাহ্ তাআলার যিক্‌রে কাটাই। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ...। আল্লাহ্ তাআলার যিক্‌র করতে ওযু লাগে না, গোসল লাগে না, পাকসাফ হওয়া লাগে না, টুপি মাথায় দেওয়া লাগে না, যে কোনো পরিস্থিতিতে...! এতে মনটাও ভালো থাকে, আল্লাহর রহমত... অগণিত সাওয়াব হয়, আর অলস চিন্তা থেকে আমরা মুক্তি পাই, আর মনের ভেতরে আল্লাহর রহমতের অনুভূতি বাড়তে থাকা। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি কেউ মনের ভেতর ভালো চিন্তা অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেন, ভালো কাজ করব, সেটা না করলেও ভালো সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে একটা সাওয়াব দান করেন, আর ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তটাকে যদি তিনি বাস্তবায়িত করেন, তাহলে দশ থেকে সাতশ গুণ সাওয়াব আল্লাহ তাআলা দান করেন। আর মনের ভেতরে কেউ খারাপ সিদ্ধান্ত নেন, খারাপ কাজ করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়ন নিজের ইচ্ছাতেই ত্যাগ করেন, বাস্তবায়ন না করেন, তাহলে কোনো পাপ হবে না। আর বাস্তবায়ন করলে একটা পাপ হবে। এজন্য ভালো চিন্তা আসলে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাব, আর খারাপ চিন্তা হলে ইস্তিগফার করব। খারাপ চিন্তার জন্য কোনো পাপ হবে না, যদি না সেটা আমরা execute (কার্যকর)করি।

প্রশ্ন-৮৪: আমি হাদীসে পড়েছি, কোনো অপরাধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ওযু করে দুই রাকআত নামায পড়ে নিলে এবং কান্নাকাটি করলে অপরাধ ক্ষমা করা হয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, দিনে

আমরা অনেকবার গুনাহের কাজ করি, সব ব্যাপারে নামায পড়া তো দুরূহ ব্যাপার। তাহলে আমি কীভাবে আমল করব?

উত্তর: প্রথম যে বিষয়টা বোন বলেছেন, সেটা হাদীসে এসেছে, কয়েকরকমের হাদীস এসেছে। একটা হল:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

এটা কুরআন কারীমে আল্লাহ বলেছেন, নেককর্ম পাপ কর্মকে মুছে দেয়।[২০] হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا

তুমি কোনো অন্যায় করলে এরপরে নেক কাজ করো।[২১] অন্য আরেকটা হাদীস রয়েছে, যদি কেউ কখনো অন্যায় করে, তাহলে দুই রাকআত নামায (পড়ে) আল্লাহর কাছে মাফ চায়, আল্লাহ মাফ করবেন। আমরা সারাদিন যে গুনাহগুলো করি, এটা বিভিন্ন পর্যায়ের। কিছু আছে সগীরা গুনাহ, টুকটাক রাগ করা, বাজে কথা বলা– এটা সারাদিন আমরা যে ছোটখাটো নেক আমল করি, আশা করা যায় এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন। পাশাপাশি সারাদিন আমরা মুখে ক্ষমা চাইতে থাকব। যেটা হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

وَفِي رِوَايَةٍأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

হে মানুষেরা, তোমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে তাওবা-ইস্তিগফার করতে থাকো। আমি নিজে সত্তর বারের অধিক এবং অন্য বর্ণনায় একশবার আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিগফার

---

[২০] সূরা: হূদ, আয়াত: ১১৪

[২১] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-১৯৮৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২১৩৫৪

করি।[২২] কাজেই এগুলো আমরা পড়ব। দ্বিতীয়ত, কবীরা গুনাহের ভেতরে কিছু আছে, মুবিকাত, ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ। কিছু আছে সাধারণ কবীরা গুনাহ, এটা আমরা বুঝি। আমরা যদি কবীরা গুনাহ করি, যেটা হয়ে যাচ্ছে, আমরা তাৎক্ষণিক নামায পড়ার চেষ্টা করব। কারণ কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রে তাওবাটা একটু আবেগ, হৃদয় দিয়ে হওয়া উচিত। তা না পারলে আমরা মন থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করব। দিনের ভেতরে অন্তত একবার, এবং সম্ভব হলে, সবাইকে অনুরোধ করব, প্রতিনিয়ত, প্রতিদিন ঘুমানোর আগে, হাদীস শরীফে এসেছে, রাতের প্রথম চতুর্থাংশ যখন পার হয়ে যায়, একতৃতীয়াংশ অর্থাৎ চার ঘণ্টা রাত, এগারোটা অন্তত বেজে যায়, তখন আল্লাহ তাআলার রহমতের দরজা গুলো খোলা হয়। আল্লাহ দুআ কবুল করেন। আমরা সাধারণত নগরজীবনে বা গ্রামজীবনেও, এখন ঘুমাতে এগারোটা বেজে যায়, ওই সময় যদি কেউ ওযু করেন, হাদীস শরীফে এসেছে, কেউ যদি ওযু অবস্থায় শুয়ে পড়ে, তাহলে আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন, সারারাত ওই ফেরেশতা তার জন্য দুআ করে। আমরা যদি ঘুমানোর আগে একটু ফ্রেশ হয়ে দু রাকআত নামায পড়ে কিছু দরূদ-ইস্তিগফার পড়ে, আল্লাহ তাআলার কাছে সারাদিনের গুনাহের ক্ষমা চাই, এবং সারাদিনে যে নেকআমল করেছি তার কবুলিয়াতের প্রার্থনা করি, মনে কোনো কষ্ট, আবেগ থাকলে আল্লাহকে জানাই, এটা অত্যন্ত ভালো আমল, যেটা, যারা তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন না তাদের জন্য ভালো আমল। তৃতীয় যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে, প্রতিনিয়ত ইস্তিগফার, বড় গুনাহ হলে তাৎক্ষণিক ইস্তিগফার, এটা আল্লাহ কুরআনেও বলেছেন:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

---

[২২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৬৩০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৭০২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৮২৯৩

আল্লাহ সূরা নিসায় [আয়াত: ১৭] বলছেন, যারা অন্যায় করে দ্রুত তাওবা করে তাদের তাওবা কবুল করা আল্লাহর জন্য দায়িত্ব। এটা লক্ষ্য রাখব। গুনাহ যখন করেছি, তখন যদি নামায পড়তে না পারি, দিনের মধ্যে অন্তত একবার আমরা এভাবে তাওবা করব। বান্দার হকের ক্ষেত্রে তাওবার জন্য দ্বিতীয় শর্ত রয়েছে, অতিরিক্ত শর্ত, সেটা হল, যার অন্যায় করেছি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।

প্রশ্ন-৮৫: মহান আল্লাহ পাক জান্নাতি ব্যক্তিকে উঁচু মর্যাদা দেবেন, ব্যক্তির কতোটুকু কুরআন মাজীদ হিফজ আছে এই অনুযায়ী? নাকি অন্য কোনোভাবে কুরআন মাজীদ পাঠ করলে সেইভাবে?

উত্তর: মানুষের নেকআমলের ভিত্তিতেই মর্যাদার ভিত্তি। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রথমত, ইসলামে জন্ম, বংশ, জন্মের সময়, জন্মের সময় কী হয়েছিল, স্বপ্ন, মৃত্যু, মৃত্যুর সময় কেমন হয়েছিল, কোন দিনে মৃত্যু হয়েছিল এগুলোর মূল্য খুবই কম। মানুষ বুদ্ধি হয়ে নিজের ইচ্ছায়, সচেতনভাবে যে আমলগুলো করেন, এই আমল হল মানুষের মর্যাদা অমর্যাদার মানদণ্ড। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রাহ. এবং মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আকীদার মূলনীতি ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবি রাহ. তাঁর *আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ*তে লিখেছেন:

الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ

সকল মুমিন মুমিনাহ, অর্থাৎ যাদের ঈমান ও আমলে সালিহ রয়েছে, তারা সবাই আল্লাহর ওলি। তারা আল্লাহর বিলায়াত অর্জন করেছেন। তবে মর্যাদার বৃদ্ধি হবে। মর্যাদা বৃদ্ধির criteria (নির্ধারক),যে যতো বেশি আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং যতো বেশি কুরআন অনুসরণ করবেন, তিনি আল্লাহর কাছে ততোবেশি

সম্মান লাভ করবেন।[২৩] এইটা হল মূলনীতি। আমরা অনেক সময় আল্লাহর ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে নফল ইবাদতগুলো করি। যে কারণে সমস্যা হয় কি, আমরা ফযীলতগুলো ধরি; ধরেন, শবে বারাআতে আমল করলে এতো ফযীলত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমরা ফরযগুলো বাদ দিচ্ছি। তাহলে আমরা বুঝলাম, আখিরাতে মানুষের মর্যাদা মূলত মানুষের ঈমান এবং আমলের গভীরতার উপরে নির্ভর করবে।

প্রশ্ন-৮৬: একটা আওয়াজ চার পাঁচ বছর ধরে আমার ক্ষতি করছে। এখন কী করলে দোষগুলো আমার থেকে দূরে চলে যাবে?...

উত্তর: আপনি যেহেতু দুবাইয়ে আছেন, শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায এবং কিছু মুহাক্কিক আলিমের এই ধরনের কিছু আমলের ছোট ছোট পুস্তিকা আছে। আপনি চেষ্টা করেন দুবাই থেকে এগুলো সংগ্রহ করার। জিনের আছর বা শয়তানি ওয়াসওয়াসা ইত্যাদি...। কিছু কুরআনের আয়াত নির্ধারণ করে, হাদীসের আমল উনারা নির্ধারণ করেছেন। এগুলো খুবই উপযোগী। অনেকেই এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। আপনি আমল করতে পারেন। যতোদিন এগুলো না পান ততোদিন আপনি অন্তত মাসনূন দুআগুলো সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার জন্য...

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

তিনবার[২৪]।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

---

[২৩] আকীদাহ তাহাবিয়াহ (শারহ-সহ), পৃ. ৩৫৭-৩৬২

[২৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৭০৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৭৮৯৮

তিনবার।[২৫] ইখলাস, ফালাক, নাস তিনবার। তিনবার তিনবার করে সকাল-সন্ধ্যায়। প্রত্যেক সালাতের পরে একবার। শোয়ার সময় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, আয়াতুল কুরসি, তিন কুল এগুলো পড়েন। এগুলো আমল করলেও ইনশাআল্লাহ ভালো ফায়দা পাবেন। আর যদি এগুলোতে আপনি উপকার না পান, তাহলে আপনি একটু কষ্ট করে, শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায এবং কিছু মুহাক্কিক আলিমের কিছু যাদু-টোনা এগুলো কাটানোর দুআ আছে। রুকইয়া মিনাল কিতাব ওয়াস সুন্নাহঃ কুরআন এবং হাদীস থেকে ঝাড়ফুঁকের কিছু সহীহ হাদীস ভিত্তিক বই আছে এগুলো জোগাড় করবেন।

---

[২৫] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৮৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৩৮৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৩৮৬৯

যাকাত/সাদাকা

প্রশ্ন-৮৭: আমার কাছে দুইলাখ টাকা আছে আর পাঁচভরি স্বর্ণ আছে। আমি তো টাকার যাকাত দিচ্ছি, এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্বর্ণের যাকাত দেব কিনা?

উত্তরঃ আসলে এই বিষয় নিয়ে ফুকাহাদের কিছু মতভেদ আছে। অর্থাৎ রূপা, নগদ টাকা, ব্যবসায়িক পণ্য, সোনা বিভিন্নরকমের যাকাতের দ্রব্য, একটাতে যাকাত হচ্ছে, আরেকটাতে দিতে হবে কিনা, অথবা সবগুলো একত্রে করা লাগবে কিনা? সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নের উত্তর হল, আপনি নগদ টাকার যাকাত দেবেন, সোনার যাকাত দেবেন না। এটা সংক্ষেপে গ্রহণযোগ্য মত হিশেবে বলছি।

প্রশ্ন-৮৮: যে যাকাতের মালিক সে তো টাকা-পয়সায় যাকাত দেবেই। আর যদি স্বর্ণ থাকে, একভরি, দুইভরি, সাতভরি। কেউ বলছে, সাত ভরির নিচে আসলে যাকাত আসবে না, শুধু টাকার যাকাত আসবে, কেউ কেউ বলছে দুই একভরি... স্বর্ণ আর টাকার মধ্যে ব্যবধান করছে।

উত্তরঃ আপনার নগদ টাকা আছে যাকাতের নিসাব। আপনি যাকাত দেন। সোনা আছে যাকাতের কম, সাড়ে সাতভরি হয় নি, এখন যাকাত লাগবে কিনা? এই ব্যাপারে ফকীহদের মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, কিছু টাকা কিছু সোনা কিছু রূপা সব মিলিয়ে যদি যাকাত হয়, তাহলে যাকাত দিতে হবে। এজন্য আপনি দু-এক ভরি সোনা থাকলেও যাকাত দিয়ে দেবেন, এটাই হল অধিকতর সাবধান এবং উত্তম মত। কোনো সমস্যা থাকে না। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, প্রত্যেক বিষয়ে নিসাব পূর্ণ হতে হবে। আমি অনুরোধ করব, আপনারা

এক্ষেত্রে যাকাত দিয়ে দেবেন। যেহেতু আপনার নগদ টাকায় নিসাবপূর্ণ হয়ে গেছে, আপনি সোনার যাকাতটাও দিয়ে দেবেন। (উপস্থাপক: যদি কারোর রূপা থাকে, সোনা থাকে এবং টাকা আছে, সেক্ষেত্রে কী হবে?) যে কোনো একটাতে যদি নিসাব পুরে যায়, তাহলে বাকিগুলোর যাকাত দেওয়াটাই উত্তম। এটাতে ফুকাহাদের মতভেদ রয়েছে। হাদীসে খুব স্পষ্ট নেই। রূপা সাড়ে বায়ান্নো তোলা হলে যাকাত দিতে হবে, সোনা সাড়ে সাত তোলা হলে যাকাত দিতে হবে। কিন্তু কিছু সোনা, কিছু রূপা আছে, অথবা রূপার নিসাব পুরে গেছে, সোনার নিসাব পূর্ণ হয় নি, এক্ষেত্রে যাকাত হবে কিনা, এটা ফুকাহাদের ইজতিহাদ। অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন যে, পুরোটার যাকাত দিতে হবে। একটা নিসাব পূর্ণ হলেও যাকাত দেয়া উত্তম।

<u>প্রশ্ন-৮৯:</u> আমার ছয় ভরি স্বর্ণের গহনা আছে, এইটা থেকে কি যাকাত দিতে হবে? আমি শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে ডিপিএস রাখলে, উঠাইনি, ব্যাংকে আছে, এখন কি ওই টাকাসহ যাকাত দিতে হবে?

<u>উত্তর:</u> শুধু ছয়ভরি সোনা হলে যাকাত হবে না। কিন্তু ছয়ভরি সোনা ও টাকা মিলে যাকাত হয়ে যাবে। ডিপিএসের টাকায় যাকাত হবে। যে পরিমাণ টাকা আপনার আছে, এখন তুলতে পারবেন, ওটার যাকাত দেওয়া ফরয। এটা আপনার মালিকানায় এটা ঋণ দেওয়ার মতোই, আপনি লাভ কম পান আর বেশি পান, আপনি কিন্তু চাইলেই টাকাটা তুলতে পারেন। এটা আপনাকে যাকাত দিতেই হবে।

<u>প্রশ্ন-৯০:</u> গত রমাযানে আমরা কয়েকজনকে যাকাত দিয়েছিলাম। রমাযানে সেসব যাকাত হিশেব করতে ভুলে গিয়েছি, কিছু হিশাব পেয়েছি, কিন্তু একজনকে অগ্রিম দেওয়া যাকাত হিশেব করতে ভুলে গিয়েছি। এখন মনে পড়েছে। এখন

আমার করণীয় কী?

<u>উত্তরঃ</u> কোনো সমস্যা নেই। আপনি যাকাত দিয়েছেন, এটা আগামী বছরের advance (অগ্রিম) যাকাত ধরে নেবেন। যাকাত অগ্রিম দেওয়া যায়, এটা হাদীস শরীফে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর চাচা আব্বাসের যাকাতের কথা বলেন, উনি অগ্রিম দুইবছরের যাকাত আগেই দিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আপনি ওটা যাকাতের নিয়তে দিয়েছেন, আগামী বছরে যাকাতের হিশাব থেকে বাদ দেবেন। সমস্যা নেই।

<u>প্রশ্ন-৯১:</u> আমি কিছু টাকা মসজিদে দান করতে চাচ্ছিলাম .. মসজিদটা আমার বাড়ি থেকে একটু দূরে। আমার বাড়ির কাছেও একটা মসজিদ আছে। এখন আমি ওই টাকা দুই মসজিদেই ভাগ করে দেব নাকি দূরের মসজিদে দেব?

<u>উত্তরঃ</u> আপনি যদি ওয়াদা করে থাকেন এবং সংখ্যা বলে থাকেন, নিয়ত করে থাকেন যে এতো টাকা দেব, তাহলে ওয়াদা পূরণ (করবেন)। এটা তো আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদা। পূরণ করা উচিত। আর যদি নিয়ত করেন টাকা দেব, সংখ্যা নির্ধারণ করেন নি। তাহলে দুটো মসজিদেই দিতে পারেন। তবে ওই মসজিদে দিলেও, যদি বাড়ির কাছের মসজিদ সুন্দর বৈধ মসজিদ হয় তাহলে অবশ্যই এখানেও দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

<u>প্রশ্ন-৯২:</u> আমি দুটি কুরআন শরীফ হাদিয়া করেছি মসজিদে। আমি যাদেরকে দিয়ে হাদিয়া করেছি তারা যদি না করে, তাহলে আমার কুরআন শরীফ হাদিয়া করার সাওয়াব হবে?

<u>উত্তরঃ</u> উনি বোধহয় বলতে চেয়েছেন, যাদের হাতে দিয়েছেন মসজিদে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারা পৌঁছিয়েছে কিনা। আমাদের দেশের (মানুষের) ধারণা, একজন মহিলা তো মসজিদে ঢুকতে

পারেন না। মহিলারা মসজিদে ঢোকা আমাদের দেশে বোধহয় খুব আজব একটা ব্যাপার! এমন আজব ব্যাপার যে, আমার এলাকাতে, শৈলকুপা-ঝিনাইদহে, একজন ইমাম সাহেব, দ্বীনদার মানুষ, যাচ্ছিলেন নিজের মসজিদে, পথে ওয়াক্ত হয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রী পর্দাওয়ালা বোরকাওয়ালা। এখন নামায পড়বেন কোথায়? শেষ ওয়াক্তে তিনি মসজিদে নামায পড়েছেন, তার ওয়াইফ নামায পড়েছেন, এজন্য বেচারার চাকরি চলে গিয়েছে!! আমরা একটা এমন দুর্ভাগ্যজনক কুসংস্কারের মধ্যে থাকি যে, মহিলারা মসজিদে যাবেন কী করে! কাজেই হাদিয়াটা উনি কোনো পুরুষের হাতে দিয়েছেন। আর এজন্যই উনি আশঙ্কা করছেন, সেই পুরুষ মসজিদে পৌঁছেছে কিনা। আপনি মসজিদে দেওয়ার নিয়ত করলে, যাকে দিয়েছেন বিশ্বস্ত দেখে, তিনি না পৌঁছালেও আপনি সাওয়াব পেয়ে যাবেন। তিনি আমানতের খিয়ানত করার কারণে গুনাহগার হবেন।

সিয়াম/হজ্জ/উমরাহ

<u>প্রশ্ন-৯৩:</u> আমার চারটা কাযা রোযা আছে। পরে আমি ওয়াদা করেছিলাম, আমার ছেলের এসএসসি পরীক্ষার দিন আমি রোযা করব। আমি সেই রোযা করছি, কিন্তু বড় কষ্ট হচ্ছে, কাযা রোযা না করে এটা করছি। কাযা রোযাটা পরে করলে হবে?

<u>উত্তর:</u> কাযা রোযা পরে রাখলেও হবে। পরীক্ষা যেহেতু প্রতিদিন হয় না, গ্যাপ থাকে। গ্যাপে গ্যাপে রোযাগুলো কাযা করে নেবেন। কাযা তো আল্লাহর, এটা যতো তাড়াতাড়ি আদায় করা যায় আপনি ততো তাড়াতাড়ি নিরাপদ হয়ে যাবেন। আপনি যদি একান্ত অপারগ হন, যেহেতু ছেলের প্রতি পরীক্ষার দিন রোযা রাখবেন, দুআর জন্য এটা আপনি পূরণ করেন, পরে কাযা করলেও হবে। বাইচান্স যদি কাযাতে অক্ষম হয়ে যান, এটা আপনার ঘাড়ে থেকে যাবে, গুনাহ্ হবে।

<u>প্রশ্ন-৯৪:</u> আমার ছেলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় আমি দশটা রোযার মানত করেছিলাম, তিনটা রোযা রাখার পর অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। এখন আমি কী করব?

<u>উত্তর:</u> আপনি ওই বাকি সাতটা রোযা অবশ্যই রেখে দেবেন। আপনার শরীর যখন ভালো হবে... । মানত পূরণ করা ওয়াজিব।

<u>প্রশ্ন-৯৫:</u> আমার বোন আটমাস আগে মারা গেছে। কোনো কারণে, সে প্রায় ১২/১৩ বছর রোযা করতে পারে নাই। তার রোযাগুলো তার নামের উপর basis (ভিত্তি) করে পরিশোধ করার কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা?

<u>উত্তর:</u> অবশ্যই। ইসলাম বলে, আপনারা যারা তার আত্মীয় রয়েছেন, উত্তরাধিকারী রয়েছেন, তারা অবশ্যই তার রোযাগুলোর

জন্য ফিদিয়া দিয়ে দেবেন। প্রতিটা রোযার জন্য একটা করে ফিতরার পরিমাণ অথবা একজন মিসকিনকে দুইবেলা খাওয়াবেন। এইভাবে তার রোযাগুলো গণনা করবেন। তার রোযার কাফফারা বা ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৯৬: অনেকেই মক্কা মুকাররামায় যাচ্ছেন উমরাহ পালনের উদ্দেশে। উমরাহর কোনো নির্দিষ্ট সময় আছে কিনা?

উত্তর: রমাযান মাসে উমরাহ করলে, সহীহ বুখারি ও অন্যান্য কিতাবে এসেছে:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي

রমাযান মাসে উমরাহ করলে একটা হজ্জের সাওয়াব পাওয়া যায়। অন্য হাদীসে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে হজ্জের সাওয়াব পাওয়া যায়।[১] অনেকে রজব মাসে উমরাহর ব্যাপারে অনেক কথা বলেন, এটা বানোয়াট। রজব মাসে উমরাহ করলে বিশেষ কোনো সাওয়াব হবে, এটা নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রজব মাসে উমরাহ করেছেন, এমন কোনো সহীহ রিওয়ায়াত নেই। সব মাসের উমরাহয় সমান। শুধু রমাযানের উমরাহর গুরুত্ব আছে। বাকি কোনো মাসের কোনো রকম বৈশিষ্ট্য সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

[১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-১৭৮২, ১৮৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১২৫৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৯৩৯

ঈদ/উৎসব/কুরবানি/আকীকা

<u>প্রশ্ন-৯৭</u>: সাতভাগে কি কুরবানি দেওয়া যাবে? যদি যায়, তাহলে একটা গরুতে দুইটা মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি দিয়ে, তার মাংস ভাগ করে দেওয়া হয় নি! সেই কুরবানিটা কি হয়েছে? আমাদের নারায়ণগঞ্জের হুযুর বলেছেন, মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি দেওয়া যাবে, যদি যায়, তাহলে দলীলভিত্তিক এটা জানাতে হবে।

<u>উত্তর</u>: প্রথম প্রশ্ন সাত ভাগে কুরবানি দেওয়া যাবে কিনা। সাত ভাগে কুরবানি দেওয়া যাবে, এটা সহীহ হাদীসে বিভিন্ন ভাবে এসেছে এবং এই বিষয়ে মুসলিম বিশ্বের ফকীহগণের প্রায় ইজমা রয়েছে। সৌদি আরবের ফুকাহা, আরবের ফুকাহা চার ইমাম সহ প্রায় সব ফকীহ ইজমা পোষণ করেছেন। আধুনিক যুগের সৌদি আরবের বড় বড় ফকীহ যারা রয়েছেন, শাইখ ইবন উসাইমীন, ফাওযান, আব্দুল আযীয বিন বায– এই ফুকাহারা বিস্তারিত লিখেছেন। এখানে একটা মত আছে আমাদের দেশে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে (প্রচলিত), এই ছাড়া কেউ এরকম বলেছেন আমার জানা নেই। সেটা হল, সাতভাগে কুরবানি দেওয়া যাবে না। এটা শুধু সফরের জন্য। তারা বলতে চান, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সকল হাদীসে সাত ভাগে কুরবানি দেওয়ার বৈধতা দিয়েছেন, এগুলো সফর অবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন। এটা বাস্তব যে, তিনি বিদায় হজে বা সফরের সময়ে কুরবানি দেওয়ার ক্ষেত্রে সাতভাগে কুরবানি করার অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই, তারা বলতে চান, অন্য সময়ে অর্থাৎ বাড়িতে থাকা অবস্থায় সাতজন গরু বা উট কুরবানি দিতে পারবে না; এটা সঠিক নয়। আসলে তাদের এই দলীলের দুর্বলতা হল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোনো কাজকে বৈধতা দেন এবং সেটাকে নিজে সীমাবদ্ধ না করেন এবং অন্য কোনো হাদীসে এটার বিপরীত না থাকে, অর্থাৎ অন্য কোনো হাদীসে নেই যে, তোমরা সাত ভাগে দিতে পারবে

না। আবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন নি এটা (সফরের) জন্য খাস। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কোনো নির্দেশনাকে তার শানে উরূদ বা শানে নুযুল, যে অবস্থায় বলেছেন, তার সাথে সংশ্লিষ্ট করা, অন্য অবস্থায় না জায়িয বলা, এটা ইসলামি শরীআতের, কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণের পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আর এজন্যই বিশ্বের সকল ফকীহ মোটামুটি সাতজন উট বা গরু কুরবানি দেওয়া বৈধ (বলেছেন)। এখন প্রশ্ন হল, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়া যাবে কিনা। এখানে আমরা সাধারণত বলে থাকি মৃত ব্যক্তির নামে, এই বলার ভঙ্গিটা খুবই আপত্তিকর। যবাইটা হবে একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহর নামে! 'বিসমিল্লাহ'। আল্লাহ ছাড়া কারো নামে যদি কুরবানি হয়, তাহলে তো এটা মৃত পশুর মতো হারাম হয়ে যাবে। তবে আমরা যেটা বলতে চাই, আমরা বলি এক, কিন্তু উদ্দেশ্য হল মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে; এটা আমরা সবাই সুন্দর করে বলার চেষ্টা করব। আমি আমার পক্ষ থেকে, আব্বার পক্ষ থেকে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে, সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানি দিই। আমাদের নামেই যদি কুরবানিটা যবাই করা হয়, তাহলে তো ওটা হারাম পশুতে পরিণত হয়ে গেল এবং কর্মটাও শিরক হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়া যাবে কিনা, এই ব্যাপারে ফুকাহাদের কিছু মতভেদ আছে, এ ব্যাপারে অধিকাংশ ফকীহ বৈধ বলেছেন। এমনকি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া রাহ., যিনি মাযহাব নিরপেক্ষভাবে গবেষণার জন্য অতি প্রসিদ্ধ, তিনিও এটার বৈধতা দিয়েছেন। এটার দুইটি কারণ। এই ব্যাপারে একটা হাদীস রয়েছে, ইমাম তিরমিযি সঙ্কলন করেছেন, হাদীসটা সনদগতভাবে দুর্বল। আলী রা. বলতেন, আমি রাসূল (ﷺ) এর ওফাতের পরেও একটা কুরবানি আমার পক্ষ থেকে দিই, আরেকটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পক্ষ

থেকে দিই। ইমাম তিরমিযি নিজেই দুর্বল বলেছেন।[১] অন্য একটা হাদীস এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মদীনাতে কুরবানি দিতেন, সাধারণত দুইটি কুরবানি দিতেন, একটা বলতেন মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ, আরেকটা বলতেন-

مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

আমার উম্মাতের যারা কুরবানি দেয় নি, তাদের পক্ষ থেকে এই কুরবানি দিলাম।[২] এখানে তাঁর উম্মতের যারা কুরবানি দেয় নি তাদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছিল। অনেকের জন্মই হয় নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে তাদের পক্ষ থেকে কুরবানি দিতেন। এজন্য অধিকাংশ ফুকাহা বলেছেন, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে জীবিতদের কুরবানি দেওয়া এটা নফল সাদাকা, তাসাদ্দুক হিশেবে তাদের জন্য সাওয়াব পাঠানো বৈধ। এভাবে কুরবানি করলে কুরবানি হবে। এবং যার পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়া হবে তিনি সাওয়াব পাবেন। এখন কুরবানির গোশত বণ্টন। বণ্টনের কমবেশি হওয়াটা অবৈধ নয়। কিছু গরীবদের দেওয়া, কিছু নিজেরা খাওয়া, কুরবানির গোশত আমরা খেলেও সাওয়াব হবে, যার পক্ষ থেকে দিয়েছেন তারও সাওয়াব হবে। তবে কিছুটা গরীবকে দিতে হবে। না দিলে কুরবানির হকটা ষোলো আনা পূরণ হবে না। একটু উনিশ-বিশ হলে সমস্যা হবে না। তবে পুরোটাই শুধু গোশত খাব, কাউকে দেব না, পয়সা বাঁচাব, এমন চিন্তা হলে কুরবানি হবে না।

প্রশ্ন-৯৮: আমাদের দেশে কুরবানির সময় সাতভাগে সাত জনের নাম দেওয়া হয়। আমি বুখারিতে দেখেছি, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উম্মতের পক্ষ থেকে দিতেন। সেখানে আমি একভাগ কুরবানি

---

[১] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-১৪৯৫

[২] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-১৩৭৬; তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-১৮৯১

আমার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে দিই, আমার পার্সোনালি নাম লিখতে হবে কিনা?

<u>উত্তর:</u> কুরবানিতে নাম উল্লেখ করা, এটা সুন্নাতের বাইরে নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরবানি দেওয়ার আগে অথবা পরে (বলতেন), হাযা মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ! আল্লাহুম্মা হাযা মিনকা ওয়া লাকা। তাকাব্বাল মিন্না মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদঃ এটা আপনারই জন্য, এবং আপনার পক্ষ থেকে আপনার তাওফীকেই দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কবুল করে নেন। এজন্য কুরবানি যবাইয়ের সময় নয়, যবাইয়ের আগে যদি কেউ এটা মুখে বলে যে, অমুক অমুকের পক্ষ থেকে। এখানে আমি আপনাদের সতর্ক করি, অমুক অমুকের নামে কুরবানি, এটা কিন্তু কথা হিশেবে শিরকি কথা। যদিও আমাদের উদ্দেশ্য শিরক নয়। কুরবানি হবে একমাত্র আল্লাহর নামে, আল্লাহ ছাড়া কারো নামে কোনো যবাই, কুরবানি হলে এটা শিরক হয়। 'বিসমিল্লাহঃ আল্লাহর নামে, আব্দুল করীমের পক্ষ থেকে'। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পক্ষ থেকেই, কিন্তু 'নামে' কথাটা বলি ভালো নিয়তে খারাপ কথা। এটাকে বর্জন করতে হবে। তবে অমুক অমুকের পক্ষ থেকে বলায় দোষ নেই। আপনি বলেছেন, ফ্যামিলির পক্ষ থেকে। এই বিষয়টা নিয়ে ফুকাহাদের মতভেদ আছে। যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'মিন মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদঃ মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের ফ্যামিলির (পক্ষ থেকে) ; এটা খুব সিম্পল কথা। আপনি যখন কুরবানি দেন, আপনি আপনার স্ত্রী পুত্র সবার পক্ষ থেকেই তো দেন, এটা বলা যে, এটা আমার এবং আমার ছেলেমেয়ের পক্ষ থেকে, এটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু আপনার নাম না বলে, শুধু পরিবারের নাম বলবেন কিনা, পরিবারে যারা স্বচ্ছল আছেন কুরবানি দেওয়ার মতো পাঁচভাই, ছয়ভাই, তাদের সবার পক্ষ থেকে একটা কুরবানি হবে কিনা, এটা নিয়ে ফুকাহাদের বিতর্ক রয়েছে।

<u>প্রশ্ন-৯৯:</u> গরু কুরবানি দেওয়া হয় সাত নামে, এর মধ্যে আকীকা দেওয়া যাবে?

<u>উত্তর:</u> আকীকার জন্য হাদীস শরীফে নির্দেশ রয়েছে, شاة أو شاتان: (একটি বা দুটি) ছাগল ভেড়া দুম্বা– এই জাতীয় পশু। গরুর কথা কোথাও নেই। অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে, একটা প্রাণি। ভাগ করার কথা হাদীস শরীফে আসেনি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবায়ে কিরাম, তাঁরা একটা প্রাণিই দিতেন। আয়িশা রা. কে তাঁর এক ভাগ্নে হলে বলা হয় যে, আপনি একটা উট আকীকা করেন। উনি বললেন আমি কেন উট আকীকা করব? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাগল আকীকা করতে বলেছেন। এটা বাইহাকির সুনানে কুবরাতে এসেছে। প্রথম কথা হল, সন্তানের আকীকা দিতে হয় সপ্তম দিনে, এটাকে যতো দেরি করা হয়, সুন্নাতটা ততো পিছিয়ে গেল। সময়টা আর পেলাম না, সময়ের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, আকীকার সাথে কুরবানি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কিরাম করেননি। তবে পরবর্তী ফুকাহারা অনেকেই কিয়াস ইজতিহাদ করে এটাকে জায়িয বলেছেন। জায়িয আর সুন্নাত এক নয়। যেমন আমরা যখন পশু যবাই করি, তখন ফুকাহারা বলেছেন যে, 'আল্লাহু আকবার' বা 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' না বলে, কেউ যদি 'আল্লাহ' বা 'পরম করুণাময় দয়ালু' এই টুকু মুখে নিয়ে যবাই করে, যবাই জায়িয হবে। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বাদ দিয়ে, শুধু 'আল্লাহ' কিংবা 'পরম করুণাময়' বলে যবাই করব। এর অর্থ, কেউ যদি করে ফেলে, আশা করা যায় হয়ে যাবে। এজন্য, সুন্নাত হল, আপনি কুরবানি এবং আকীকা পৃথক ভাবে দেবেন। আকীকা একটা বা দুটি প্রাণি এবং সেটা মূলত ছাগল জাতীয় পশু হওয়া উচিত। আর কুরবানি আপনি ছাগল, গরু উভয়ই দিতে পারেন। আমরা কুরবানি আকীকা মেশাব না, এটাই উত্তম। তবে,

ফুকাহারা যেহেতু বলেছেন, আর ইবাদাতটা মূলতই মুসতাহাব ইবাদত। আমরা আশা করি হয়তো হয়ে যাবে। আপনারা কেউ ঝগড়া করেন, কখনোই চাই না, কারণ এই মুসতাহাব বিষয় নিয়ে আপনারা বলবেন, তোর আকীকা হয় নি, কারোর আকীকা হয় নি, ওই আলিম কিছু বোঝে না– আপনি একটা কবীরা গুনাহের ভেতরে লিপ্ত হয়ে গেলেন। মানুষকে অহঙ্কার করা, অবজ্ঞা করা, ঝগড়াঝাটি করা; এটা কবীরা গুনাহ।

<u>প্রশ্ন-১০০:</u> আমাদের অনেক নেককার মা-বোনেরা পারিবারিক কাজ করতে করতে, দুনিয়ার যে আনন্দ সেটা একসময় ভুলে যান, দুনিয়ার যে চাহিদাটা, এই বোনদের জন্য আমরা কী পরামর্শ দিতে পারি?

<u>উত্তর:</u> আসলে, আমরা কেউ কেউ নারীর ক্ষমতায়নের নামে, মেয়েদেরকে তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধভাবে সামাজিক কাজে ব্যস্ত করে, তাদের নারিত্ব এবং মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছি। আবার অন্য অনেকে নারীদেরকে ঘরের ভেতরে কৃতদাসীর মতো বন্দি করে রেখেছেন। স্ত্রী আমার রান্নার কর্মচারী– এরকম একটা অবস্থা হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে এটা খুব কঠিন অবস্থা। আমি আবারো বলি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ভেতর আমাদের আদর্শ রয়েছে। এটা শুধু টুপি-পাগড়ি আর মিসওয়াকের না, প্রতিটি বিষয়ে। তিনি কীভাবে পরিবার করেছেন...। আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। ৬০ বছরে রাসূল (ﷺ) তাঁর স্ত্রীর সাথে খেলা করেছেন। গল্প-আড্ডাটা ইবাদত। আমরা আরেকটা খুব সমস্যায় পড়ে গেছি। কিছু দিন আগে, অর্থাৎ ত্রিশ বছর আগেও আমাদের সমাজের যে অবস্থা ছিল। পরস্পরের বিভিন্ন পরিবার-বাড়িতে বিবাহ হলে আশেপাশের সবাই গিয়ে রান্না করত; এরকম মেয়েদের একটা বিনোদন ছিল। আমরা এখন আধুনিক ব্যবস্থায় পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে গেছি। কিন্তু

পরিবারে কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা নেই একমাত্র টিভি (ইত্যাদি) ছাড়া। এক্ষেত্রে আমাদের যেটা করণীয়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাত। এক নম্বর হল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মেয়েদেরকে সকল সামাজিক ধর্মীয় কাজে যেতে উৎসাহ দিয়েছেন। মসজিদে যাবে, ওয়ায শোনবে, আলাদা ওয়ায মাহফিল করবে। মেয়েরা ঈদের মাঠে যাবে, মেয়েরা জুমুআর মসজিদে যাবে। তাহলে কী হবে? এই যে, জীবনটার কোনো মূল্য নেই, আমি শুধু রান্না করি, খাই– মূল্যহীন হওয়া যেটা, এই অবস্থা হবে না। জীবনটা অর্থবহ হয়ে যাবে। মেয়েদেরকেও আল্লাহ তাআলা শুধু রান্না করতে পাঠাননি। তাদের যে আত্মিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, এটা মেটানোর ব্যবস্থা রেখেছেন। দ্বিতীয় কথা হল, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করতে হবে। অর্থাৎ কোনো নারী যদি এইসব ইবাদতের পাশাপাশি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতা, আল্লাহর মা'রিফাত অর্থাৎ নামাযের সিজদায় গিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলা, নামাযটা বুঝে পড়া, কুরআনটা বুঝে তিলাওয়াত করা, কিছু দীনি মহিলাদের সাথে কথা বলা– দেখবেন, জীবনটা অর্থবহ হয়ে উঠবে, আনন্দময় হয়ে যাবে। এগুলো আমাদের করতে হবে। আপাতত এই বিষয়গুলোই যদি আমরা মনে রাখি। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের দায়িত্ব আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতা এবং মেয়েদেরকে তাদের জন্য সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে...; দেখেন, মেয়েরা মসজিদের ভেতরে– বুখারির হাদীস, খন্দকের যুদ্ধে, পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে নয় পরে, একজন আহত হয়েছেন, একজন মেয়ে এসে মসজিদের ভেতরে ওই পুরুষের সেবার জন্য তাঁবু করেছেন, ওষুধ এনে দিচ্ছেন। মেয়েরা অত্যন্ত এক্টিভ ছিলেন, সমাজে সকল কাজে অংশগ্রহণ করতেন। আয়িশা রা. তিনি কবি ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন। আমি কয়েকদিন আগে পড়েছিলাম, ইবন শিহাব যুহরি অনেক বড় ফকীহ ছিলেন, তিনি পাঁচজন তাবিয়ির কাছ থেকে দীন শেখেন, তাদের একজন মহিলা। তিনি ওই যুগের উম্মুর রিজাল আমরাহ বিনতু আবদুর

রাহমান। বুখারিতে অনেক হাদীস রয়েছে তাঁর। তিনি এতো বড় ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন, শুধু তাঁর আত্মীয়রা নয়, দূর-দূরান্তের পুরুষেরা এসে ইলম শিখতেন।

প্রশ্ন-১০১: পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে মানুষ পোলাও মুরগি চিড়া দই খাবার দাবার পোশাক– আমরা মুসলিমরা করছি। আমাদের এক রিলেটিভ আমাদের দাওয়াত দিয়েছে। বলেছি, এই দিনে খাব না। উনি বলেছে, এটা আমরা পালন করতে পারি, গুনাহ হবে না। একটু বলবেন।

উত্তর: প্রথম কথা হল, পয়লা বৈশাখ! পয়লা বৈশাখ ১৪১৯ সাল কেন? এই ১৪১৯ সাল কোথা থেকে শুরু? যেমন, আমরা বলি ২০১২ সাল। আমরা জানি, ঈসা আ. র জন্ম থেকে এটা গণনা শুরু হল। এখন ১৪১৯ বছর পূর্বে কী হয়েছিল? আমরা যদি ফিরে তাকাই, তাহলে দেখব, বাঙলা পয়লা বৈশাখ মানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হিজরতের ১৪১৯ বছর। এটা সম্পূর্ণ পিউর ইসলামি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হিজরতকে কেন্দ্র করে। এই চেতনা কীভাবে জানি, আমাদের ভেতর থেকে দূর করে ফেলা হয়েছে। এই যে পয়লা বৈশাখ, অর্থাৎ বৈশাখের খরতাপে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) হিজরতের সেই স্মৃতি! তিনি হিজরত করেছিলেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে, সত্যের পথে থাকতে মাতৃভূমি ত্যাগ করে প্রচণ্ড রোদের ভেতরে গিয়েছিলেন সেই মদীনা শরীফে,সত্যকে বিজয় দেওয়ার জন্য। এই চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার কোনো চেতনা আমাদের আসেনা। দ্বিতীয় বিষয়টা হল, পয়লা বৈশাখ তো আর আজকে না, অনেক বছর ধরে আমাদের দেশে আছে। কই, আমরা যখন ছোট ছিলাম, আপনারা যখন ছোট ছিলেন, পয়লা বৈশাখে তো এসব কিছুই ছিল না। এগুলো নতুন আমদানি করা, বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ এটার উদ্ভাবক। অর্থাৎ এই উপলক্ষে কিছু না কিছু...। বর্তমান

বিশ্বটা আসলে বাণিজ্যের উপরে চলে। অধিকাংশ মানুষ দুই রকম। আপনারা জানেন, ছোট মানুষ অনুকরণপ্রিয় হয়। বড় মানুষ অতো হয় না। আমাদের মানবতা-মনুষ্যত্ব যতো অপূর্ণ থাকে, আমরা ততো অনুকরণপ্রিয় হই। আমাদের ভেতরের পূর্ণতা যতো বেশি হয় ততো অনুকরণ বিমুখ হই। স্বভাবতই আমরা অধিকাংশ মানুষ অনুকরণপ্রিয়। গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমাদের অনুকরণপ্রিয়তাকে এক্সপ্লয়েট করে বাণিজ্য করতে হবে, এই বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য এগুলো আবিষ্কার করা হয়েছে। তৃতীয় যে বিষয়টা, আমরা এই যে প্রতিবছর উৎসব করি, এটাকে ঈদ বলা হয়। মুসলিমদের মাত্র দুটো, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। আরব দেশে এইরকম নববর্ষের ঈদ ছিল, যেটাকে নওরোয বলা হত। মেহেরজান। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এই নববর্ষের ঈদটা হল তোমাদের একটা জাগতিক সেক্যুলার ঈদ। লক্ষ্য করুন, ইসলামের ঈদ এবং সেক্যুলার ঈদের ভেতরে পার্থক্যটা দেখুন, সেক্যুলার ঈদে আমাদের দৈহিক-জৈবিক আনন্দ করা হয়। আত্মা এবং সমাজ দূরে থাকে। পহেলা বৈশাখে আমরা খাব! খাব!! খাব!!! কিনব! কিনব!! কিনব!!! খাওয়াব, পরাব, দেব– এই চেতনা পয়লা বৈশাখে নেই। কিন্তু ইসলামে যে দুটো ঈদ দিয়েছে, এটা খাব-খাওয়াব, পরব-পরাব, আনন্দিত হব-হওয়াব। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন, আল্লাহ তোমাদের ওই নববর্ষ এবং মেহেরজানের পরিবর্তে তোমাদেরকে এমন দুটো ঈদ দিয়েছেন, যা ওই ঈদের চেয়ে ভালো। কারণ ওই ঈদে শুধু খাওয়া, খাওয়া, খাওয়া এবং খাওয়া। জৈবিক আনন্দ অশ্লীলতায় চলে যায়। আর ইসলাম যে আনন্দ দিল, জৈবিক, খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়া, ফুর্তি করা এবং করানো সবাইকে নিয়ে। আমরা আবার সেই পাশবিকতা জৈবিকতায় ফিরে যেতে চাচ্ছি বাণিজ্যিক কারণে। দুর্ভাগ্য হল যে, আমরা অধিকাংশ মানুষ অনুকরণপ্রিয় শিশুদের মতো, বানরের মতো– যতোক্ষণ না আমাদের ভেতরে আভ্যন্তরীণ পূর্ণতা আসে। আর এই পূর্ণতা

আনাটাও কঠিন। আর এজন্য অনুকরণপ্রিয়তাকে exploit করে আমাদেরকে এটা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পহেলা বৈশাখ যদিও একান্ত পিউর ইসলামি একটা ট্রেডিশন। এটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হিজরতের বর্ষপালন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা যেভাবে করছি, এটা অমুসলিম সংস্কৃতি বললেও কম বলা হয়। এটা অনুকরণ করা, পালন করা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য কমবেশি পাপের কাজ। যদি পহেলা বৈশাখ উদযাপনই করতে হয়, তাহলে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হিজরতের স্মৃতি উদযাপনের মাধ্যমে করতে পারি। আর যে এইগুলো– পান্তা-ইলিশ, শাড়ি-কাপড়, বৈশাখী র‍্যালি ইত্যাদি, এগুলো সব– দুটো উদ্দেশ্যে। একটা হল সরাসরি বাণিজ্য, আরেকটা হল অশ্লীলতার প্রসারের মাধ্যমে আর কিছু ধরনের বাণিজ্যের প্রসারতা করা। কিন্তু আমাদের যারা সমাজকর্মী। আমরা জানি না তারা কীভাবে বোঝেন। আমরা যদি দেশ এবং জাতিকে সত্যিই ভালোবেসে থাকি, আমরা যদি চাই আমাদের দেশের যুবক-সমাজ, কিশোর-সমাজ সত্যিই ভালো হবে– আমরা রাজনীতি করব, বাণিজ্য করব, সব ঠিক আছে, কিন্তু এমন কিছু কেন করব যাতে...। আমার এলাকাতেই, গত ছাব্বিশ মার্চ তিনটা মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে গার্লস স্কুল থেকে। তার আগের মাসে একটা যুবক ছেলেকে তার বন্ধুরা খুন করে মুখ পুড়িয়ে গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে রেখে গিয়েছে। তার কয়েকদিন আগে, একটা কিশোরী মেয়েকে নদীর পানির ভেতরে বস্তাভরা লাশ পাওয়া গেছে, তার আত্মীয়স্বজন তাকে হত্যা করে রেখে গেছে তার বাবার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য। এইভাবে যে অবক্ষয় আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে, যুবক কিশোরদের ভেতরে যে হিংস্রতা, violence (সহিংসতা) আমরা দেখছি। এটা আজ থেকে দশবছর আগে কল্পনা করিনি। আমরা যদি মিডিয়া-মাধ্যমে এই ধরনের violence বা বাণিজ্যিক উপকরণ ছড়ানোর নামে যুবক-যুবতীদের অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, আত্মকেন্দ্রিক,

শুধু খাও-খাও, যেটা selfishness (আত্মকেন্দ্রিকতা), অথবা consumerism (ভোগবাদ) যেটাকে বলা হয়, এইটা আমরা যদি প্রসার করতে থাকি, তাহলে আমাদের এই গরীব দেশটা খুব দ্রুত অবক্ষয়ে চলে যাবে। এইজন্য আমরা এইসকল উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কিছু ত্যাগের শিক্ষা যদি দিতে পারি, তাহলে হয়তো আমাদের দেশটাকে রক্ষা করতে পারব।

<u>প্রশ্ন-১০২:</u> সেদিন আমার একটা ফ্রেন্ড বার্থডে উপলক্ষে আমাকে ক্যান্ডি দেয়, তখন আমি ওকে উইশ করি। এতে কি আমার গুনাহ হবে?

<u>উত্তর:</u> আমাদের ধর্মহীন নাস্তিক জগতে হল **wish**। wish মানে আমি ইচ্ছা করি। বলুন তো, আমার-আপনার, সারা বিশ্বের মানুষের ইচ্ছের কী মূল্য আছে, যদি আল্লাহ না ইচ্ছা করেন? ইসলামের কথা হল দুআ! pray। আল্লাহর কাছে চাই যে, তোমার ভালো হোক। আমি wish করি তোমার ভালো হোক। আমার শুভেচ্ছা, শুভকামনার কী মূল্য আছে? আসলে দীন ধর্ম বিশ্বাসহীন অথবা প্রকৃতিপূজারী, তারা নিজের ইচ্ছাকে প্রকৃতির..., তারা গরম লাগলে গায়ে কাদা মাখেন, এই বুঝি বৃষ্টি হল। পয়লা বৈশাখে চিন্তা করলেন যে, কিছু পরিবর্তন দিয়ে সারা বছরের পরিবর্তন কল্পনা করলাম। এটা আসলে বিশ্বাসহীন কল্পনা ইচ্ছা। আমরা wish করব না, আমরা pray করব। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে চাইব। দুআ করব যে, আল্লাহ তোমার ভালো করুক। ইংরেজি, বাঙলা, আরবি– যেভাবেই করি। খুবই ভালো হয়, যদি এটা আরবিতে সুন্নাত বাক্য হয়। এটা সকল ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় কথা হল, কোন উপলক্ষে এই দুআটা করছি? ইসলাম দুআ করা পছন্দ করে। তবে জন্মদিন, যেটা আমরা করি, এটা ইসলামের কোনো উপলক্ষ্য নয়। এটাকে বাদ দিতে পারলে ভালো হয়। তারপরও কোনো উপলক্ষ্যে যদি বন্ধুবান্ধবের জন্য

দুআ করেন, আল্লাহ তোমার ভালো করুন, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। দুআ করা ভালো জিনিস। উপলক্ষ্যটা ভালো হল না। এগুলো বর্জন করা উচিত। আমরা যারা জন্মদিন পালন করি, তারা দুই ধরনের! এক ধরনের যারা পরাজিত মুসলিম, অর্থাৎ নামায-রোযা সবই করি, দীন ভালোবাসি। আবার যে সাংস্কৃতিক যে আগ্রাসন, যা দশবছর আগেও ছিল না, এখন রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা টেলিভিশন-মিডিয়াতে দেখতে দেখতে ওটা আমাদের জীবনের সাথে এমন হয়ে গেছে, না করলে যেন পরপর মনে হয়। সমাজবিচ্ছিন্ন মনে হয়। এই ধরনের মুসলিমরা জন্মদিনে wish ইত্যাদি করেন। এটার আমরা বৈধতা বা উৎসাহ দিচ্ছি না। তবে আশা করি, এটা ছোটোখাটো অন্যায়ের ভেতরেই থাকবে। আর যারা বিজয়ী মুসলিম। অর্থাৎ শুধু আমলই নয়, পাশাপাশি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ই যথেষ্ট। আমার আদব ইসলামি কৃষ্টি কালচার যথেষ্ট। তারা যদি এগুলোর ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয়। ঈদ উপলক্ষে বা অন্য উপলক্ষে আমরা রিংয করব, সাধারণত সবসময় দুআ করব। প্রতিটি কথায় দুআ করব। যেটা সুন্নাতে পাই। প্রত্যেক কথার আগে পরে, কথার শেষে দুআ করা, 'আল্লাহ তোমার ভালো করুক', আরবিতে বাঙলায় দুআ করা, এটা হল ইসলামি আদব। এটা বছরে একবার নয়। ৩৬৫ দিনে কয়েক হাজারবার দুআ করা, এটা হলে সবচে' ভালো হয়।

<u>প্রশ্ন-১০৩:</u> জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়গুলো যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে (ঈদের) চাঁদ নিয়ে আমরা বিভেদ সৃষ্টি করি কেন?

<u>উত্তর:</u> আসলে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে সহজ করেছেন। আর এই সহজের একটা বড় দিক হল, flexibility (সহজলভ্য)। সেই আফ্রিকার জঙ্গলের সাধারণ মানুষ, শূন্যে ভাসমান মানুষ, আমেরিকার ওয়াশিংটনের মানুষ আর বাংলাদেশের পার্বত্য

চট্টগ্রামের মানুষ– যে কোনো মানুষ অতি সহজে এই ধর্ম পালন করতে পারবে, এমনভাবে বিধানটা দেওয়া হয়েছে। আর এজন্যই আমাদের ইবাদাতগুলো– রোযা-সিয়াম, চাঁদের সাথে। কারণ সবাই সব দেশে দেখে দেখে ইবাদত করব; সূর্য যখন ডোবে তখন মাগরিব পড়ো। ঘড়ি সহায়ক। তবে মূল আমাদেরকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের সহায়তা নিতে পারি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখেই ইদুল ফিতর করবে।[৩] কাজেই আমরা বিজ্ঞানের সহায়তা নিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশ অমান্য করে, চাঁদ না দেখেই বিজ্ঞাননির্ভর হতে পারি না। কারণ চাঁদ দেখাটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশ। এজন্য বিজ্ঞান এবং দেখা– দুটোর সমন্বয় করায় সবচে' উত্তম। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিন।

[৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১০৮১; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৬৮৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-২১১৭

মানত/নযর/কসম

প্রশ্ন-১০৪: গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা যায় না, যেমন আমার আব্দুল্লাহর কসম বা কাবা শরীফের কসম। এই জাতীয় কসম খেলাফ করলে নাকি কাফফারা দিতে হবে না, এই ব্যাপারটা একটু জানতে চাচ্ছি।

উত্তর: আমরা অনেক সময় না বুঝে বলি, 'রাসূলের কিরে, কাবার কিরে'। এগুলোকে হাদীস শরীফে শিরক বলা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কারো নামে, কারো দোহাই দিয়ে প্রতিজ্ঞা করা, শপথ করা, এটাকে শিরক বলা হয়েছে। কারণ এটা একধরনের veneration (গভীর শ্রদ্ধাভক্তি)। তাদের ব্যাপারে একটা ভক্তি প্রকাশ করা যে, এই নামটার অবাধ্য করলে, আমার ক্ষতি হবে, এজন্য এটাকে শিরক বলা হয়েছে। এটা আমরা বর্জন করব। আল্লাহ তাওফীক দান করেন। (উপস্থাপক: অনেক সময় কাবা শরীফের সামনে গিয়ে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মসজিদে নববির সামনে গিয়ে ...)। এটা হল স্থানের কথা। কাবার পাশে বসে আল্লাহর নামে কসম করছি। নবীজির মিম্বারের পাশে, মিম্বার ছুঁয়ে বলছি, আমি এটা করি নি। আল্লাহর কুরআন হাতে নিয়ে বলছি, এটা করি নি। এটাই সাধারণ নিয়ম। আমি আমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আল্লাহর কাছে কসম করছি, এটা আল্লাহর নামে কসম হয়ে গেল।

প্রশ্ন-১০৫: আমার ওয়াইফ যখন অসুস্থ হয়েছে তখন বলেছে, আমার অসুখ যদি ভালো হয়, তাহলে আমি জানের বদলা জান দেব। এটা কীভাবে দিতে হবে জানতে চাচ্ছি? আকীকা হলে কুরবানির সাথে দেওয়া যাবে?

উত্তর: জানের বদলা জান হল মানত, নযর। এটা আপনাকে

কুরবানি বা আকীকার সাথে কখনোই নয়, এটা পৃথকভাবে একটা প্রাণি যেটা কুরবানির যোগ্য, অর্থাৎ একবছর অন্তত, ছাগল অথবা গরু। আপনি এটা একান্ত হতদরিদ্র যারা রয়েছে, যারা সমাজের দরিদ্র, মুসলিম হতে হবে অবশ্যই, দরিদ্রদের ভেতরে এটা বণ্টন করে দেবেন। যবাই করে তাদেরকে দিয়ে দিতে পারেন। একজন হতদরিদ্রকে একটা ছাগল দান করে দিতে পারেন, এটার মানত এভাবে আদায় করতে হবে। এই মানতটা আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ ফরয পর্যায়ের, যেহেতু তিনি মানত করে ফেলেছেন। আর কুরবানি বা আকীকার সাথে মানত হয় না। মানতটা শুধু গরীবদের পাওনা, কুরবানি এবং আকীকা সবাই খেতে পারে। নিজেরাও খেতে পারেন। মানতের গোশত কোনো অবস্থাতেই মানতদাতা, তার আব্বা-আম্মা-সন্তান-সন্ততি গরীব হলেও খেতে পারবে না। অন্যান্য গরীবেরা এটা খাবে।

<u>প্রশ্ন-১০৬:</u> আমার প্রশ্ন হল, আমার গলার নিচে একটা টিউমার হয়েছিল। তারপর আমি ডাক্তার দেখিয়েছি। ডাক্তার বলেছে, পরীক্ষা করতে। পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি নিয়ত করেছি যে, আমার যদি ক্যানসার ধরা না পড়ে তাহলে আমি তিনমাস রোযা করব। পরীক্ষা করে ধরা পড়ে, আমার যক্ষা হয়েছে। ক্যানসার হয় নি। তারপর ছয়মাস ওষুধের কোর্স কমপ্লিট করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। এরপর ২/৩ বছর হয়ে গেছে, আমি রোযা করতে পারি নাই। এরপর কিডনির সমস্যা হয়েছে। আমি আর মানত পুরা করতে পারি নাই। এখন আমি কী করব?

<u>উত্তর:</u> আপনার মানতে পূরণ করতে হবে। আপনার দায়িত্ব ছিল মানত পূরণ করা। এই শীতে পারলে পূরণ করেন, চেষ্টা করতে থাকেন। যদি একান্ত শারিরীকভাবে অক্ষম হয়ে যান তখন কাফফারার প্রশ্ন আসবে। আপনাকে মানত পূরণ করতে হবে।

<u>প্রশ্ন-১০৭</u>: সাদাকার খাসি জানের বদলা জান ছিল কিনা, এটা জানা যাচ্ছে না। কেউ বলল যে, এই মাদরাসায় এই খাসিটা আমি সাদাকা করে দিলাম। এখন সেই গোশতটা ওই সদকাকারী খেতে পারবে কিনা?

<u>উত্তর</u>: এটা আসলে আমাদের দেশের অস্পষ্ট পরিভাষাগুলোর একটা। অনেক সময় সাদাকা বলতে মানত বলা হয়, আমাদের দেশে বলা হয়। মানত হওয়ার জন্য একটা শর্ত হল, মানত শব্দটা; মানত করলাম, নযর করলাম এগুলো বলতে হয়। কাজেই কেউ যদি নিয়ত করে শুধু যে, আমি ইনশাআল্লাহ, একটা ছাগল মাদরাসায় দেব, অথবা খুশি হয়ে দান করব...; সাদাকা শব্দের অর্থ দান, এটা ফরয দান, নফল দান মানত হতে পারে। কাজেই আমরা এইক্ষেত্রে একটু confirm (নিশ্চিত) হওয়ার চেষ্টা করব। যে ব্যক্তি দিচ্ছেন তাকে বলতে হবে যে, আপনি কেমন নিয়ত করেছিলেন, আপনি কি মানত করেছিলেন? আর যদি না জানা যায়, সাধারণভাবে এটা সবার জন্য গ্রহণযোগ্য। (উপস্থাপক: আর যদি এরকম সাদাকা হয়, তাহলে তো পরিবারের কেউ খেতে পারবে না?) না! যিনি দিয়েছেন তিনিও পারবেন না, এমনকি ইয়াতীমখানা, মাদরাসায় দিলে শিক্ষকরা খেতে পারবেন না। শুধু গরীব ইয়াতীম ছাত্ররা খেতে পারবে।

<u>প্রশ্ন-১০৮</u>: আমাদের দেশে এক ধরনের শপথ আছে, সেটা হল, মাথায় হাত স্পর্শ করে, 'আমি তোমার মাথায় হাত স্পর্শ করে বলছি বা সন্তানের মাথায় হাত ছুঁয়ে আমি বলছি'। এই ধরনের শপথ যদি কেউ করে, এই ক্ষেত্রে ইসলাম কী বলে?

<u>উত্তর</u>: শপথের ক্ষেত্রে স্থান বা বিষয়ের একটা গুরুত্ব সাহাবিদের যুগ থেকে পাওয়া যায়। সেটা হল, বুখারিতে পড়েছিলাম, উমার রা. কাউকে কসম করাতে হলে, বিচারের ক্ষেত্রে কসম একটা...

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

যিনি কিছু দাবি করবেন, তাকে প্রমাণ দিতে হবে। প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হলে, যিনি বিবাদী তাকে কসম করানো হয়।[১] কসম করানোর ক্ষেত্রে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বারের কাছে নিয়ে কসম করাতেন। মানে, কসম সর্বাবস্থায় ভয়ঙ্কর। কিন্তু নবীজির মিম্বারের কাছে দাঁড়িয়ে, মিম্বার ছুঁয়ে কসম করছি, আরো ভয়ঙ্কর। আসরের পরে কসম করাতেন। আসরের পরের সময়টা দুআ কবুলের সময়। এই স্থান বা সময়কে গুরুত্ব দিয়ে কসম করানোর প্রচলন পূর্বযুগেও ছিল। বর্তমানে এরই একটা প্রকাশ, সন্তানের মাথায় হাত ছুঁয়ে, অর্থাৎ আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমার সন্তানের ক্ষতি হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মাথায় হাত দিয়ে মিথ্যা বলা, এটার কোনো শারয়ি (ভিত্তি নেই)। এটা শপথ হিসেবে গণ্য হবে। যদি intentionally (ইচ্ছাকৃত) ভঙ্গ করে তাহলে ভয়ঙ্কর কবীরা গুনাহ হবে। এবং সেটা যদি পিতামাতার ক্ষেত্রে হয়, সেটা সন্তানের জন্য বদদুআ হিশেবে গণ্য হবে। কসম যদি উনি মিথ্যা ইচ্ছা হিশেবে করেন, অর্থাৎ মাথায় হাত দিয়ে কসম করলেন, কিন্তু মিথ্যা, অর্থাৎ অতীতে করেন নি কসম করে বলছেন, করেছেন। তাহলে ওটা মিথ্যা। এটা একদিকে ইয়ামীনে গামুস বলা হয়। এটা ভয়ঙ্করতম মহাকবীরা গুনাহের একদম প্রথম পর্যায়ের শির্কের পরেই। শিরক করা, মানুষ খুন করা, এরপরে ইয়ামীনে গামুসের কথা। এটা তার সন্তানের জন্য বদদুআ হিশেবে গণ্য হবে। আমরা জানি, বিভিন্ন হাদীসে এসেছে, মানুষ যখন দুআ বা বদদুআ করে, আল্লাহ হয় ওটাই গ্রহণ করেন বা ওর বিনিময়ে অন্য কোনো ভালো চাইলে ভালো দেন, খারাপ চাইলে খারাপ দেন। বিপদ কাটিয়ে দেন। কাজেই এই বদদুআ সরাসরি অথবা বিভিন্নভাবে তাকে তাড়িয়ে দেবে।

---

[১] বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস নং-২১২০১; মারগিনানি, আল হিদায়াহ ৪/৪৯৭

<u>প্রশ্ন-১০৯:</u> আমি যদি অমুক কাজ করি তাহলে হাত ভেঙে যায়, চোখ নষ্ট..., এভাবে বললে, হুযুর বললেন, শপথ হবে। কিন্তু... আমি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি রাহ. এর বইতে দেখেছি, ওখানে লেখা আছে যদি কেউ এমন কসম করে যে, আমি যদি অমুক কাজ করি, তবে যেন আমার হাত ভেঙে যায়, চোখ নষ্ট..., আমার উপর খোদার অভিশাপ বা লানত পড়ে, তাহলে কিন্তু কসম হয়, কসম করে ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হয় না।

<u>উত্তর:</u> যদি কসম করে যে, আল্লাহর কসম আমি এটা করব, না করলে আমার ছেলে, আমার মেয়ে মরে যাবে এটা যদি করে...। কথাটা আমি ইচ্ছে করেই বলেছিলাম। এই পয়েন্টের কারণে, কেউ যদি শুধু বলে, আমি এই কাজ না করলে আমার হাত ভেঙে যাবে, পা ভেঙে যাবে, আমার বাপ মরে যাবে– এটা কোনো কসমই না। এটা একটা নোংরা কবীরা গুনাহ। যদি কেউ বলে আল্লাহর কসম করে বলছি, এটা করব, যদি না করি তাহলে আমার হাত ভেঙে যাবে পা ভেঙে যাবে, তাহলে এটা কসমও হয়ে গেল, আবার গুনাহও হল। এজন্য যদি কেউ বলে আল্লাহর কসম করে বলছি, শপথ করে বলছি এটা আমি করব, না করলে এইটা ক্ষতি হবে, সেইটা ক্ষতি হবে, তাহলে এটা কসমও হবে এবং অভিশাপও হবে। আর যদি শুধু বলে যে, না করলে আমার হাত ভেঙে যাবে, পা ভেঙে যাবে ছেলে মরে যাবে; কসম শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে, শপথ কসম প্রতিজ্ঞা এসব শব্দ উচ্চারণ না করে তাহলে এটা শপথ বলে গণ্য হবে না। এটা শুধুমাত্র মিথ্যা প্রতারণা অভিশাপ দেওয়ার গুনাহ বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-১১০: কেউ যদি এভাবে বলে, আমি যদি অমুক কাজ করি তাহলে আমার পিতা মারা যাবে! এভাবে বলার পর যদি ওই কাজ করে তাহলে কি তার পিতা সত্যি সত্যি মারা যাবে?

উত্তর: প্রথম কথা হল, এটা ঘটবে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সবচে’ নোংরা, বাজে ও ঘৃণ্য মানুষ হল, যে তার পিতামাতা কে অভিশাপ দেয়। তো এটা হল পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়া। এটা ভয়ঙ্করতম কবীরা গুনাহ্ এবং ভয়ঙ্কর অন্যায়। সে গুনাহ্গার হবে। তার পিতা তার অপরাধে মরতে যাবে কেন? মানুষের মৃত্যু তো আল্লাহর হাতে। কেউ মরলে তার নিজের অপরাধে মরবে, ছেলে অন্যায় করবে আর পিতা মারা যাবে, এগুলো কোনো কথা নয়। উল্টোটা হতে পারে, পিতামাতার বদদুআ সন্তানের জন্য কবুল হতে পারে। কিন্তু সন্তান বদদুআ করবে যে, বাপ মরে যাক, বাপ মরে যাবে, এগুলো খুব বাজে কথা। এ কারণে বাপ মরবে না। কিন্তু ওই সন্তান ভয়ঙ্করভাবে গুনাহ্গার হবেন। দ্বিতীয়ত, এটা যদি শপথ হয় যে, আমি শপথ করে বলছি এই কাজ করব না, যদি করি তাহলে পিতা মারা যাবে। ‘পিতা মারা যাবে’ এই কথাটা তার জন্য ভয়ঙ্কর কবীরা গুনাহ্, এটা শপথের কাফফারায় মাফ হবে না, পিতার কাছে মাফ চাইতে হবে। তবে শপথ ভঙ্গ করার কারণে তাকে দশজন মিসকীন খাওয়াতে হবে, অক্ষম হলে তিনটা রোযা রাখতে হবে।

প্রশ্ন-১১১: আজ থেকে তিন বছর আগে আমার এক বাচ্চা প্রসবের কিছুক্ষণ আগে পেটের মধ্যেই মারা যায়। আমার হাজব্যান্ড এই বাবুটার একটা নাম মনে মনে ভেবেছিলেন, ও যদি সহীহ্ সালামতে দুনিয়ায় আসে, ওর একটা নাম রাখবে, কিন্তু ও তো আগেই মারা গেছে। ছেলে বাবু ছিল। আল্লাহ্র রহমতে আমার আবার সন্তান হয়েছে, ওই বাবুটার নামই ওর আব্বু রেখেছে, এতে কোনো সমস্যা হবে কিনা?

উত্তর: আপনার পরবর্তী সন্তানের জন্য আগের মৃত সন্তানের নাম রাখতে কোনো দোষ নেই। সাহাবাদের যুগে মুসলিমদের ভেতরে একই ব্যক্তির দুই সন্তানের একই নাম রেখেছেন। পিতা-দাদা-

বাবার নাম এক, শতশত। আরব দেশের নিয়মই হল, পিতার নামে সন্তানের নাম রাখা। চাচাতো দুই ভাইয়ের একই নাম আছে। পিতার নামে পরিচয় হয়। কাজেই আপনার ছেলের জন্য যে নামের নিয়ত করেছিলেন, ওই নাম নতুন সন্তানের জন্য রাখতে কোনো দোষ নেই। ভালো নাম হলে আমরা দুআ করি। আল্লাহ তাআলা আপনার মৃত সন্তানকে কবুল করে নিন। আপনার নতুন সন্তানকেও আল্লাহ সুস্থ রাখুন। বরকত দিন, কবুল করে নিন।

ইলম/উলামা

প্রশ্ন-১১২: আমার একটা ছেলে পাঁচ বছরের, আমি ওকে হিফযখানায় ভর্তি করতে চাই। ওর বয়সটা ঠিক আছে কিনা? মা-বাবা হিশেবে আমাদের কী করণীয়, আল্লাহ্ যেন ওকে কবুল করে নেয়? এগুলো একটু বুঝায়ে বলবেন।

উত্তরঃ আপনার প্রশ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। হয়তো আপনারা মনে করতে পারেন, আমরা মোল্লা মানুষ, কাজেই ছেলেকে হাফিয করবেন এজন্য আমাদের ভালো লাগছে। আসলে জীবনটাকে উপলব্ধি করতে হবে। আমরা সন্তানদেরকে যেভাবে ভালোবাসি, শিশু-কিশোর-সন্তানকে হৃদয় দিয়ে, আমাদের জীবন দিয়ে তাদেরকে আগলে রাখি। কিন্তু এই সন্তান যখন বড় হয়, আমি আমার জীবনে এবং আপনারা অনেকে অনেকভাবে জানেন। আমরা যেহেতু আলিম বলে পরিচিত, আমাদের কাছে অনেক ব্যাথা-বেদনা নিয়ে আসেন, জীবনটা তখন অন্যরকম হয়ে যায়। এই সন্তানেরাই অনেক সময় আমাদের জন্য অনেক ব্যাথা-বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এই দুনিয়াতেই। আর এজন্যই ইসলাম সন্তানদেরকে লালনপালন করার ক্ষেত্রে কিছু মূলনীতি দিয়েছে। আমরা এগুলো পালন করলে দুনিয়াতে তো পাবই, আখিরাতেও পাব। আমাদের সন্তানদেরকে অবশ্যই দীন শেখাতে হবে। এবং আমাদের মূল চেতনা হবে, আমাদের সফলতার মাপকাঠি কী? আমরা অনেক সময়, কোনো ছেলে গোল্ডেন এ-প্লাস পেয়েছে বা ইত্যাদি পেয়েছে, আমরা মহাখুশি হই! কিন্তু আমরা সবাই জানি, গোল্ডেন এ-প্লাস পাওয়া ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরা কেউ মহাদুর্নীতিবাজ, কেউ মহাসন্ত্রাসী, কেউ মহাঅন্যায়-অপরাধে লিপ্ত। এবং অধিকাংশই পিতামাতাকে শান্তি দিতে জানেন না। অবশ্যই তারা গোল্ডেন এ

প্লাস পাবে, ভালো রেজাল্ট করবে, ভালো চাকরি পাবে, এটা আমরা কামনা করি। পাশাপাশি সন্তানেরা যেন মানুষ হয়, তারা যেন অন্তত আল্লাহকে চেনে। আল্লাহকে চিনলে আখিরাত চিনবে, আখিরাত চিনলে নৈতিকতা ভালো হবে, পিতামাতাকে চেনবে, ভালো মানুষ হবে। আর এজন্য বিভিন্ন পথ রয়েছে। আমাদের সন্তানেরা কুরআনের হাফিয হবেন, কুরআন বুঝতে শিখবেন, এটা অত্যন্ত বড় পাওয়া। আমি জানি, হাজার হাজার কুরআনের হাফিয রয়েছেন, আলিম রয়েছেন; যারা মাদরাসা থেকে দাখিল-আলিম পাশ করে বর্তমানে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পড়ছেন। অনেকে অধ্যাপক হয়ে গেছেন, বিভিন্ন স্পেশালিস্ট হয়ে গেছেন। আপনার ছেলের হাফিয হওয়া বা আলিম হওয়া, এটা ভবিষ্যত জীবনের উন্নতির জন্য কোনো অন্তরায় নয়। কিন্তু ওই হাফিয এবং আলিম ছেলে যখন যে কোনো কর্মেই থাক, ওই ছেলে আপনাকে চেনবে, আল্লাহকে চেনবে, সৎ থাকবে। দুনিয়ায় তার থেকে আপনি শান্তি পাবেন। আখিরাতে ইনশাআল্লাহ, ওই ছেলের সাথেই জান্নাতে যাবেন। তবে বোন, এখানে কয়েকটা বিষয় বলতে হবে, যেহেতু আপনি পরামর্শ চেয়েছেন। হিফয করার জন্য, আল্লাহর কুরআন একটা মিরাকল, আমরা জানি। অলৌকিক মু'জিযা। অনেক সময় অনেকেই হয়তো বলেন, কুরআনের মতো বই হয়তো লিখে ফেলা যায়, অথবা হতেও পারে। আসলে এটা খুব সিম্পল ব্যাপার। কুরআনের মতো বই আপনি লিখে দেন, আপনি যে ভাষায় চান, আর সেই ভাষা বোঝে না, এমন একজন মানুষকে দেন, পঞ্চাশ বছরেও এটা কেউ মুখস্থ করবে? পারবে না। বাঙলাভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভালোবাসেন এমন অগণিত সাহিত্যিক আছেন। তার *গীতাঞ্জলি* একটা যুগোত্তীর্ণ-কালোত্তীর্ণ কাব্যগ্রন্থ। এই ছোট্ট কাব্যগ্রন্থটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ রেখেছেন এমন কোনো সাহিত্যিক আপনি পাবেন না। কিন্তু আল্লাহর কুরআন ছয়শ পৃষ্ঠার বিশাল গ্রন্থ। এটা মুখস্থ রেখেছে এমন নয় বছরের বালক-বালিকা

আপনারা অনেক পাবেন। যারা মাতৃভাষায় কথা বলতে আটকে যায়, কিন্তু যখন কুরআন পড়ে তখন মনে হয় হারাম শরীফের ইমাম সাহেব কুরআন তিলাওয়াত করছে। এটা একটা জীবন্ত মিরাকল। কুরআন তো অলৌকিক। এজন্য সন্তানদেরকে হাফিয করা খুবই সিম্পল। আপনার সন্তানকে দুই থেকে তিন বছরে কুরআন হিফয করান। এজন্য আমাদের উচিত হবে, প্রথম কথা, সন্তানকে অন্তত থ্রি পর্যন্ত পড়ানো। এবং থ্রি পর্যন্ত পড়ানোর ফাঁকে একটু আরবি পড়ানো। এটা দরকার। এরপর থ্রি পাশ করার পরে, যখন সন্তানের বয়স নয়-দশ হয়ে যাবে, অন্তত সে চব্বিশঘণ্টা একটা রুটিনে থাকার মতো অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তাকে একটা ভালো হিফযখানায় দেবেন। আমাদের সমাজের অনেক মা-বাবা আলিমদের কথায় প্রভাবিত হয়ে, মনের ভালো আবেগে, সন্তানকে হিফযখানায় দিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, আমার দায়িত্ব শেষ। আসলে বোন, এখানেই শেষ হয় না। আমরা আলিমরা অনেক সময় দায়িত্বে অবহেলা করি। হিফযখানার মান কেমন, পড়া কেমন, শুধু আপনার মনের আবেগ আর হিফযখানায় দেওয়া নয়, সন্তানকে প্রতিনিয়ত আপনার সবচে' মূল্যবান টাকা যখন গুণে রাখেন, গুছিয়ে রাখেন– আপনার সন্তানকে প্রতিদিন গিয়ে দেখতে হবে, কী পড়ছে, প্রতিষ্ঠানের মান কেমন? এবং আল্লাহর কাছে সবসময় দুআ করতে হবে। আল্লাহ্ আমাকে আলিমের পিতা, আলিমের মাতা হাফিযের পিতা, হাফিযের মাতা করো। তাহলে প্রথম কথা, আপনার সন্তানকে থ্রি-ফোর পর্যন্ত, অন্তত থ্রি পর্যন্ত পড়ান। কোনো ভালো মাদরাসা হলে ভালো হয়। থ্রির পরে তাকে কোনো ভালো হিফযখানায় দেবেন, একটু পয়সা খরচ হলেও। মানসম্মত পড়ায় অনেক প্রতিষ্ঠান ঢাকায় আছে, অন্যান্য জায়গায় আছে। প্রয়োজনে আপনারা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তৃতীয়ত, হিফযখানায় আপনার ছেলেমেয়েদেরকে ফলোআপ করবেন যে, কেমন পড়ছে। যদি আপনার ছেলে দুই থেকে তিন

বছরে হিফয করতে না পারে, তাকে জোর দেবেন না। তাহলে বুঝতে হবে, তার জন্য পূর্ণ হিফয সম্ভব না। তাকে দুই বা তিন বছরের মধ্যেই দ্রুত হিফয করিয়ে তাকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দেওয়ায়ে দেন। তাতে সে তার বন্ধুদের চেয়ে বড়জোর এক থেকে দুই বছরের কম বেশি হবে, কিন্তু সে হাফিযে কুরআন হয়ে যাবে। আপনার সন্তানকে হাফিয করার পাশাপাশি কুরআন বোঝার যোগ্যতা তৈরি করতে হবে। কী জন্য? আপনার সন্তানের স্বার্থে। আমরা যদি মনে করি, এই আমাদের সরকার নিয়ম করে দেবেন যে, বাংলাদেশের আকাশ বাতাসে বার্ড ফ্লু বা সোয়াইন ফ্লু ঢুকবে না—এটা অবাস্তব চিন্তা, ঢোকবেই। ঠিক আমরা যদি মনে করি, আমাদের আকাশ দিয়ে কোনো অপসংস্কৃতি ঢোকবে না, এটা অকল্পনীয়। তাহলে আমাদের বাঁচার উপায় কী? টিকা নিতে হবে, প্রতিরোধক নিতে হবে। এই বর্তমান বিশ্বে আকাশ সংস্কৃতিতে অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, হিংস্রতা, ভায়োলেন্স, এ থেকে আপনার সন্তানকে বাঁচাতে কুরআনের টিকা দিতে হবে। আপনার সন্তান যদি একটু কুরআন বুঝতে পারে, এজন্য যাকে হাফিয করবেন, তাকে অবশ্যই চেষ্টা করবেন অন্তত কিছু ক্লাস মাদরাসায় পড়াতে। ফাইভ সমাপনী দিয়ে ক্লাস এইট পর্যন্ত সে মাদরাসায় পড়ল, যদি আপনার ঈমান-ইয়াকীনে জোর পায় তাহলে তাকে আলিম বানানোর চেষ্টা করবেন। আমার বিশ্বাস-ইয়াকীন অনুযায়ী, আলিম হওয়ার চেয়ে বড় সফলতা নেই। আপনারা জানেন, ডা. জাকির নায়েক অনেক পরিচিত ব্যক্তিত্ব, ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন, তিনি যদি একজন ডাক্তার হতেন, তাহলে ডাক্তারই হতেন। তিনি তার ডাক্তারি পেশা বাদ দিয়ে দীনের লাইনে এসে যতোটুকু অর্জন করেছেন, আপনি জানেন লক্ষ ডাক্তারের চে' তিনি বেশি সমৃদ্ধি সফলতা দুনিয়াতে পেয়েছেন। আমরা আশা করি, আল্লাহ তাঁকে কবুল করবেন। যদি আপনার সেরকম ইয়াকীন হয় যে, তাকে আলিম করব, না হলে অন্তত এইট পর্যন্ত তাকে কুরআন বোঝার মতো

ন্যূনতম যোগ্যতা তৈরি করে, এরপর আপনি তাকে বিভিন্ন দিকে দিতে পারেন। এইভাবে সন্তানদের যদি আমরা কুরআন শেখাতে পারি, কুরআন মুখস্থ করাতে পারি, তাহলে আমরা আশা করি, আমার সন্তান ভালো মানুষ হবে, তার মেধা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে যাবে। তবে সবক্ষেত্রে সে ভালো মুসলিম থাকবে। আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন।

প্রশ্ন-১১৩: ص যের 'সুই' না অন্য কিছু হয়? ط যের 'তুই' না অন্য কিছু হয়?

উত্তর: আসলে আরবি বর্ণগুলোর উচ্চারণ, এটা আমাদেরকে প্র্যাকটিস করে জানতে হবে। সোয়াদ যের সি, কিন্তু এটা বলার জন্য আপনাকে অভ্যাস করতে হবে। যেহেতু এই বর্ণ বা ধ্বনি আমাদের বাঙলায় নেই। আমাদের ব্রেনের কোষগুলো বাঙলা ধ্বনি দিয়ে পূর্ণ হয়ে আছে। মাতৃভাষার ধ্বনি। অতিরিক্তটা আনতে গেলেই আমাদের কষ্ট হচ্ছে। আমরা যখন শুনি, বাঙলার কাছাকাছি ধ্বনির কাছে আমাদের ব্রেনটা চলে যায়। তোয়া যের তি, তি... কেউ হয়তো তুইয়ি বা কাছাকাছি কিছু বলবেন। এটা একজন ভালো অভিজ্ঞ ক্বারির কাছ থেকে অভ্যাস করে নেবেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। আল্লাহ কবুল করবেন, ইনশাআল্লাহ। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই, সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হয়।

প্রশ্ন-১১৪: হাফিযদেরকে অনেক সময় সম্মান করা হয় না, (যারা সম্মান করেন না) তাদের সাথে কথা বলা যাবে কি যাবে না?

উত্তর: যেহেতু আলিম-হাফিযরা আল্লাহর সবচে' প্রিয় ওহির ইলম বহন করেন। তারা যতো ছোটই হোক, তারা যা বহন করছেন তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আপনার কাছে কেউ যদি প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে আসেন, হয়তো সে প্রধানমন্ত্রীর খুব

নিম্নমানের পিয়ন, কিন্তু আপনার কাছে যার চিঠি নিয়ে আসছেন, তার জন্য পিয়নকে খুব আপ্যায়ন করবেন, এতে সন্দেহ নেই। এজন্য যারা আল্লাহর ওহির ইলম বহন করেন, তাদেরকে সম্মান করা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। তবে কেউ যদি সম্মান না করেন, এজন্য আপনি সম্পর্ক রাখবেন না, ব্যাপারটা এমন নয়। সে যদি সরাসরি কুরআন-হাদীসের 'ইহানত' (অসম্মান) করে, তবে সেটা কুফর। তবে এমনি যদি আলিমদের বিরুদ্ধে কথা বলেন বা আলিমদের প্রতি কটাক্ষ করেন– এটা অন্যায়, গুনাহের কাজ। তবে এজন্য সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না। তাকে বোঝাবেন এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখবেন।

<u>প্রশ্ন-১১৫:</u> আমি মাওলানা আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের *এহইয়াউস সুনান* পড়ে খুবই উদ্বুদ্ধ হয়েছি, সত্য এবং সঠিক পথ পেয়েছি। সূরা বাকারার ৪১ নং আয়াতে এবং ১৭৩ নং আয়াত, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, আমরা, ইমামতি মুআযযিন কুরআন খতম তারাবীর নামায মিলাদ বিভিন্ন ধরনের কুরআন পড়ে যে পয়সা নেওয়া হয়। বাংলাদেশের একজন নামকরা মাওলানা বলেছেন, পয়সা নেওয়া জায়িয আছে। সাহাবি তাবিয়িদের যুগে এইরকম পয়সা নেওয়া কোনো রেওয়াজ ছিল না। কতোদিন আগে থেকে এটা জায়িয করা হয়েছে? কুরআন-হাদীসের দলীল দেবেন। সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা হচ্ছে এটা নিয়ে।

<u>উত্তর:</u> প্রথমেই ভাইকে ধন্যবাদ দিই, আমার বই পড়ার জন্য। *এহইয়াউস সুনান*। আপনারা দুআ করবেন যদি উপকৃত হন, ভুলভ্রান্তি থাকলে বলবেন। দ্বিতীয়ত, ভাই যেহেতু পড়ুয়া মানুষ, আমি আবারো বলব, আয়াত দুটি যদি আপনি পড়েন। কুরআনে যেখানে যেখানে, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا : সব ইহুদিদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। তারা কিন্তু ইমামতি করে পয়সা নিত না। তাদের

ইমামতির কোনো সিস্টেম ছিল না। আল্লাহ তাআলা এই আয়াত বলেছেন রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারকদের ক্ষেত্রে। আল্লাহর আয়াত অল্প পয়সায় বিক্রির অর্থ কিন্তু কুরআন পড়ে বা শিখিয়ে পয়সা নেওয়া না-নেওয়ার ব্যাপার নয়, এটা অন্য মাসআলা। আমার আয়াতকে অল্প পয়সার বিনিময়ে বিক্রি কোরো না, এটার অর্থ হল, দুনিয়ার কোনো স্বার্থে আমার কোনো বিধানকে পরিবর্তিত কোরো না। আমার কোনো বিধানকে উল্টে দিয়ো না। বিচার ছিল এইটা, লোক দেখে পারশিয়ালিটি কোরো না, গরীব দেখে বেশি কোরো না, সরকারের চোখ রাঙানি দেখে উল্টে দিয়ো না। দুনিয়ার স্বার্থে আমার কোনো বিধানকে উল্টায়ো না– এটা ওই আয়াতের অর্থ। এখন প্রশ্ন হল, আমরা ইমামতি করে ইত্যাদিতে পয়সা নিতে পারব কিনা? এখানে মূলনীতি হল, যে কাজটা আমার উপরে ফরয নয়, অন্য লোকের দায়িত্ব, আমি যদি তাকে সহযোগিতা করি, আমি সার্ভিস মূল্য নিতে পারব; আর যে কাজ আমার ফরয দায়িত্ব, এই কাজের বিনিময়ে আমি কারো কাছ থেকে পয়সা নিতে পারব না। আর যে কাজ আমারো দায়িত্ব না, তারও দায়িত্ব না, এজন্য তো পয়সা নিতেই পারব না। খতম শরীফ, গোসল শরীফ ইত্যাদি না আমার, না আপনার দায়িত্ব। আপনি বিপদে পড়েছেন, আপনি দুআ করবেন, আপনি দুআ ইউনুস পড়ে দুআ করবেন; এগুলো কোনোটাই শরীআত নির্দেশিত কোনো কাজ নয়। এক্ষেত্রে পয়সার কোনো সুযোগ নেই। এগুলো, আমরা একটা পুরোহিততন্ত্র বানিয়েছি। একজন বিপদে পড়েছে, সে দুআ করবে; কিন্তু আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় দুআ করার জন্য। আমরা বিভিন্ন খতম করে পয়সা নিই। বরং আমাদের দায়িত্ব ছিল, তাকে দুআ করার পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া। আরেকটা হল, শরীআত নির্দেশিত দায়িত্ব। আবু বাকর রা., উমার রা., সহীহ বুখারিতে এসেছে, রাষ্ট্রীয় সামাজিক দায়িত্ব, নামায পড়া আমার দায়িত্ব। ইমামতি আমার দায়িত্ব না, রাষ্ট্রের দায়িত্ব সমাজের দায়িত্ব, বিচার ইমামতি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করা, মন্ত্রীর

দায়িত্ব পালন করা, কুরআন শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষকতা করা, মানুষকে মাসআলা শেখানো এইসব দায়িত্ব পালন যারা করেন, তারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বেতন নেবেন, এটা আবু বাকর-উমারের সময় ছিল। এগুলো রাষ্ট্র দেবে। রাষ্ট্র যেহেতু দিচ্ছে না, সমাজ রাষ্ট্রের বদলে দিতে পারেন, এটা গ্রহণ করা বৈধ। তবে যিনি কাজ করবেন তার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর দীনের খেদমত করা, এর উপরে সাওয়াব নির্ভর করবে। তবে টাকা নেওয়া এইসব ক্ষেত্রে অবৈধ নয়।

প্রশ্ন-১১৬: আমাদের দেশে আলিম-উলামারা যেসব ওয়ায করে টাকা পয়সার বিনিময়ে, এই জিনিসটা যারা তাবলীগ জামাআতের সাথে জড়িত, ইনারা খুব একটা পছন্দ করেন না। আমার সাথে অনেকের পরিচয় আছে ব্যক্তিগতভাবে, এটা বলছি, আমি দেখেছি তারা পছন্দ করেন না। এই ব্যাপারে শরীআতের বিধান কী?

উত্তর: আমাদের সমাজে এই একটা প্রশ্ন... অনেক আগে, সৌদি আরবে থাকতে... সৌদি আরবে *Arab News* নামে একটা ইংরেজি পত্রিকা আছে, এটার প্রতি সোম এবং শুক্রবারে *Islam in Perspective* এই নামে একটা বড় পাতা ছিল। এটাতে ইসলামিক বিষয়ে অনেক প্রশ্নোত্তর হত। ওই সময় বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়ান এক্সপার্ট্রিয়েট সৌদি আরবে অবস্থান করেন। তাদের কাছে *Arab News* পত্রিকাটা খুব জনপ্রিয় ছিল, ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকে। কারণ ওই সময় টিভি চ্যানেল ছিল না। অনেকেই প্রশ্ন করতেন। আমি নিয়মিতই পড়তাম। একভাই আমাদের সাবকন্টিনেন্টেরই (উপমহাদেশের), প্রশ্ন করেছেন, ওয়ায করে টাকা নেওয়া যাবে কিনা? সৌদির বড় আলিম, যিনি ইংরেজি (ভাষা) ও ইসলামি জ্ঞানে বড় আলিম, উনি বলছেন, অদ্ভুত ব্যাপার! এই প্রশ্নটা আমরা যারা শিক্ষকতা করি, পয়সা নিই; বই লেখি, পয়সা নিই; ওকালতি করি, পয়সা নিই...;

বই যখন লেখব, রয়্যালিটি নেব, জায়িয হবে না? এই চিন্তাটা আসল কেন? আল্লাহর জন্য কাজ করলে পয়সা নেওয়া যাবে না, আর পয়সা নেওয়ার সাথে ইখলাসের contradiction (বৈপরীত্য) আছে, এই চিন্তা কেন আসল? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সময়ে, সাহাবিদের সময়ে... যারা দ্বীনের এবং জাতির... । একটা হল দীন, আমার নিজের পালনীয় দীন, আমি নামায পড়ে কাউকে বলতে পারি না যে, নামায পড়ি পয়সা দাও। আরেকটা হল, সমাজ রাষ্ট্র অন্যান্য মানুষের প্রতি– সমাজে ওয়ায়েয রেখে দেওয়া, যারা দীনের শিক্ষা প্রচার করবেন। স্কুল প্রতিষ্ঠান চালানো, এটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এটা যদি কেউ করে রাষ্ট্রে পয়সা দেবে, না হলে সমাজ দেবে, না হলে কোনো ব্যক্তি দেবে। যে দায়িত্ব আমার নিজের উপর ফরয নয়, কুরআন শেখা আমার দায়িত্ব। আপনাকে কুরআন শেখানো আমার জন্য ফরয নয়। আপনি কুরআন শিখবেন, আমাকে বললেন, কুরআন শিখিয়ে দেন। আমি যদি নিজের খরচে নিজে বাড়ি গিয়ে শেখাই, আলহামদুলিল্লাহ! এটাতে বেশি সাওয়াব হবে। কিন্তু আমি যদি বলি, আপনার বাড়িতে গিয়ে কুরআন শেখাব, আপনার ছেলেমেয়েকে কুরআন শেখাব, আমাকে এতো টাকা দিতে হবে। আমার তো সময় নষ্ট হবে, সময়ের মূল্য দিতে হবে। তো আপনার ছেলেমেয়েকে কুরআন শেখাব, আমাকে এতো টাকা দিতে হবে। আমার তো সময় নষ্ট হবে, সময়ের মূল্য দিতে হবে– তাহলে এটা আমার জন্য অবৈধ নয়। আমি যদি চিন্তা করি, আমি এই সময়টা ব্যবসা করতাম, অথবা অন্য পেশায় যেতাম, তারচে' একটা মানুষকে কুরআন শেখাই, রুজিও হল, কুরআনের প্রসারও হল। আমার ইখলাস এবং সাওয়াব আমি পাব। রাসূল (ﷺ) কুরআন শেখানোর বিনিময়ে বিবাহ করতে বলেছেন। স্ত্রীর মোহর শোধ হবে কুরআন শেখানোর বিনিময়ে। কাজেই কুরআন শেখানোর বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না, (এমন

নয়)। কোনো ব্যক্তিকে শরীআতসম্মত কোনো বিষয়ে সহযোগিতা করা হয়, এজন্য আমি পারিশ্রমিক চাইতে পারি, কোনো গুনাহ হবে না, বিনা পারিশ্রমিকে করলে বেশি সাওয়াব হতে পারে। (টাকা নিয়ে) ওয়ায বা ধর্মীয় মাসআলা-মাসায়িল দেওয়া যাবে না, ইমামতি করা যাবে না, মসজিদে খুতবা দেওয়া যাবে না, খতীবই তো ওয়ায করেন, মাদরাসায় শিক্ষকতা করা যাবে না– এগুলো প্রকারান্তরে বন্ধ এবং অচল করার চিন্তা। তাহলে একজন মানুষ এইসব পেশা না করে কোথায় যাবে? আর ইসলাম কীভাবে টিকে থাকবে? তবে যদি কেউ নিজের খরচে কিছু কাজ করেন, আবার বেতন না নিয়ে কিছু করেন, এটা ভালো।

<u>বিবাহ/তালাক</u>

<u>প্রশ্ন-১১৭:</u> স্বামী স্ত্রী কি একজন আরেকজনের শরীরের অংশ দিয়ে তৈরি?

<u>**উত্তর:**</u> এটা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, প্রথম পুরুষের জন্য প্রথম নারী...

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا[১]

এছাড়া আমরা সবাই একজন আরেকজন থেকে তৈরি, এমন কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট কোনো কথা নেই।

<u>প্রশ্ন-১১৮:</u> আমার একটা চাচাতো বোন, তার পরিচিত একজন মামার সাথে রিলেশন আছে। মামা বলতে প্রতিবেশী একজন মামা, আপনও না চাচাতোও না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কাদের সাথে বিয়ে করা না-জায়িয?

<u>**উত্তর:**</u> এই রিলেশনগুলো সবই হারাম। অর্থাৎ বিবাহের আগে, কোনো পুরুষকে দেখে ভালো লাগা এটা মূলত মনের অনুভূতি, এটা পাপ নয়। কিন্তু ভালো লাগার ভিত্তিতে তার সাথে কথাবার্তা বলা, এটা সম্পূর্ণ হারাম। এর মাধ্যমে আমরা দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্থ হই। এটার অগণিত উদাহরণ রয়েছে। যদিও সিনেমাতে দেখা যায় যে, শেষে সব 'লাভ' হয়ে যায়। বাস্তব জীবনে এই লাভ খুব কমই হয়। আপন মামা, আপন চাচা, আপন ভাই, আপন ভাতিজা, আপন ভাগিনা, শ্বশুর, জামাই, আপন দুধভাই, বাবার উপরে যতো উঠবে, ভায়ের সন্তান, তার সন্তান, বোনের সন্তান, তার সন্তান, এগুলো উপরে নিচে যাবে। রক্ত সম্পর্কের আপন এবং সতালো বোন। মামা হিশেবে যদি আপন মামা হয়, চাচাতো

---

[১] সূরা: নিসা, আয়াত: ১

মামা বা অন্য কেউ হয়, আপন বলতে আপন বা সতালো, মায়ের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, মায়ের আপন বা সতালো ভাই, তিনি মামা। তাকে বিবাহ করা যাবে না। (উপস্থাপক: আরেকটি বিষয় হল যে, বিশেষ করে যারা মুশরিক...) এটাতো আরেকটা ব্যাপার। কোনো মানুষ কল্পনায় করে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও কোনো অমুসলিমকে কোনো মুসলিম বিয়ে করতে পারবে না। এই বিবাহ শরীআতে বিবাহ বলে গণ্য হবে না।

<u>প্রশ্ন-১১৯:</u> আমার মা-বাবা একটা মেয়ে দেখেছে। আমার মা-বাবা এবং মেয়ের মা-বাবা সম্মত হয়েছে বিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি এখন সৌদি আরব থেকে টেলিফোনে বিয়ে করলে জায়িয হবে? মেয়ের মা-বাবা বলেছে, টেলিফোনে বিয়ে করা জায়িয নেই। কোনো হাদীসে নেই, কুরআনে নেই। ছেলে দেশে আসুক, এখন আমরা আঙটি পরিয়ে রাখি, পরে বিয়ে করা যাবে...

<u>উত্তর:</u> টেলিফোনে বিবাহটা হয় না। ইজাব-কবুলের একজন সাক্ষী থাকতে হয়। আপনি ওখানে বলছেন টেলিফোনে; ওখানে কে বলল...? ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে না। আবার যারা আপনাকে দেখছেন তারা এখানে দেখছেন না। ইজাব-কবুলের মাজলিস দুটো দেখা এবং শোনা একই ব্যক্তি করবে, এটাই হল নিয়ম। আর আপনি নিজেও মেয়ে দেখেন নি। বিবাহের এটা সুন্নাহ না! বিবাহে ছেলে নিজে মেয়ে দেখবে, মেয়ের সাথে কথা বলবে, তার একটা understanding– বিয়ে হবে কিনা। যদি আপনি খুব ব্যস্ত হন তাহলে ওকালতের মাধ্যমে বিয়ে করতে পারেন। আপনি ওখান থেকে আপনার আব্বাকে ওকালত দেবেন, পাওয়ার অব এটর্নি দেবেন, আপনি সাক্ষীসহ 'আমার বাবাকে আমার পক্ষ থেকে অমুক মেয়েকে বিয়ে করার জন্য authorize করলাম'। যেমন মেয়ে তার আব্বাকে authorize করে। উনি এসে বলেন যে, আমার মেয়ে...। ঠিক ওরকম, ছেলের বাবা বলবে,

'আমি আমার মুআক্কিলকে বিবাহ দিলাম'। এটা সম্ভব। এটা শরীআতসম্মত হবে। আর সবচে' ভালো হয়, আপনি আসার পর মেয়েকে দেখেন, এরপরে বিবাহ করেন, আগে কথা হয়ে থাক। এখানে সুন্নাহ পূর্ণ হবে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবার উৎসাহ দিয়েছেন, বিবাহের আগে পাত্র পাত্রীকে দেখবে। যথাসম্ভব ন্যাচারেলি দেখবে, কথা বলবে।

<u>প্রশ্ন-১২০:</u> কাতার থেকে আমার এক বন্ধু টেলিফোনে (বাংলাদেশে) বিয়ে করেছে। মা-বাবা মেয়ে দেখেছে, ছেলেমেয়ে ফটো দেখেছে। এভাবে বিয়ে হবে কিনা?

<u>উত্তর:</u> বিবাহের জন্য ইসলামের যে মূল শর্ত, ইজাব-কবুল সাক্ষীর সামনে হতে হয়। টেলিফোনের বিবাহে, যে সাক্ষী কবুল বলতে শোনে, সে কিন্তু ইজাবকারীকে দেখে না। অর্থাৎ ছেলের কথা ফোনে শোনে, লোকটা কে, দেখতে পারছে না। আবার যারা পাত্রের মুখের উচ্চারণটা দেখছে, তারা পাত্রীর মুখের উচ্চারণ দেখতে পারছে না! এজন্য প্রায় সকল আলিমই বলছেন যে, এইভাবে বিবাহ বৈধ নয়। বিবাহের সাক্ষী সাক্ষ্য দেবে আমি ইজাবও দেখেছি, কবুলও দেখেছি। কিন্তু একজন দেখছে এটা আরেকজন দেখছে ওটা। এজন্য এক্ষেত্রে শরীআতসম্মত পদ্ধতি হল– পাত্রপাত্রী পছন্দের পরে পাত্র তার পিতাকে বা তার ভাইকে ওকালত দেবে, authorization দেবে। মেয়ে তার বাবাকে উকিল বানাবে, ইজাব কবুলের জন্য। ছেলেও তার বাপ বা ভাইকে উকিল বানাবে। দুজন তিনজন সাক্ষীর সামনে তার পিতাকে ওকালত দেবে, যে আমি আমার আব্বাকে ওকালত দিলাম অমুক মেয়েকে আমার পক্ষ থেকে বিবাহ করে নেবে। মেয়ের উকিল ছেলের উকিল ইজাব-কবুলের বন্ধন ঠিক করে দেবেন। তাহলে বিবাহটা শরীআতসম্মত ষোলোআনা বৈধ হবে। এটাই উত্তম হবে।

<u>প্রশ্ন-১২১:</u> আমরা তিনবছর আগে বিয়ে করেছি। বিয়েটা করেছি

কোর্টের মাধ্যমে। সেখান থেকে আমরা বিয়ে করার পরে, হুযুরদের দিয়ে যে সামাজিক কালচার সেটা করা হয় নি। কাযি সাহেবকে দিয়েও কিছু করা হয় নি। আমাদের বিয়ে ঠিক আছে কিনা? আমাদের একটা ছেলে আছে দুই বছর বয়সের।

উত্তর: ইসলামে পুরোহিততন্ত্র নেই! ইসলামে সামাজিক বিধিবিধান আছে, রাষ্ট্রীয়...। বিবাহের ক্ষেত্রে আপনার হুযুর ডাকতেই হবে, এটা কিন্তু ইসলামি শরীআতের বাধ্যতামূলক বিষয় নয়। বিবাহে দুইজন সাক্ষীর সামনে বিবাহ হবে এবং ঘোষণা হতে হবে। এই ঘোষণা, যদি কোর্টের মাধ্যমে দুইজন সাক্ষীকে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ঘোষণা দেন, সেটাতেও বিবাহ হবে। তবে বিবাহের কন্ডিশন হচ্ছে যে, দুইজন সাক্ষী লাগবে, নারীর ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের সম্মতি লাগবে। কাজেই আপনারা যদি বিয়ের precondition (পূর্বশর্ত) পূরণ করে থাকেন, হুযুর ডেকে কিংবা কাযি ডেকে বিবাহ করা জরুরি না। কাযি অফিস, বিবাহটাকে সহজ করার জন্য আমাদের দেশীয় আইন করা হয়েছে, যেন সহজে আমরা আইনগত প্রক্রিয়ায় বিবাহটা সম্পন্ন করতে পারি। কাজেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেলেও হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-১২২: জমজ বোনকে বিয়ে করা জায়িয কিনা?

উত্তর: বাংলাদেশের মুসলিম, আমাদের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এমন একটা পর্যায়ে গিয়েছে...! দু বোনকে বিবাহ করা কঠিনতম হারাম! দু বোনকে একত্রে...

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

জমজ হোক বা জমজ না হোক...।[২] দুই বোন, জমজ, সতালো,

[২] সূরা: নিসা, আয়াত: ২৩

আপন, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় যে কোনো প্রকারের দুই বোন, পিতা এক অথবা মাতা এক, অথবা পিতামাতা উভয়ই এক, তাদেরকে বিবাহ করা কঠিনতম হারাম। যদি কেউ এক বোনকে বিবাহ করে, সে অবস্থায় দ্বিতীয় বোনকে বিবাহ করলে দ্বিতীয় বিয়েটা সম্পূর্ণ অবৈধ কঠিনতম অপরাধ। যারা এই বিবাহে শরীক হবেন, ঈমান নষ্ট হওয়ার প্রচণ্ড ভয় রয়েছে। যদি কেউ না জানে, সেটা অন্য কথা। প্রথম বিবাহ ঠিক থাকবে। যদি কেউ করেন আমরা সামাজিক ভাবে সবাই এটাকে প্রতিরোধ করব। দুইবোন একত্রে কোনো ভাবেই স্ত্রী থাকতে পারে না। আমাদের দেশের মানুষ অনেক অপরাধ করলেও, এসব ব্যাপারে অনেক সচেতন ছিলেন। আমরা আশা করি, আমাদের সচেতনতা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্ হিফাযত করুন।

প্রশ্ন-১২৩: বর্তমানে বিয়ের সময় ছেলে-মেয়ের ব্লাডটেস্ট করা হয়। এই ব্লাডটেস্ট করা হয় বিভিন্ন কারণে scientific (বৈজ্ঞানিক) দিক থেকে। এটা শরীআতসম্মত কিনা?

উত্তর: এটা শরীআতসম্মত। শরীআত নির্দেশিত সরাসরি নয়। একটা মেয়ে একটা ছেলে বিবাহ করবে; ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে তুমি তাকে দেখো। আগে চোখে দেখলে অনেক কিছু বোঝা যেত। এখন আমরা জানি, বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। বিবাহের পরে ব্লাডগ্রুপের মিল আছে কিনা, তাদের সন্তানের সমস্যা হবে কিনা। বিজ্ঞানের সহায়তা নেওয়া আল্লাহর হুকুম। এজন্য ব্লাডগ্রুপ টেস্ট করা, রোগ-ব্যাধি আছে কিনা (টেস্ট করা যাবে)। এগুলো শরীআতবিরোধী নয়, বরং শরীআতসম্মত। এবং বিভিন্নভাবে শরীআত এটাকে উৎসাহ দেবে।

প্রশ্ন-১২৪: আমাদের এক রিলেটিভ আছে। তাদের যখন ঝগড়া লাগে, তখন উল্লেখ করেন, আমি তোকে এক তালাক দুই তালাক দিলাম– দুই তালাক এই পর্যন্তই বলেছেন। ওরা চার পাঁচবার

ঝগড়া করেছে। এটার ব্যাপারে শরীআত কী বলে?

<u>উত্তর:</u> আপনি খুব সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেছেন। আমাদের সমাজে তালাক একটা সামাজিক ধর্মীয় ব্যাধি! এই ব্যাধির মূল কারণ হল, তালাক দেওয়ার বিষয়ে সুন্নাত পদ্ধতির গুরুত্ব না জানা। আমাদের দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সরকার, বিভিন্ন এনজিও, সমাজসেবকরা তালাক সমস্যার সমাধান চান। কিন্তু সমাধান এমনভাবে চান, যেটা সমাধান হয় নয়। একটা বড় সমাধান হল, কীভাবে তালাক দেবে– এ বিষয়ে কাযিদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং বিবাহের আগে স্বামী-স্ত্রী দম্পতিদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। জানাতে হবে, তালাক শব্দটা উচ্চারণ করলে কী সমস্যা হতে পারে। এবং কীভাবে তালাকটা দিতে হবে। আমার মনে হয়, এটা জানা থাকলে, আমরা এই কঠিন সমস্যা থেকে অনেকাংশে মুক্তি পেতাম। যে বিষয়টা আপনি বলেছেন, তালাক হল ইসলামের একটা নিকৃষ্ট বৈধ বিষয়। এটা ইসলামে বৈধ করা হয়েছে, কারণ আমরা দাম্পত্য জীবন শুরু করি, আশা করি এটা আখিরাত পর্যন্ত...। কুরআনে বারবার বলা হয়েছে, জান্নাতেও স্বামী-স্ত্রী দম্পতি একসাথে থাকবে। তবে ভুল হতে পারে, চয়েসে ভুল হতে পারে, সিদ্ধান্তে ভুল হতে পারে। কাজেই মানুষের জীবনের একটা ভুলকে যেন আজীবন টেনে না নিয়ে বেড়াতে হয় এজন্য আল্লাহ তাআলা তালাক দেওয়ার বৈধতা দিয়েছেন। এই যে বোন জানালেন, আমি তোমাকে এক তালাক দিলাম, দুই তালাক দিলাম, তিন তালাক দিলাম– এই যে মুখে, এটা repeated (বারবার) বলা কঠিনতম হারাম ও কবীরা গুনাহ! তালাক হবে কিনা, পরে বলছি। আমাদের সমাজে তালাক সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় যে বিষয়টা, আমাদের কেউ যখন কোর্টে যায় অথবা কাযির অফিসে যায়; কাযি লেখায়, 'তোমাকে এক দুই তিন তালাক বায়িন দিলাম'! আমাদের দেশের সরকার শুধু একটা আইন করবেন–

কোনো কাযি, কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, কোনো উকিল, কোনো নোটারি পাবলিক যদি এক দুই তিন তালাক একসাথে লেখে, তার এতো টাকা জরিমানা, এতো বছরের জেল হবে। তাহলে আমাদের দেশে তালাক সমস্যা অনেকাংশে কমে যেত। একসাথে এক দুই তিন তালাক দেওয়া কঠিনতম হারাম। যেটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন। তৃতীয় বিষয় হল, একসাথে এক-দুই-তিন তালাক দিলে তালাক হবে কিনা, এ ব্যাপারেও ফুকাহাদের মতভেদ আছে। অধিকাংশ ফকীহ, প্রচলিত চার ইমাম– আবু হানীফা, শাফিয়ি, মালিক, আহমাদ রাহ. এবং (অন্যান্য) অধিকাংশ ফকীহ একমত যে, যদি কেউ বলে 'আমি তোমাকে এক-দুই-তিন তালাক দিলাম' তাহলে তার তিন তালাক হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে 'আমি তোমাকে এক-দুই তালাক দিলাম' তাহলে তার একটা তালাক থাকে। পরবর্তী জীবনে যদি কোনো সময় বলে, আমি তোমাকে আরেক তালাক দিলাম, তাহলে চিরতরে বিবাহটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এর পক্ষে হাদীস রয়েছে, আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থের সহীহ হাদীস। সৌদি আরবের হাইয়াতুল কিবারুল উলামা, আলিমদের সর্বোচ্চ পরিষদ, তারা এই নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে প্রকাশ করেন। তাদের অধিকাংশ আলিমই এই মত দিয়েছেন, তিন তালাকে তিন তালাকই হবে। এর বিপরীতে সহীহ মুসলিমে একটা হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আবু বাকর রা., উমার রা. এর যুগের প্রথমদিকে তিন তালাককে এক তালাক ধরা হত। পরবর্তীতে উমার বলেন, মানুষ যেহেতু একবারেই তালাক দিতে চান, তিন তালাককে তিন তালাক ধরে দিই। এই হাদীসের আলোকে কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন তিন তালাক একবারে দিলে সেটা তিন তালাক বা এক তালাক ধরার অপশন আছে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক– এটাতে হয় তিন তালাকই হয়ে যাবে, চিরতরে বিচ্ছিন্ন হবে; অথবা এক তালাক হবে। দ্বিতীয় যদি তিনি আবার বলেন,

এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বলে, দ্বিতীয় তালাক হয়ে গেল, ন্যূনতম। অর্থাৎ কেউ যদি তার স্ত্রীকে একবার, দুইবার, তিনবার– দুই তালাকও দেয় ওইটা তিন তালাক হয়ে গেল। কারণ প্রত্যেক বারেই এক তালাক ধরা হবে। কাজেই তালাক কোনো খেলার পাত্র নয়, এই যে কিছু হলেই তালাক দিলাম। পরে চলে গেলাম মাওলানা সাহেবদের কাছে, বিবাহ করিয়ে দেন, হিলা করিয়ে দেন। এক্ষেত্রে আলিমদের যেমন অপরাধ রয়েছে। তালাক দেওয়ার অর্থ চিরকাল স্ত্রীকে বর্জন করা– এই কথাগুলো যদি আমরা সমাজের মানুষকে জানাতে পারতাম, তাহলে কেউ তালাক উচ্চারণ করতেন না। আমরা পারিবারিক জীবনে ঝগড়া করব, মারামারি করব, আবার মিল করব– সবই হবে। কিন্তু তালাক দেব কখন, যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব যে, আর জীবনেও এই মহিলার সাথে ঘর করব না বা স্বামীর সাথে ঘর করব না। এই তালাকের গুরুত্ব বোঝাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তালাক দেওয়ার পর আলিমদের কাছে যান, আলিমরা নানাবিধ হিলা-বাহানা করে ফেলেন। আলিমরাও মানুষের কান্না দেখে নরম হয়ে যান। মানুষেরাও আলিমদের নম্রতা দেখে এটাকে দ্বীন (মনে করে)। ব্যাপারটা কিছুটা হাসি-তামাশার মতো বিষয় হয়ে গেছে। এই যে রাগের মাথায় তালাক দেয়, এরও একই কারণ। তালাক দেওয়ার গুরুত্ব, ইসলামি পদ্ধতি আমরা বুঝি না। রাগের মাথায় তালাক, তালাক তো রাগ করেই দেয়। ভালোবেসে কেউ কখনো তালাক দেয় না। যে রাগের মাথায় মানুষ দু-দশ হাজার টাকা ছিড়ে ফেলতে পারে। নিজের সন্তানের মাথায় লাঠি মেরে দিতে পারে। যে রাগ মানুষকে পাগল করে ফেলে, ওই রাগের মাথার তালাক হবে না। যে রাগের মাথায় রেগে বউকে তালাক দিচ্ছি, কিন্তু টাকা দশটা ছিঁড়ব না, এটা আসলে রাগ নয়। আমরা বিবাহ এবং তালাককে একটা খেলার বিষয় বানিয়ে নিয়েছি। আমরা যদি বুঝতাম, তালাক দেওয়ার অর্থ চিরতরে হারাম, আর এই হিলা-বাহানা এগুলো লানত; এর মাধ্যমে কিচ্ছু হয় না, শরীআতে

হারামই থেকে যায়। আলিমরা যদি বলতেন, তালাকের পর ফিরে আসার কোনো ব্যবস্থা নেই। নেই, মানে নেই। এই অবস্থা হলে মানুষ তালাকের গুরুত্ব বুঝত! আর আগেই বলেছি, একবারে তিন-তালাক দেওয়া হারাম, ক্রিমিনাল অপরাধ! এটার শাস্তি দিতে হবে। আর তারপরেও আমরা যদি বলি, একবারে তিন তালাক দিলে এক তালাক হয়, তাহলে প্রতি মাসে তো একবারে তিন তালাক দিচ্ছে; এতো তিনবারে তিন তালাক হয়েই গেল। আসলে এদের ক্রিমিন্যাল শাস্তি দেওয়া উচিত, যারা স্ত্রীকে তালাক দেয়, excuse (অজুহাত) বা cause (কারণ) ছাড়া, বা স্বামীকে তালাক দেয়...। এই সমস্ত স্বামী-স্ত্রীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা, তালাকের গুরুত্ব বোঝানো, এগুলো আমাদের দায়িত্ব।

প্রশ্ন-১২৫: আমি শুনেছি, স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত আড়াইদিন কথা যদি না বলে, তাহলে নাকি তালাক হয়ে যায়। এটা কি সত্যি?

উত্তর: কথা না বললে স্ত্রী তালাক হয় না। ছয়মাস একবছর দুইবছর কথা না বললেও স্ত্রী তালাক হয় না। তবে কথা না বলার কারণে যিনি কথা না বলে রয়েছেন, তিনি একটা কবীরা গুনাহের ভেতরে লিপ্ত রয়েছেন। এবং তিনি আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। স্বামী-স্ত্রী তো অনেক বড় বিষয়। যদি একজন সাধারণ প্রতিবেশীর সাথেও রাগ করে তিনদিন কথা না বলেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার নেক আমল কবুল করা, গুনাহ মাফ করার বিষয়টাকে স্থগিত করে রাখেন, যতোদিন না তারা মিল করে নেয়। এটা স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে আরো কঠিনভাবে প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ তাআলা হিফাযত করুন।

প্রশ্ন-১২৬: আমার হাজব্যান্ডের চরিত্র ভালো না। আমি এটা কখনো নিজের চোখে দেখিনি, কিন্তু সে আমাকে শেয়ার করেছে।

এখন সে ক্ষমা চায় আমার কাছে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। এখন কি ইসলামি দৃষ্টিতে তার সাথে সংসার করা জায়িয আছে?

উত্তরঃ প্রথম কথা, আপনি যেটা বলেছেন, আপনি দেখেননি। পৃথিবীতে আমরা একা থাকতে পারি না। সংসার গঠন করার অর্থ হল, এমন একজন মানুষের সাথে সংসার করতে হয়, যিনি আমি নই। আর আমি যেহেতু নই– কখনো ভালো কখনো মন্দ। আর এজন্যই আমাদেরকে অত্যন্ত সচেতনভাবে সংসারে এগিয়ে যেতে হয়। আপনার স্বামীর চরিত্র ভালো কিনা, এটা আপনি দেখেন নি। আপনার স্বামী স্বীকার করেছেন, ক্ষমা চান। এক্ষেত্রে শরীআতের বিধান হল, প্রথমত, আপনি আপনার স্বামীকে ভালো রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। অবশ্যই সংসার করবেন। কারণ স্বামীর অপরাধের জন্য স্ত্রী কিন্তু পাপী হয় না। কিন্তু স্ত্রীর অপরাধের জন্য স্বামী পাপী হয়। স্বামীকে শাসনের দায়িত্ব আল্লাহ স্ত্রীকে দেন নি। তবে সহযোগিতার দায়িত্ব দিয়েছেন। আর অনেক সময় স্ত্রীদের আচরণের ভুলে স্বামীরা খারাপ হন। কখনো তাদের স্বভাবের কারণে। এজন্য আপনার কাছে তিনি যদি স্বীকার করেন, তাকে আদর করে, ভালোবেসে, স্নেহ দিয়ে, মায়া দিয়ে, মমতা দিয়ে আপনি তাকে কাছে রাখেন। ধর্মীয় পরিবেশে যাওয়ার উৎসাহ দেন, আপনি সাথে করে নিয়ে যান। তার প্রকৃতি পাল্টানোর জন্য আপনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। আর পাশাপাশি আপনি সবর করবেন, ভালো করার চেষ্টা করবেন। স্বামীর অপরাধের জন্য আপনার সংসার বর্জন করার কোনো দায়িত্ব আসে না। কারণ এর পরে অন্য সংসার করলেও অন্য আরেকজন মানুষের কাছেই যেতে হবে। যার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত নন। এজন্য আমাদেরকে 'কিছু ছাড় কিছু ধর' এভাবেই সংসার চালাতে হবে। আল্লাহ হিফাযত করুন।

প্রশ্ন-১২৭: আমি আপনাদের মাধ্যমে শুনেছি, স্ত্রীরা স্বামীকে

ডিভোর্স দিতে পারে না। আমার হাজব্যান্ড সবসময় আমাকে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য পেশার করে। আমি এটা চাই না, আমি ডিভোর্সকে ভয় পাই, ঘৃণা করি। এখন কুরআন হাদীসের আলোকে আমি কী পথ অবলম্বন করতে পারি?

উত্তরঃ দুর্ভাগ্যজনক যে, আমরা জীবনকে বুঝতে পারি না। যে স্বামী স্ত্রীকে চলে যেতে বলেন, তার বুঝতে হবে, ওই স্ত্রীর বদলে আপনার নিঃসঙ্গ জীবন কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। আরেকজন সঙ্গিনী এই স্ত্রীর চেয়ে ভালো হবেন, এটা কখনোই আপনি কল্পনা করেন না। মানুষ আমরা মানুষই! ভুলে এবং ভালোই জড়ানো। প্রতিটি মানুষের ভালো আছে, খারাপ আছে। প্রত্যেক স্বামী প্রত্যেক স্ত্রীকে যদি আমরা না বুঝি, তাহলে জীবনে শুধু কষ্টই পেয়ে যাব। নিজের জীবনে, অন্যের জীবনে কষ্ট দেব, নিজের জীবনকে উপভোগ করতে পারব না। আপনি যেটা শুনেছেন, সেটা বাস্তব। ইসলামে তালাকের অধিকার মূলত স্বামীর। তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা, পাওয়ার, এটর্নি বা অথোরাইজেশন দেন, তাহলে স্ত্রীও তালাক দিতে পারেন। এটা আমাদের কাবিননামায় দেওয়া হয় যে, স্ত্রী যদি চায়, কোনো অসুবিধা হলে, স্বামীকে তালাক দিতে পারবেন। এই ধরনের কথায়, মুখে বা সংলাপে নিজেদের মধ্যে কথার ভেতরে লিখিত কোনো ক্ষমতা (যদি) স্বামী স্ত্রীকে প্রদান করে তাহলে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে। আপনার স্বামী আপনাকে তালাক দিতে বারবার বলছেন, এক্ষেত্রে আমরা আপনাদের পুরো বিষয় আমরা জানি না। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ হল, আপনি স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। স্বামীর পজিটিভ দিকগুলো মনের ভেতরে বেশি এনে তার প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধাবোধ বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। তার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করবেন। আশা করি আল্লাহ আপনাদের দাম্পত্য জীবন সুখের করবেন।

প্রশ্ন-১২৮: স্বামীর শারীরিক সমস্যা থাকলে, সেক্ষেত্রে যদি কোনো স্ত্রী চায় যে, এই স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে চলে যাবে। আর ওই স্বামী এই স্ত্রী চলে যাওয়ার জন্য যদি বদদুআ করে, তাহলে ওই বদদুআ এই স্ত্রীর লাগবে কিনা? এইভাবে তালাক নেওয়া জায়িয কিনা?

উত্তর: অবশ্যই। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের যেটা ভিত্তি, সেটা কোনোভাবেই যদি (চরিতার্থ) করতে না পারেন, অক্ষমতা থাকে; এক্ষেত্রে স্ত্রীর শতভাগ অধিকার রয়েছে স্বামী থেকে তালাক নিয়ে নেওয়ার। বিবাহের আগে যদি স্বামী দোষ গোপনকরে, তাহলে বিবাহ নষ্ট হয়ে যাবে। বিবাহের পরে যদি দোষ প্রকাশ হয়, তাহলে স্বামীকে সময় দিতে হবে সুস্থতা অর্জনের জন্য। তাতে নাহলে স্ত্রী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবেন। তবে স্বামীকে সময় দিতে হবে যেন সুস্থ হতে পারে। এই তালাক নেওয়া তার জন্য বৈধ। আসলে অভিশাপ তো সরাসরি কারো লাগে না। আপনি যার উপরে যুলুম করেছেন সে অভিশাপ দিলে সেটা লাগবে। কারণ সে মাযলুম। আর আপনি নিজের হক বুঝে নিয়েছেন এজন্য কেউ যদি অভিশাপ দেয়, এটা লাগবে না। আপনি শরীআতসম্মত চললে কেউ যদি অভিশাপ দেয়, এজন্য আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

প্রশ্ন-১২৯: আমার বড় বোনকে খুব ছোট বয়সে মা-বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনটা বাচ্চা হওয়ার পরে, ওর জামাইটা খুব বদমেজাজি ছিলেন, বিয়ের সতেরো বছর পর ও একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক করে স্বামীকে ডিভোর্স করে ছেলেটাকে বিয়ে করে। বিয়ে করার পরে ওই ঘরে একটা ছেলে হয়, এখন আমার বাবা-মা বোনের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। ও যে ওর আগের স্বামীকে ডিভোর্স করে বিয়ে করেছে, এটা ঠিক হয়েছে কিনা? আমার বাবা-মা ও এবং ওর ছেলের সাথে সম্পর্ক রাখছে না।

এটা কি আমার বাবা-মা ঠিক করছে?

উত্তরঃ স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছেন, এটাকে ঢালাওভাবে না-জায়িয বলা যায় না। তবে সাধারণভাবে এটা শরীআত বহির্ভূত। তার ডিভোর্স দেওয়ার ক্ষমতা ছিল কিনা শরীআতসম্মত ভাবে কাবিনে...! তিনি কোন execute (কর্তৃত্বে) এ ডিভোর্সটা দিয়েছেন, ডিভোর্স দেওয়ার প্রক্রিয়া শরীআতসম্মত ছিল কিনা, এরপর ইদ্দত পালন করে বিবাহ করেছেন কিনা– অনেক প্রশ্ন এখানে থেকে যায়। তবে সাধারণ ভাবে আমরা যেটা জানি, প্রথম যে বড় কঠিন অপরাধ, স্বামীর বর্তমানে তিনি আরেকজন ব্যক্তির সাথে প্রেম করেছেন, সম্পর্ক করেছেন, এটা কঠিনতম হারাম। তিনি স্বামীকে পছন্দ না করলে, তিনি তার সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে দ্বিতীয় বিবাহের চিন্তা করতে পারতেন। আপনি যতোটুকু বলেছেন, এ থেকে বোঝা যায়, পুরো প্রক্রিয়াটাই অবৈধ ছিল। কারণ তিনি স্বামীর উপরে ক্ষুব্ধ হয়ে নয়, অন্য আরেকজনকে ভালোবেসে তাকে বিবাহের জন্য কোনোরকম ডিভোর্স নামক একটা প্রক্রিয়া তৈরি করেছেন– এটুকু আপনার কথা থেকে আমরা বুঝি। বাকি শরীআতসম্মত ছিল কিনা, এটা আপনাদের বিস্তারিত বলে আলিমদের কাছ থেকে জানতে হবে। আপনার পিতা মাতার ভূমিকা ভালো। কারণ সন্তান যখন অন্যায় করে, পিতামাতা যখন সেটা সমর্থন করে, ওই পাপে তারা অংশীদার হয়ে যান। এজন্য তারা যে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, এটা ভালো করেছেন। বাকি এটা শরীআতসম্মত ছিল কিনা, কী অবস্থা এটা বিস্তারিত আলিমদের কাছ থেকে জেনে নেবেন।

প্রশ্ন-১৩০: আমার বোনের স্বামী মারা গেছে। আত্মীয়স্বজনরা সোনা-গহনা খুলে নিয়েছে এবং সাদা কাপড় পরিয়েছে। এটা শরীআতসম্মত হয়েছে কিনা?

উত্তরঃ মুসলিম নারীর স্বামী মারা গেলে, আল্লাহ কুরআন কারীমে

বলেছেন:

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

চারমাস দশদিন তিনি শোক পালন করবেন।[৩] এই শোক পালনের সময়ে তিনি অলঙ্কার পরবেন না, সাজগোজ করবেন না। সুগন্ধি তেল মাখবেন না! সাদা কাপড় নয়, যে কোনো স্বাভাবিক রঙের কাপড় পরতে পারেন, স্বাভাবিক কাপড়! যেটা সাজগোজ নয়। এই চারমাস দশদিন পর তিনি অলঙ্কার পরবেন, সাজগোজ করবেন, সুগন্ধি মাখবেন, সবরকম কসমেটিক ব্যবহার করতে পারবেন। কোনো নিষেধ নেই। কাজেই, দুটো পর্যায় ঠিক রাখতে হবে। আমাদের দেশে অমুসলিম ভাইদের প্রচলন অনুযায়ী, যেন আমরা মনে না করি, বিধবার বেশ হল, অলঙ্কার মুক্ত হওয়া, সাদা কাপড় পরা। না, ইসলাম এটা বলেনি। বিধবা শোক প্রকাশের চারমাস দশদিন সাজগোজ অলঙ্কার পরবেন না, পরে তিনি সবরকম সাজগোজ করতে পারবেন। কেউ যদি সাদা কাপড় (পরেন), পরতে পারেন, জরুরি নয়। অলঙ্কার খুলতে বললে, চারমাস দশদিন খুলে রাখবেন। আর যেটা আনুষ্ঠানিকভাবে করা হয়, সেটা ঠিক নয়। আমাদের দেশের অমুসলিম tradition (প্রচলন) থেকে এটা আমরা নিয়েছি। এটা আমাদের বর্জন করা উচিত।

[৩] সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৩৪

পোশাক/পর্দা/সাজসজ্জা

প্রশ্ন-১৩১: মহিলাদের পর্দা সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হয়, পুরুষদের পর্দা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম। বিশেষ করে গোড়ালির উপরে প্যান্ট পরার যে সিস্টেমটা সেটা অনেকেই মানেনা!

উত্তর: পর্দা একটা বড় ব্যবস্থা। শুধু পায়ের কাপড় নয়– পোশাক, অশালীনতামুক্ত সমাজ, চক্ষু সংযত করা– বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। পুরুষদের জন্য দুটো বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটা হল, পুরুষরা চক্ষু সংযত করবে। নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর ঢেকে রাখবে। এটা তার জন্য ফরয। নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোনো অংশ যদি খোলা থাকে, তাহলে যতোক্ষণ খোলা থাকবে ততোক্ষণ একটা পরিপূর্ণ ফরয তরকের কঠিন গুনাহ হতে থাকবে। আমাদের সমাজে অনেকেই অকারণে হাঁটুর উপরে তোলা কাপড় পরার অভ্যাস করেছেন, হাঁটার নামে, খেলার নামে– এগুলো কঠিন হারাম। আর এই হারাম করার ভেতর দিয়ে আমরা অগণিত গুনাহ অর্জন করি, কিন্তু দুনিয়ায় কোনো লাভ পাই না। অনুরূপভাবে পুরুষদের কাপড় টাখনুর নিচে নামবে না। টাখনুর উপরে থাকবে। এটাও পোশাকের অন্যতম বড় দিক।

প্রশ্ন-১৩২: এক বোন প্রশ্ন করেছেন, টেলিফোনের মাধ্যমে ছেলে-মেয়ে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্কটা অনেক সময় অনেক অশালীন এবং নোংরা পর্যায়ে চলে যায়। এটা কতোটুকু শরীআত allow (অনুমোদন) করে?

উত্তর: আমাদের সমাজের মানুষেরা– যুবক, কিশোর, বয়স্ক মানুষেরা, আল্লাহর রহমতে, নামায-কালাম-ধার্মিকতায় ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক থাকলেও, অশ্লীলতা যে মহাপাপ– এটা তারা

ভালোভাবে অনুভব করেন। আর এই অনুভূতিটা দূর করার জন্যই এখন নানাভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা হিফাযত করেন। আল্লাহ কুরআন বারবার বলেছেন:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

[তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।][১]

শয়তান একবারে পাপে নেয় না। এক-পা, দু-পা করে নেয়। শয়তান অনেকের মনেই ওয়াসওয়াসা দেয়, তুমি তো ফোনেই একটু কথা বলছ, তুমি তো পর্নগ্রাফি দেখছ না। তুমি তো শুধু পর্ন বই পড়ছ, এখানে তো কিছু দেখার নেই। এইভাবে শয়তান পাপের প্রথম ধাপটা পূর্ণ করে। টেলিফোনে কোনো মেয়ে পুরুষের সাথে কথা বলা, কিংবা সরাসরি সুন্দর করে কথা বলা, আকর্ষণীয় গলায় কথা বলাটাই হারাম। স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে, যেটাকে কর্কশ (বলে)– 'জি! আপনি কী চান? ভালো আছেন?'– ইত্যাদি। টেলিফোনে কথা বলার প্রথম হারামটা হল, সুন্দরভাবে আকর্ষণীয় গলায় কথা বলা। দ্বিতীয়ত, এটা মনের যিনা। ক্রমান্বয়ে এর মাধ্যমে আমরা হৃদয়ে একটা অস্থিরতা অনুভব করি। ফোন না করলে ভালো লাগে না। এর ফলে শুধু পাপই হচ্ছে না; পাপের পাশাপাশি আমি আমার জীবনের শান্তি হারাচ্ছি। অস্থিরতা! আমি পাপ করতেও পারছি না, আবার ছাড়তেও পারছি না। এটা যে কতো কঠিন অস্থিরতা! আমি কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদেরকে অনুরোধ করব, জীবনটাকে উপভোগ করতে হলে একটু সবর করো। পঁচিশের পরে যেটা হয়, কোরো!! এই সময়ে এই ধরনের ফাঁদে পা দিও না– পর্নগ্রাফি দেখব না (কিন্তু) পর্নবই পড়ব, অথবা মোবাইলে একটু আড্ডা করব। এই মোবাইলের আড্ডার মাধ্যমে কতো ক্ষতি হয়েছে? একেবারে চোখে দেখা; মোবাইলের মাধ্যমে

[১] সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৬৮ ও ২০৮; সূরা: আনআম, আয়াত: ১৪২; সূরা: নূর, আয়াত: ২১

প্রেম করেছে, বাপ-মায়ের অমতে বিয়ে করেছে, বাপ-মাকে ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় চলে এসেছে। এরপর দেখেছেন, তার স্বামী বিবাহিত বা নারী পাচারকারী– এসব বাস্তব ঘটনা। সবচে' বড় কথা হল, ফোনে পরপুরুষের সাথে এই ধরনের হাসি-খুশি আড্ডা তামাশা সম্পূর্ণ হারাম! ফোন অথবা ফোন ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই হারাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতারিত হয় মেয়েরা; অনেকক্ষেত্রে পুরুষেরাও হন। প্রতারণার বড় সুযোগ হল, এই ফোন! ফোনের মাধ্যমে প্রেমের লোভ দেখিয়ে, সম্পর্কের লোভ দেখিয়ে, affairs (সম্পর্ক) এর লোভ দেখিয়ে নানাবিধ প্রতারণা। অর্থাৎ আল্লাহ যেটা হারাম করেছেন, আমাদের বাঁচানোর জন্যই হারাম করেছেন। আল্লাহর হারাম থেকে বেঁচে থাকুন, আপনি আপনার জীবনের অনেক ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবেন। আর আল্লাহর হারামে পড়লে আখিরাতও ধ্বংস হবে, দুনিয়াও ধ্বংস হবে।

প্রশ্ন-১৩৩: আমরা মেয়েরা সাধারণত যখন ঢাকায় চলাফেরা করি, বাসে চলতে গেলে অনেক সময় সমস্যা হয়ে যায়। অনেক সময় পুরুষদের সাথে লাগতে চাই না, কিন্তু দেখা যায় শরীরের সাথে লেগে যায়। এতে আমাদের গুনাহ হবে কিনা?

উত্তর: নিঃসন্দেহে! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মেয়েদেরকে খুব সুন্দর করে বলেছেন:

عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ

তোমরা রাস্তার পাশ দিয়ে চলবে।[২] যেন পুরুষদের সাথে কোনোরকম ধাক্কাধাক্কি, ঘষাঘষি বা কোনো রকমের সংমিশ্রণ না হয়। দেখেন, সাহাবি মেয়েরা কেমন ছিলেন। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন বললেন- মেয়েরা, তোমরা রাস্তায়

[২] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৫২৭২; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং-৫৮০

চলাচল করবে, রাস্তার পাশ দিয়ে যাবে। তখন মেয়েরা এমনভাবে সাইড দিত যে, পাশের বাড়িঘরের সাথে ঘষা লেগে যেত। মানে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথাটা তারা এতো গুরুত্ব দিয়ে নিতেন। যখন হিজাবের আয়াত নাযিল হল, অনেক মেয়ের নিকাব ছিল না, ওড়না ছিঁড়ে নিয়ে নিকাব করে পরেছেন। এইভাবে মহিলা সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বক্তব্য নির্দেশনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পালন করতেন। আমাদের মায়েদের-বোনেদের যেটা প্রয়োজন সেটা হল, আমরা প্রয়োজন ছাড়া বেরাব না। আমরা দুনিয়ার জাগতিক প্রয়োজনে অনেক সময় বেরোই, এই প্রয়োজনটা অনেক সময় অন্যভাবে মেটানো যায়। যেমন আমরা অনেক চাকরি করি, (যেটা) না করলেও চলে। যারা বাধ্য তারা অবশ্যই করবেন। আমাদের প্রথমত চেষ্টা করতে হবে, আমাদের বেরানো (উচিৎ নয়)। কারণ আমরা নিশ্চিত যে রাস্তায় বেরোলে– যারা রিকশা অথবা নিজের গাড়িতে চড়েন না– তাদের অবশ্যই ঘষাঘষি, ধাক্কাধাক্কির ভেতরে পড়তেই হবে। এজন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে, না বেরানোর। বের হলে, আলাদা চলতে হবে; ধাক্কা লেগে গেলে, আপনার অনিচ্ছাকৃত হলেও গুনাহ হবে। ইচ্ছা করে ধাক্কা লাগানো আর অনিচ্ছাকৃত সর্বাত্মক সুন্নাতমতো চলার পরও লেগে যাওয়া, এটার মধ্যে পার্থক্য আছে। আপনি অনিচ্ছাকৃত গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা ইস্তিগফার করবেন। বাঁচার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিন।

<u>প্রশ্ন-১৩৪:</u> (এক নারীর প্রশ্ন) আমার বয়স ২২ বছর। আমি এতোদিন কুরআন শরীফ পড়তে পারতাম না। কিছুদিন হয়েছে, আমি একজন ছেলের কাছে কুরআন শরীফ শিখছি। কিছুদূর পড়া হয়েছে। কিন্তু আমার অনেক খারাপ লাগে, ছেলে-হুযুর তো! এখন আমি কী করব?

<u>উত্তর:</u> আলহামদুলিল্লাহ! কুরআন শেখার ক্ষেত্রে আপনার আগ্রহ

বরকতময়। তবে আমাদের বুঝতে হবে, কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের জন্য ফরয। কুরআন নির্দেশিত তাওহীদ, কুরআন নির্দেশিত সালাত, কুরআন নির্দেশিত সৎজীবন, দুর্নীতি-মুক্ত জীবন, বান্দার হক, আল্লাহর হক। কুরআন তিলাওয়াত করা, সালাত আদায় পরিমাণ সহীহ তিলাওয়াত শেখাটাও আমাদের জন্য জরুরি। তবে কুরআন তিলাওয়াত করা মূলত নফল ইবাদত। এটা না করলে গুনাহ হবে না। করলে ব্যাপক সাওয়াব। এর অর্থ বোঝা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নফল পর্যায়ের। পর্দাটা আল্লাহ ফরয করেছেন। কাজেই কুরআন তিলাওয়াত শেখার জন্য যদি আপনি পুরুষ উস্তাদ গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে পর্দা ফরয। পর্দার দুটো দিক, পুরুষের সাথে কোনো মেয়ে একত্রে একঘরে থাকা; আপনি বোরখা পরে আছেন, তাসত্ত্বেও একটা পুরুষের সাথে একা একঘরে থাকা হারাম! সেখানে অন্য কোনো নারী পুরুষ থাকলে হবে। দ্বিতীয়ত, মুখ খুলে নারীপুরুষের সামনাসামনি বেপর্দা বসা হারাম। কাজেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে মহিলা শিক্ষিকা রাখা। অথবা একাধিক মহিলা একজন পুরুষ শিক্ষকের কাছে পর্দাসহ শেখা যেতে পারে, পর্দার আড়ালে শেখা যেতে পারে। সহীহ সালাত আদায় করার মতো শেখা; যতোটুকু শিখলে ফরয আদায় হয়ে যাবে ততোটুকু শিখা। এটুকু শিখতেও পর্দার ফরয লঙ্ঘন না করার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিন।

প্রশ্ন-১৩৫: কিছুদিন আগে আমার ওয়াইফ আমাকে বলেছে যে, যদি কেউ দাড়ি না রাখে– আমার দাড়ি নাই অবশ্য– তাহলে চব্বিশটা ঘণ্টা প্রতিটা মুহূর্ত তার আমলনামায় গুনাহ লেখা হচ্ছে। আসলে এটা কতোটুকু যুক্তিসঙ্গত?

উত্তর: দাড়ি না রাখা, মুণ্ডন করা যে গুনাহ, এই ব্যাপারে

মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। সাহাবিদের যুগ থেকে, তাবিয়ীন, তাবি'-তাবিয়ীন, চার ইমামসহ ফুকাহারা বর্তমান যুগের দাড়িমুণ্ডিত সভ্যতার আগমনের আগ পর্যন্ত কোনো ফকীহ আলিম বলেন নি যে দাড়ি কাটা বৈধ। মূলত দাড়ি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রেখেছেন, তাই রাখা সুন্নাত। দাড়ি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই দাড়ি রাখা ওয়াজিব। আর দাড়ি মুণ্ডন করতে তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন, এজন্য দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম। কাজেই আপনি প্রতিদিন একটা হারাম গুনাহ করছেন; এটা আপনার চব্বিশ ঘণ্টা সাথে থাকছে। আপনার স্ত্রী মূলত কথাটা ঠিকই বলেছেন। এখানে আরো দুটো বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম বিষয় হল, দাড়ি মুণ্ডন করা এমন একটা পাপ, যেটার মাধ্যমে আমরা কিছুও লাভ পাই না। বরং ক্ষতি পাই। একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, একটা ওযনে কম দিলে অথবা ভেজাল মাল বিক্রি করলে কিছু গোনাহ হলেও দুনিয়াবি লাভ হয়। কিন্তু দাড়ি মুণ্ডনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু কোনো লাভ পাচ্ছি না বরং প্রতিদিন কিছু পয়সা খরচ হচ্ছে। আর ডাক্তারি পরীক্ষায় চোখের কিছু ক্ষতিও হচ্ছে। কিন্তু গুনাহ হচ্ছে। এই গুনাহ কেন করছি? শুধু মানুষের দেখাদেখি। আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী চান না তার স্বামী দাড়ি রাখুক। এমনকি স্বামীর দীনদারিও পছন্দ করেন না। কিন্তু স্বামী যখন যুবক সেজে অন্য নারীদের দিকে তাকান, গল্প করেন, তখন কষ্ট পান। কিন্তু একটা পুরুষ দাড়ি রাখলে, সাওয়াব পান, পারিবারিক জীবনে শান্তি বেশি হয়, তার মুখের দাড়িটা তাকে অন্য মহিলাদের দিকে তাকাতে লজ্জা তৈরি করে দেয়; স্ত্রীরা এটা বুঝতে চায় না। আসলে, আমি আপনার স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিই। তিনি দীনের বিষয়টা বুঝেছেন। এবং আমি সকল দর্শককে বলব, দাড়ি ইসলাম নয়; কিন্তু দাড়ি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আমরা কোনো যুক্তি দিয়ে নয়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে দিয়ে, কুরআন এবং হাদীস দিয়ে ইসলামকে বিচার

করি, তাহলে নিশ্চিতভাবে... । দাড়ি রাখা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ । এটা তাঁর শুধু কর্ম নয় যে, তিনি করেছেন, কাজেই আমরা করলে ভালো, না করলে... । তিনি করেছেন, করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কাটতে নিষেধ করেছেন, এমনকি দাড়ি চাঁছা কাফিরদের দিকে তাকাতে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন । তাকাতে চান নি । কাজেই এই ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট হব । আল্লাহ তাওফীক দান করুন ।

মীরাস/উত্তরাধিকার

প্রশ্ন-১৩৬: সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান অংশ দেওয়া কুরআন পরিবর্তন করা নয় কি?

উত্তর: আমাদের একটু পেছনে যেতে হবে। আমরা নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষের সমতা চাই, সমান অধিকার চাই। সমান অধিকার আল্লাহ্ তাআলা দিয়েছেন। কিন্তু আসলে সমান অধিকার কী? এটা বোঝার জন্য আমাদের একটু পিছে ফিরে যেতে হবে। আমরা যদি ধর্মীয় পরিমণ্ডলে দেখি, হিন্দু ধর্মে, ইহুদি ধর্মে, খ্রিস্টান ধর্মে নারী উত্তরাধিকারীর কোনো অধিকারই দেওয়া হয় নি। একজন হিন্দু নারী তার পিতার সম্পত্তির কিছুই পান না। আর স্বামীর সম্পত্তি পাওয়া তো দূরের কথা, স্বামীর সাথে তো তাকে চিতাতেই জ্বলতে হয়। কাজেই সম্পত্তি পাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী যারা, এখনো বাইবেলে রয়েছে, কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার কন্যা কিছুই পাবে না। শুধুমাত্র তার পুত্রসন্তানেরা পাবে। একটা ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে, যদি কোনো ব্যক্তির ছেলে সন্তান না থাকে, তাহলে তার কন্যা সন্তানরা তার সম্পত্তি পাবে, তবে সেক্ষেত্রে ওই কন্যা সন্তানরা আর বাইরে বিয়ে করতে পারবে না। তার চাচাতো ভাইদের ভেতরে বিয়ে করতে হবে। এটা তো হল উত্তরাধিকার আইন। তাহলে তারা উত্তরাধিকার হিশেবে কিছুই পাচ্ছে না। এখন ওই মেয়ে বাপের কিছু পায় নি, নিজে পরিশ্রম করে, কামলা খেটে, অন্যকোনোভাবে কিছু সম্পত্তি অর্জন করেছে, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে ওই নারী এবং নারীর সম্পত্তি পুরোই স্বামীর মালিকানাধীন চলে যাবে। বিবাহের পরে ওই নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবে না, বিক্রি করতে পারবে না। স্বামীর ম্যাজিস্ট্রেটি পাওয়ার, স্বামী ইচ্ছা করলে ওই সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে পারবে। কিন্তু স্ত্রী চাইলে

স্বামীর অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক! এটাই হল ইহুদি এবং খ্রিস্টান আইন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে যতোটুকু আমার মনে পড়ে, নিউ ইর্য়ক স্টেটে সর্বপ্রথম একটা আইন হয়, Married Women Property Act। এটা সম্ভবত পাশ্চাত্য জগতে নারীদের সম্পত্তির অধিকারের প্রথম একটা পদক্ষেপ। আজ থেকে দেড়শ বছর আগের কথা। বিগত দেড়শ বছরে ইউরোপের মানুষেরা, আমেরিকার মানুষেরা এই যে অধিকারবিহীন, তাদেরকে অধিকারে আনার চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি আরেকটা বিষয় আমাদের বুঝতে হবে, প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কয়েক কোটি পুরুষ নিহত হন এবং আহত হন। এই যে নারীরা বেরিয়ে আসে বাধ্য হয়ে, জীবনের তাগিদে। কাজেই তাদের কর্ম করতে হয়। এজন্য নারীদের অধিকার নিয়ে কথা আরো বাড়তে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে ইউরোপের মানুষেরা ভালোভাবেই, নেক উদ্দেশ্যে, নারীদের অধিকার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা বিভিন্ন আইনও করেছেন। মানুষের তৈরি আইন আসলে পুরো ভালো হয় না। আর ইসলাম কী দিয়েছে? আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

কুরআনই সর্বপ্রথম, বিশ্বের যে কোনো ধর্ম, বর্ণ, ইতিহাস, আইন, শাসন, বিধান, তন্ত্র-মন্ত্রের ভেতর, সর্বপ্রথম খুব ক্লিয়ার বলল যে, মানুষ মারা গেলে, তার সম্পত্তিতেই পুরুষও পাবে, নারীও পাবে। সম্পত্তি যেটা রেখে গেছে, কম হোক বেশি হোক, নারী পুরুষ উভয়েই পাবে।[১] এরপর কীভাবে পাবে সেটা বলা হয়েছে। আপনি আপনার জীবদ্দশায় সন্তানদের যে হাদিয়া দেবেন তা সমান দিয়ে দেওয়া ফরয। মৃত্যুর পরে (আল্লাহ তাআলার কিছু

[১] সূরা: নিসা, আয়াত: ৭

কিছু ক্ষেত্রে ফরয আছে) যেমন কালালার ক্ষেত্রে, নারী পুরুষ সমান পায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন নারী একজন পুরুষের অর্ধেক পেয়ে থাকে। এটা নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক কথা হয়। আসলে একটা ব্যবস্থা, সিস্টেমকে বুঝতে গেলে পুরোপুরি বুঝতে হবে। আমরা দেখেছি, ইউরোপের বাড়িগুলো এরকম (ছাদগুলো কৌণিক হয়)। কারণ সেদেশে তুষার পড়ে। যদি ছাদটা সমান হয়, তাহলে তুষার পড়ে ছাদটা ভেঙে যাবে। তুষার যাতে গলে পড়ে যায় এজন্য এরকম করা। এখন ইউরোপের একজন মানুষ বাংলাদেশে এসে দেখে সব ছাদ সমান, সর্বনাশ! আগামী তুষারপাতে সব...! এদেশের ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেকচার বোঝে না। এরকম ফতোয়া দিলে তো হবে না। আমাদের দেশে তুষারপাত নেই। আবার কেউ যদি মনে করে, ইউরোপে যেহেতু এরকম দেয়, আমরাও দেব, তাহলে খুব ভালো হবে, এটাও ঠিক হবে নয়। আসলে ইসলাম আমাদের কী দিয়েছে, এটা যদি আমরা একটু পড়সঢ়ধরৎ (তুলনা) করি তাহলে দেখব, ইসলাম আমাদের সমান নয়, অনেক বেশি অধিকার দিয়েছে! আমরা একটা কল্পনা করি। আমার আব্বা মারা গেলেন, দশলক্ষ টাকা রেখে গেলেন, যা আমি এবং আমার বোন পেয়েছি। আমি সাড়ে ছয়লক্ষ, আমার বোন সাড়ে তিনলক্ষ, ইসলামি আইনে, যেটাকে আমরা মনে করছি কমবেশি হচ্ছে, একটু কমবেশি হবে। এবার আমরা আমাদের দায়িত্বগুলো বিচার করি। আমার বিবাহ করতে হবে। বিবাহের জন্য ইসলামি ব্যবস্থায় আমার স্ত্রীকে একলাখ টাকা মোহর দিতে হবে। এবং বিবাহের খরচ আমার। তাহলে আমার গড়ে দুলাখ টাকা খরচ হয়ে গেল। তাহলে আমার থাকল সাড়ে চারলাখ টাকা। আর আমার বোন পেয়েছিলেন, সাড়ে তিনলাখ টাকা। আমার স্ত্রী যখন বিবাহ করবেন, বিবাহের খরচ ইসলামি ব্যবস্থায় একটা পয়সাও মহিলা করবেন না। পুরো খরচ পুরুষের এবং পুরুষ তাকে মোহর দেবে। আমার ভগ্নিপতি আমার বোনকে মোহর দিয়েছেন, আমার

বোন এক লাখ মোহর পেয়েছেন। তারও কিন্তু সাড়ে চারলাখ টাকা হয়ে গেছে। তাহলে আমার এবং বোনের কিন্তু সমান টাকা হয়ে গেছে। এবার বিবাহিত জীবনে আমার স্ত্রী, আমার সন্তানের দায়িত্ব পূর্ণ আমার। আমাকে প্রতি মাসে এই সাড়ে চারলাখ টাকার মধ্যে আমাকে চার পাঁচ হাজার টাকা কমপক্ষে খরচ করতে হবে। আর আমার বোনের জন্য ইসলামি ব্যবস্থায়, আমার বোনের নিজের শাড়ি কেনার দায়িত্ব, চুড়ি কেনার দায়িত্ব তার নয়। ইসলামি ব্যবস্থায় আমার বোনের যাবতীয় খরচ বহন করবে তার স্বামী। যদি তার স্বামী বলে যে তোমার যেহেতু, পাঁচলক্ষ দশলক্ষ টাকা আছে, এবার তুমি নিজের শাড়িটা নিজে কেনো, তাহলে আমার বোন ইসলামি ব্যবস্থায় বিচারকের কাছে কেস দিয়ে স্বামী থেকে শাড়ি আদায় করার সামর্থ্য রাখেন। এটা হল ইসলামি ব্যবস্থা। আমরা তাহলে এখন পর্যন্ত দেখছি, আমার বোনকে কিন্তু আল্লাহ বেশি দিয়েছেন। আমার বোনের স্বামী মারা গেল, আমার স্ত্রী মারা গেল– এটা আমাদের জীবনের একটা পর্যায়ে হতে পারে। এই পর্যায়ে যেয়ে, আমার এবং আমার সন্তানের দায়িত্ব আমার। আর আমার বোনের জন্য সন্তানের দায়িত্ব ইসলাম দেয় নি। তার সন্তান রক্ষা করার দায়িত্ব, আমার বোন যতোদিন দ্বিতীয় বিবাহ না করবে, ওই সন্তান তার কাছে থাকবে। সন্তানের দাদা-চাচাদের কোনো অধিকার নেই সন্তানের অধিকার কেড়ে নেওয়ার। কিন্তু খরচটা দাদা-চাচাকে দিতে হবে। অথবা রাষ্ট্র বহন করবে। তাহলে আমরা দেখছি, আসলে আল্লাহ তাআলা মেয়েদেরকে অর্থাৎ বোনকে ভায়ের অর্ধেক দিয়েও অনেক বেশি দিয়েছেন! কারণ তাকে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছেন। আমার বোন তার স্বামীর মোহর পেয়েছে, স্বামীর থেকে সকল খরচ পেয়েছে, এমনকি বোনের যতো হাদিয়া পেয়েছে, তার একার মালিকানা। আর আমার ভগ্নিপতি যতো হাদিয়া পেয়েছে, বোন এবং ভগ্নিপতি উভয়ের মালিকানা। সমান মালিকানা পেয়েছে তারা, খরচ করতে পারে, ব্যবহার করতে

পারে। এভাবে ইসলাম মেয়েদেরকে অনেক বেশি দিয়েছে কিন্তু দায়িত্ব কম দিয়েছে কী জন্য? কেন আমাদের বেশি দিয়েছে, এটা আমাদের বুঝতে হবে। তাহলে সমান অধিকারটা বুঝতে পারব। মানবসভ্যতা টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবার থাকতে হবে। আমরা অনেকেই পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে অনেক কথা বলি, পরিবেশের পক্ষে। পরিবেশ বিপর্যস্ত হলেও পৃথিবী টিকে থাকবে। কোনো কোনো এলাকা ধ্বংস হবে। কিন্তু যদি পরিবার বিপর্যস্ত হয়, বিশ্বের মানুষ বিবাহ বন্ধ করে দেয়, সমাজ বন্ধ হয়ে যায়, তবে মানবসভ্যতা শতবছরের মধ্যেই বিলীন হয়ে যাবে। ইসলাম যেটা দিয়েছে, বেশি দিয়েছে। আমরা যদি সমান অধিকারের নামে এটা উল্টাতে চাই, তাহলে...? কেউ যদি মনে করে, ইসলাম খুব খুব ভালো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা দিয়েছে, এটা খুব সুন্দর; তবে বর্তমানে ব্যস্ততায় আমরা এটা তিন ওয়াক্ত করে নিলে ভালো হয় বা দুই ওয়াক্ত করলে..., এটা যেমন কুফরি! কুরআনকে অবিশ্বাস করা ঠিক তেমনই। কেউ যদি মনে করে, কুরআনে তখনকার যুগে মোটামুটি দিয়েছিল ভালোই, এখন আরেকটু সাইজ করব, তাহলে একই ধরনের কুফরি হবে। আর ইসলাম যেটা দিয়েছে, এটা আমাদের জন্য সবচে' উপকারী। আমাদের যেটা দিয়েছে ইসলাম সেটাকে পূর্ণ বাস্তবায়ন করলে নারীরা পরিপূর্ণ অধিকার পাবেন। আর যদি সমান অধিকার করতে যাই, তাহলে সমস্যাটা হবে, স্বামী স্ত্রীর উপর যুলুম করবেন, তার সম্পত্তি নিয়ে সংসারের খরচ নিয়ে, মোহর দিতে কেউ রাজি হবেন না। অর্থাৎ পুরো ব্যবস্থাটা ভেঙে যাবে। এজন্য আমরা, কুফরি ও সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলার মতো... বিরত থাকি...। আমরা মনে করি, আমাদের দেশের সকল রাজনীতিবিদ এটা বোঝেন। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দান করেন।

প্রশ্ন-১৩৭ঃ আমার শাশুড়িরা দুইভাই একবোন। একেক ভাই পাঁচ শতাংশ করে জায়গা পেয়েছে। আমার শাশুড়ি সেই সম্পত্তির কেমন ভাগ পাবে? এটা কি তিনভাগ হবে? একভাই যা পায়, দুইবোন তা পায়। আমাদের শাশুড়ির কোনো বোন নাই। তাহলে সম্পত্তি কি উনি একাই পাবেন?

উত্তরঃ বিষয়টা খুবই সহজ। প্রত্যেক ভাইকে দুইবোন ধরতে হবে। দুইভাই অর্থ চারবোন, আর আপনার শ্বাশুড়ি, পাঁচটা ভাগ হবে। শ্বাশুড়ি একভাগ পাবেন, ভাই দুইভাগ পাবেন। যদি একভাই একবোন হয় তিনভাগ করে দুইভাগ... (ভায়ের)। যতো ভাইবোন হবে প্রত্যেক ভাইকে দুইবোন ধরে হিশেব করতে হবে। এটা শরীআতের বিধান।

হালাল/হারাম

প্রশ্ন-১৩৮: অনেক হোটেলে কাঁকড়া বিক্রি হয় এবং মুসলিমরা খায়। আমি জানতে চাচ্ছিলাম, কাঁকড়া খাওয়া কি মুসলিমদের জন্য হালাল?

উত্তর: যে প্রাণি শুধুমাত্র পানিতে বাস করে– কচ্ছপ নয়, কারণ কচ্ছপ পানি ও ডাঙায়...। মাছ বা জলজপ্রাণি, এদের বিষয়ে অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, যেটা সম্পূর্ণ পানিতে বাস করে, পানির বাইরে থাকতে পারে না, পানিতেই তার বাস, পানি থেকে তুলে বেশিক্ষণ রাখলে বাঁচবে না, এই ধরনের প্রাণি–ব্যাঙ বা কচ্ছপ নয়–খাওয়া হালাল। তাদের দলীল, হাদীস শরীফে এসেছে:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

সমুদ্র ও নদীর পানি যেমন পবিত্র, যে প্রাণি পানিতে বাস করে পানিতে মরে, সেগুলোও হালাল।[১] এজন্য তারা বলেন, মাছ এবং মাছজাতীয় সকল প্রাণি যা পানিতে বাস করে, সবই বৈধ। পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক ফকীহ বলেছেন– আমাদের দেশের প্রচলিত– ইমাম আবু হানীফাসহ অন্যান্য অনেক ফকীহ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেছেন:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

খবীসকে আল্লাহ হারাম করেন, পবিত্রকে আল্লাহ হালাল করেন।[২] কাজেই মাছ ভক্ষণ করা বৈধ। যেগুলো পোকামাকড় কীটপতঙ্গ, এগুলো বৈধ নয়। তারা কাঁকড়াকে মাকরূহ বলেন। কচ্ছপও বৈধ

[১] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৮৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৬৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৫৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৩৮৬

[২] সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭

নয়। ব্যাঙ বৈধ নয়। তবে কাঁকড়াটা অন্যান্য ফকীহরা বৈধ বলেছেন। (উপস্থাপক: যে সকল প্রাণি জলেও থাকছে আবার স্থলেও থাকছে তাদের ক্ষেত্রে এটা বৈধ হবে না, কিন্তু কাঁকড়া জলে এবং স্থলে থাকে...; সেক্ষেত্রে?) কাঁকড়া মূলত পানির, স্থলে তারা বাস করে না, থাকলেও পানিতে চলে যায়। এ সেন্সে কোনো কোনো ফকীহ কাঁকড়া জায়িয বলেছেন। কিন্তু যারা জলে এবং স্থলে বাস করে, কচ্ছপ এবং ব্যাঙ, আবু দাউদেও হাদীসে ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা পানিতে বসবাসকারী সকল প্রাণি বৈধ বলেছেন...

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

অর্থাৎ সমুদ্র! সমুদ্র বলতে পানি; নদী, সমুদ্র সবকিছু। পানি যেমন পবিত্র, অর্থাৎ পানিতে গোসল করা যাবে লবণ আছে কিনা, মৃত প্রাণি আছে কিনা, এটা বিচার করা (র দরকার নেই)..., কারণ সমুদ্রের পানি, বৃহৎ নদীর পানি এগুলো পাক। এখানে গোসল করা যাবে ওযু করা যাবে। ঠিক তেমনি এই পানিতে বসবাসকারী প্রাণি পানিতে মরে গেলেও যবাই লাগবে না। ওটা ভক্ষণ করা যাবে। এটাকে যবাই করেও খাওয়া লাগে না। যেমন মাছ, আমরা জানি। এই হাদীসের ভিত্তিতে তারা বলেন, যে সমস্ত প্রাণি শুধু পানিতে বাস করে, ডাঙায় নয়, যেমন সাপ; ডাঙা-পানি সবজায়গায়। শুধু পানিতে বাস করে এগুলো ভক্ষণ করা বৈধ। বাকিগুলো যেগুলো পানি এবং ডাঙায়, সেগুলো হারাম। উভচর প্রাণি হারাম। আর অন্যান্য ফকীহরা বলছেন, জলজপ্রাণি বৈধ তবে যেটা প্রাণি, যেটা খবীস নয়, কীটপতঙ্গ নয় দেখলে ঘেন্না লাগে এরকম নয়..., কাঁকড়া বা এই জাতীয়, এরা তো কীটপতঙ্গ, কাজেই এগুলো বৈধ নয়। আমরা বাংলাদেশের মুসলিমরা কাঁকড়াকে অবৈধ মনে করে থাকি, এটার প্রতি আমাদের ঘৃণা রয়েছে। এটা মাকরূহ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

<u>প্রশ্ন-১৩৯:</u> মনে করেন, বিছানার খাট আছে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর। পূর্বদিকে মাথা রেখে শুলে স্বাভাবিকভাবেই পা পশ্চিমদিকে চলে যায়। সুতরাং পূর্বদিকে মাথা রেখে শোয়াটা ইসলামের দৃষ্টিতে কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

<u>উত্তর:</u> কিবলাকে সম্মান করা বা যে কোনো সম্মানিত বিষয়কে সম্মান করা আমাদের ঈমানি চেতনার অংশ। তবে সম্মানের পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছ থেকে শেখা দরকার। আসলে আমাদের সবকিছু শেখানোর জন্যই তো তিনি এসেছিলেন। আমরা আমাদের যিক্‌র, আমাদের মীলাদ, আমাদের সীরাত, আমাদের কিবলার সম্মান, আমাদের উস্তাদদের সম্মান সবই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবিদের কাছ থেকে শিখতে হবে। আল্লাহ কুরআন কারীমেও আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের সর্বোচ্চ আর্দশ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণকে জান্নাতের পথ বলে উল্লেখ করেছেন। কিবলার দিকে পা দেওয়া, কিবলার দিকে পা দিলে সম্মান হয়, এটা সরাসরি কুরআন-হাদীসে নেই। বরং একজন মানুষ যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারে না, ওই ব্যক্তি বসে নামায পড়তে হলে, হাঁটু গেড়ে বসতে না পারলে, কিবলার দিকে পা দিয়ে বসবেন। তিনি যদি বসেও নামায পড়তে না পারেন, তাহলে পা-টা কিবলার দিকে দিয়ে শুয়ে পড়তে হয়। কাজেই কিবলার দিকে পা দেওয়া সরাসরি নিষিদ্ধ (নয়), বরং সম্মানের জন্য। নিজেকে কিবলামুখি করার জন্য কিবলার দিকে পা দেওয়া যায়। এখন যেহেতু সম্মানের জন্য দিচ্ছি না, ঘুমাব, স্বাভাবিক ঘুম, এজন্য সাধারণ ভাবে কিবলার দিকে পা না দিই। এটা একটা আন্তরিক সম্মানের অংশ। অন্যদিকে পা দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করি। তবে কিবলার দিকে পা দিলে গুনাহ হবে বা এটা কিবলার সম্মানের অংশ, হাদীসে বা সাহাবিদের আমলে এই ধরনের কিছু স্পষ্ট পাওয়া যায় না। কাজেই এর উপর অতো গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।

<u>প্রশ্ন-১৪০:</u> অ্যালকোহলযুক্ত পারফিউমের ক্ষেত্রে মাসআলা কেমন হবে?

<u>উত্তর:</u> অ্যালকোহল অর্থই নাপাক নয়। অ্যালকোহল একটা কেমিক্যাল টার্ম। সব অ্যালকোহলই মাদক নয়। অনেক অ্যালকোহল বিষাক্ত, মানুষ মাতাল হবে না, (কিন্তু) মারা যাবে। কাজেই, অ্যালকোহল মানেই মদ নয়। ইসলামে যে অ্যালকোহল মাদক এবং আঙুর থেকে তৈরি, এই অ্যালকোহলটা পরিপূর্ণই হারাম। মানে শুধু খাওয়াই হারাম নয়, এটা নাপাক। বাকি অন্যান্য কোনো ভেজিটেবল থেকে যদি কোনো অ্যালকোহল তৈরি করা হয় বা কেমিক্যাল অ্যালকোহল, এগুলো নাপাক নয়, সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, যে অ্যালকোহল, যেগুলো ওষুধ ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়, কারণ আঙুরের তৈরি পিউর অ্যালকোহল বা মদের মতো অ্যালকোহল ওষুধে ব্যবহার করে (না)... অনেক দামি অ্যালকোহল। আমার মনে হয়, সাধারণভাবে যেটা, আমি বিজ্ঞান অতো বুঝি না, আমরা যতোটুকু জেনেছি যে, পারফিউম ইত্যাদিতে ওই অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় না।

<u>প্রশ্ন-১৪১:</u> হলে থাকাকালীন হল মসজিদেও একটা কুরআন পড়তাম। পরে বাসায় আসার সময় কুরআনটা নিয়ে এসেছি। এখন কী করণীয়?

<u>উত্তর:</u> যদি কেউ কোনো কিছু ওয়াক্ফ করেন, যে নিয়তে ওয়াক্ফ করেন, সেটা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আপনি যতোদিন হলে পড়েছেন, অবশ্যই ভালো কাজ করেছেন। ওয়াক্ফকারীকে না জানিয়ে নিয়ে আসা ঠিক হয় নি। তবে আপনি যেটা করতে পারেন, আপনি হয় এই কুরআনটা হলে দিয়ে আসবেন বা অন্য আরেকটা নতুন কুরআন তার পক্ষ থেকে হলে দিয়ে আসবেন।

প্রশ্ন-১৪২: হুন্ডি বিজনেস শরীআতসম্মত কিনা?

উত্তর: রাষ্ট্রীয় আইন মেনেচলা মুমিনের জন্য দীনি দায়িত্ব। সেই আইন যতক্ষণ না শরিআতবিরোধী কিছু নির্দেশ করে। অর্থাৎ কোনো রাষ্ট্র যদি বলে, নামায পড়বে না, জুমুআয় যাবে না, এটা আমরা মানব না। কিন্তু রাষ্ট্র যদি বলে টাকাটা এইভাবে পাঠাও, রাষ্ট্রের অধিকার রাষ্ট্রের ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া, এটা হাদীসে বারবার নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব, আইনগতভাবে টাকার লেনদেন করতে, এতে সরকার, রাষ্ট্রের জনগণ উপকৃত হবে। এটা অ্যাভয়েড করে যে পয়সাগুলো লাভ করি, এটা আমাদের জন্য বৈধ হয় না।

বান্দার হক

<u>প্রশ্ন-১৪৩</u>: আমি বুখারি শরীফের একটা হাদীসে দেখলাম, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর পায়ে তাঁর সাহাবিরা চুমা দিতেন, হাদীস নাম্বার আমার খেয়াল নেই। কিন্তু চুমা দেওয়া তো না-জায়িয। এটা সম্পর্কে একটু বলবেন।

<u>উত্তর</u>: আপনি এটা দেখেন নি!! কোনো হাদীসে কোথাও নেই যে, সাহাবিরা রাসূল (ﷺ) এর পায়ে চুমু দিতেন। কথা যেটা আছে, সেটা বুখারিতে নয়, এটা ইমাম বুখারির লেখা আরেকটা গ্রন্থ। দুটি সমস্যা হতে পারে, বাঙলা বুখারি বলতে...। আসলে অনেক রকমের সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। বাঙলা বুখারি বলতে অনেক কথা, কখনো ব্যাখ্যার নামে, কখনো টীকার নামে, কখনো জালিয়াতি করেও অনেক কথা ঢুকানো হয়। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পায়ে চুমু খেতেন, এটা তাদের অভ্যাস ছিল– এটা বুখারি নয়, বিশ্বের কোনো হাদীসে নেই। তবে ইমাম বুখারির লেখা, *আল আদাবুল মুফরাদ* বইয়ের ভেতরে একটা হাদীস আছে, একজন সাহাবি বলছেন, আমরা নতুন মুসলিম হতে আসলাম; এসে আমরা উটের পিঠ থেকে নেমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে যেয়ে, তাঁর হাতে এবং পায়ে চুমু খেলাম। এখানে আপনাদের আবারো বলি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর তেইশ বছরের নবুওতি যিন্দেগিতে লক্ষলক্ষ সাহাবি কোটিবার এসেছেন। আবু বাকর, উসমান, আলী রা.সহ আশারায়ে মুবাশশারা, কোনো সাহাবি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কন্যা-স্ত্রী-নাতি কক্ষনো কেউ তাঁর পায়ে চুমু খান নি। শুধুমাত্র চুমু খাওয়ার ঘটনা যেগুলো ঘটেছে, সনদগতভাবে হাদীসগুলো দুর্বল। এরপরও একটা ইহুদি তাঁর কাছে এসে পায়ে চুমু খেয়েছেন, সনদগতভবে দুর্বল হাদীস। যে ব্যক্তি নতুন মুসলিম হওয়ার সময় চুমু খেয়েছেন, ওই ব্যক্তিই

মুসলিম হওয়ার পরে আর কখনোই চুমু খাননি। এখানে ঘটনা হল, ইসলামি আদব সালাম; সালাম দিলে সাওয়াব হবে, মুসাফাহা করলে সাওয়াব হবে, আর খুব বেশি হলে কপালে-হাতে চুমু খাওয়াটা, এটা বৈধ, মাসনূন, সুন্নাতসম্মত। এছাড়া পায়ে চুমু খাওয়া, কেউ যদি আবেগে হঠাৎ কারোর পায়ে চুমু খেয়ে ফেলে, সিজদা ছাড়া সাধারণভাবে, এটাকে জায়িয বলা হয়, এটা হারাম নয়। কিন্তু এটা ইসলামি আদব নয়। কক্ষনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কোনো সাহাবি এটা করেন নি। আমরা এটাকে বর্জন করব।

<u>প্রশ্ন-১৪৪:</u> আমার আব্বা ইন্তিকাল করেছেন। উনার একটা জমি ছিল, সেটা বিক্রি করার পরে ভাইয়েরা মায়ের চিকিসার জন্য রেখে দেবে। কোনো ভাই রাজি হয়েছেন, কোনো ভাই হন নি। যারা রাজি হন নি, তাদেরটা কি তারা পাবে, নাকি পাবে না?

<u>উত্তর:</u> পিতার মৃত্যুর পরে সম্পত্তি আর পিতার থাকে না। এটা ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারদের হয়ে যায়। কাজেই সম্পত্তি বিক্রির পরে যদি ওসীয়ত না করে যান; আপনার মায়ের একটা অংশ আছে, এটা আপনার মায়ের। বাকি সম্পত্তি বিক্রির পরে, আপনাদের অংশ, ভাইবোন সবার অংশ, কেউ যদি ইচ্ছা করে দান করেন, সেটা মায়ের জন্য যাবে। নাহলে, তিনি (তারা) যদি বলেন, আমি (আমরা) দেব না, তাহলে তিনি (মা) পাবেন না। না দেওয়ার জন্য তিনি (তারা) নৈতিকভাবে হয়তো অপরাধী হবেন। মায়ের চিকিৎসার জন্য না দিলে গুনাহগারও হবেন। কিন্তু টাকাটা তার (তাদের)। দ্বিতীয়ত, পিতা এবং মাতার খরচ বহন করা সন্তানের জন্য ফরযে আইন। এমনকি সন্তান যদি পিতামাতার খরচ না দেয় জোর করে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে যদি মায়ের চিকিৎসার অসুবিধা হয়, মায়ের জন্য খরচ বহন করা সন্তানের জন্য ফরয হয়ে যাবে, ওই টাকা বা অন্য টাকা থেকে।

<u>প্রশ্ন-১৪৫:</u> আমি গ্রামের এক ফ্যামিলির ছেলে। আমার মা-বাবা ততোটা শিক্ষিত না। সংসার চালাতে উনারা যেটা বোঝেন বা করতে চান, আমাদের ফ্যামিলির জন্য অশুভ। আমি দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পাচ্ছি। এই জিনিসটা যখন আমি তাদের বোঝাতে যাই, হয় তো অনেক সময় তাদের মনে কষ্ট দিয়ে ফেলি। উনারা কান্নাকাটিও করে ফেলেন। পরে হয়তো জিনিসটা বুঝতে পারেন, কিন্তু উনাদের চোখের জল পড়ে। আমি নিজেকে নিজে ক্ষমা করতে পারি না, মা-বাবার মনে হয়তো কষ্ট দিয়ে ফেললাম। এটা ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন আমি জানি না। মা-বাবার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য যদি কোনো পরামর্শ দিতেন।

<u>উত্তর:</u> খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন! কারণ, আমাদের একটা মূল বিষয়, যেটা যুগে যুগে সবসময় হয়, জেনারেশন গ্যাপ! প্রতিটি জেনারেশন, আমার সাথে আমার সন্তানের মানসিকতার গ্যাপ আছে। আর এই গ্যাপ বোঝাটা আমাদের জন্য কষ্টের ব্যাপার। পিতামাতাও বুঝতে চান না, সন্তানেরাও বুঝতে চান না। এক্ষেত্রে উভয়পক্ষেরই দায়িত্ব আছে। পিতামাতাকে বুঝতে হবে, আমার চেয়ে ত্রিশ বছরের পার্থক্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, কাজেই একটা গ্যাপ আছে। তার মানসিকতা বুঝতে হবে আমাকে। আবার সন্তানকেও বুঝতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সন্তানের দায়িত্ব সব থেকে বেশি। বিশেষ করে পিতামাতা যখন বৃদ্ধ হন। মানুষকে আল্লাহ্ শিশু বানান, এরপর শক্তিশালী হয়, এরপর আবার শিশু হয়ে যায়। এই যে আমাদের পিতামাতা যখন পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন-ষাট পার হয়ে যান, তখন আবার শিশু হয়ে যান। তাদের আর নতুন করে বুঝ দেওয়া যায় না। আমরা তখন শক্তিশালী হই, পিতামাতা তখন দুর্বল হয়ে যান। একজন জওয়ান পিতাকে, জওয়ান মাতাকে যখন তার ছেলে বলে, তুমি কুত্তার বাচ্চা! তখন মা মাইন্ড করে না। কিন্তু একজন পঞ্চান্ন-ষাট আম্মাকে, আব্বাকে যখন চল্লিশ বছরের ছেলে এই কথা বলে বা এর কাছাকাছি,

অনেক সহজ কথা বলে, পিতামাতার অন্তরটা ছোট হয়ে যায়। তারা অনুভব করেন, আমাকে সত্যিই humiliate (মর্যাদাহানী) করা হল। এজন্য আল্লাহ কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

পিতামাতার সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে, বিষয় সেইটা নয়, যদি তোমার পিতামাতা একজন বা দুজন বৃদ্ধ হয়:

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

তাদের কোনো কথায়, তারা মূর্খ তারা অচেতন, তারা বারবার বাজে কথা বলে, একই কথা রিপিট করে, আমি বুঝতে পারছি তাদের কথা অন্যায়, তাদের সামনে অন্যায় কথার কারণে 'উফ' বলে বিরক্তি প্রকাশ করাটাও কঠিন হারাম। কারণ আল্লাহ জানেন যে আমাদের বিবেক অনেক এবং মা-বাবার কথায় ভুল হচ্ছে জেনে আমরা বিবেক দেখাতে যাই। এই ব্যাপারে আল্লাহ নিষেধ করে দিলেন। আপনার আমার করণীয় হল, পিতামাতা বৃদ্ধ হওয়ার পরে তারা অনেক অবিবেচকের মতো কথা বলবেন, খারাপ কথা বলবেন, বাজে কথা বলবেন, অন্যায় কথা বলবেন, অনেক সময় দীনের বাইরের কথাও বলবেন। আমরা নীরবে শুনব, কোনো কথা বলব না। সুযোগ পেলে, সহীহ কথাটা অন্য সময় বলার চেষ্টা করব। আমাদের চেষ্টা করতে হবে, তাদের প্রতি বিরক্তি নয়, অন্যভাবে বলতে হবে। অর্থাৎ তাদের সামনে বিরক্তি প্রকাশ করে কোনো বলা যাবে না, আল্লাহ বলে দিলেন:

وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

খবরদার! রাগ করে কথা বলবে না। আপনার আব্বা আম্মার চোখে পানি আসে কেন? কারণ আপনি হয়তো বলেছেন, 'মা, এইটা ঠিক না, তুমি অন্যায় করছ...', না! আপনি এটা বলবেন

না। আপনি তার কথা মন দিয়ে শুনবেন! আপনার দায়িত্ব হল, তিনি মারলে আপনি চুপ করে থাকবেন। তবে তার অন্যায় কথা execute (বাস্তবায়ন)করবেন না। আপনার মা যদি বলে, তোমার বোনকে এইটা দাও, তোমার ভাইকে এইটা দাও, হয়তো এইটা অন্যায় বলেছে, আপনি জানেন। কিন্তু আপনি চুপ করে থাকবেন। মা-বাবার হুকুমমতো অন্যায় কাজ করা আপনার জন্য জরুরি না। কিন্তু তাদের সামনে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হারাম। তা আপনি নীরবে শুনবেন:

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

তাদের জন্য খুব নম্র কথা বলবেন। বিনয়ের কথা বলবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। এখানে আরেকটা বিষয়, কুরআন কারীমের এই আয়াতের পরে, আল্লাহ একটা কথা বলেছেন, আমি সবসময় চিন্তা করি।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

তোমাদের অন্তরে কী আছে, তা তোমাদের রব জানেন, তোমরা যদি নেককার হও, তাহলে আল্লাহ তাআলা নেককার বান্দাদের জন্য ক্ষমাশীল![১] আমি এই আয়াতটা পড়ে অনুভব করি সবসময়, আল্লাহ আমাদের বলতে চাচ্ছেন, তুমি তোমার আব্বা-আম্মাকে অন্তর দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছ, কিন্তু তারপরও আব্বা-আম্মা ভুল বুঝছে। তুমি চিন্তা কোরো না, কারণ আল্লাহ তোমার অন্তর দেখেছেন। আচরণ দেখেছেন। তুমি আচরণে ভালো থাকো, অন্তর দিয়ে পিতামাতার কল্যাণ চাও, এরপরও পিতামাতা ভুল বুঝতে থাকেন, এটার জন্য তোমার কোনো অসুবিধা নেই। তোমার অন্তর আল্লাহ জানেন, আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। আমি আশা করি, আমরা এইভাবে চেষ্টা করব। আল্লাহ তাওফীক দিন।

১

<u>প্রশ্ন-১৪৬:</u> বেশ কিছুদিন আগে, বাংলাভিশনে মাওলানা বেলায়েত হুসাইন নামে একজন হুযুর বলছিলেন, যারা মা-বাবার কথা অবাধ্যতা করবে, তাদের নামায হবে না, ইবাদত করলে হবে না, কাউকে দান করলেও হবে না– কথাটা কতোটুকু সত্যি?

<u>উত্তর:</u> মা-বাবার অবাধ্য হওয়া কুরআন এবং হাদীসে সন্দেহাতীতভাবে ভয়ঙ্করতম কবীরা গুনাহ ও অপরাধ। এখানে অনেকগুলো দিক রয়েছে। একটা হল, আকবারুল কাবায়ির। রাসূল (ﷺ) ভয়ঙ্করতম কবীরা গুনাহের তালিকায় শিরকের পরেই, মানুষ খুন করার পরেই তৃতীয় বা চতুর্থ নাম্বারে পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার কথা বলেছেন। হুকূকুল ওয়ালিদাইন। দুই নাম্বার কথা হল, হুকূকুল ওয়ালিদাইন বা পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার আরো ভয়ঙ্করতম দিক হল, অন্যান্য অনেক পাপের শাস্তি শুধু আখিরাতে হবে, পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি দুনিয়া এবং আখিরাতে হবে। কিন্তু এর দ্বারা এটা অর্থ নয় যে ওই ব্যক্তির ঈমান-নামায-রোযা কবুল হবে না! কবুল হওয়ার দুটি দিক আছে। একটা হল, একজন ঈমান এনেছেন, নামায পড়েছেন, রোযা রেখেছেন, হজ্জ করেছেন, তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তার ওই ভয়ঙ্কর পাপ এই ইবাদাতের দ্বারা মোচন হবে না। আমরা অনেক সময় মনে করি, পিতামাতার অবাধ্য, তবে আমি হজ্জ করেছি, যাকাত দিয়েছি, অনেক পীর-মাশায়িখের দরবারে গিয়েছি, তাবলীগ করেছি, জামায়াতে ইসলামী করেছি, অনেক কিছু নেকআমল করেছি, এটা মনে হয় কভার হবে। আসলে পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার যে মহাপাপ, এটা কোনো নেকআমল দ্বারা কভার হবে না। তবে কোনো মুমিন যদি ঈমান আনেন, নেকআমল করেন, ওই নেকআমল হবে, ফরয আদায় হয়ে যাবে, তবে তার ওই ভয়ঙ্কর পাপের কোনো রকম কভার হবে না। যতক্ষণ না তিনি পিতামাতার কাছ থেকে পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে নিতে পারেন।

<u>প্রশ্ন-১৪৭</u>: আমাদের ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন যারা আছেন, নামায-রোযা আল্লাহর ইবাদত করতে চায় না। অনেকবার বলি, আদর করে বুঝিয়ে বলি, তারা কিছুই বুঝতে চায় না । বারবার বলতে গেলে মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এখন আমার কী করার আছে?

<u>উত্তর</u>: এটা আপনার একার নয়, অধিকাংশ পরিবারের প্রশ্ন। আমরা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, এটা কেন হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, যারা এখন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের কোঠায় আছি, আমরা একটা মূল্যবোধ নিয়ে বড় হয়েছি। আমরা চাই, অন্তত আমাদের সন্তানেরা নামায পড়ুক, ভালো থাকুক, মদ না খাক, ব্যভিচারে লিপ্ত না হোক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা আমাদের সন্তানের ভেতর এই মূল্যবোধ ঢোকাতে পারি নি। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও আমরা দেখতে পাই, একজন মহিলা বোরকা পরে তার মেয়েকে নিয়ে গেছেন মিডিয়াতে ন্যাংটো করে। দুর্ভাগ্যজনক! ন্যাংটো করে নিয়ে গিয়েছেন। আসলে, তিনি নামায পড়েন, রোযা রাখেন; কিন্তু তার ছেলেকে মেয়েকে সামনে পরীক্ষা (এজন্য) নামায পড়তে দেন না, রোযা রাখতে দেন না বা নামায পড়ার কথা বলেন না। যখন ওই ছেলে, ওই মেয়ে একটু বড় হয়ে যায়, তখন তিনি হয়তো চান তারা নামায পড়ুক, কিন্তু তারা পড়ে না। কারণ তারা তো একটা পর্যায়ে চলে গেছে। আমাদের জীবনকে যদি উপভোগ করতে চাই– অর্থাৎ মৃত্যুর আগের জীবনটা কিন্তু কঠিন হয়ে যায়, চল্লিশ পার হয়ে, পঞ্চাশ পার হয়ে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। আমাদের আশেপাশে যারা আছে, তারা যদি আমাদের মূল্য বোঝে, তাহলে ভালো, নাহলে আমরা কিন্তু মূল্যহীন। আমরা কিন্তু অমূল্য নই। মূল্যহীন হয়ে যাই। আপনি যদি চান আপনার জীবনটা মূল্যবান হোক, অর্থাৎ আপনার আশেপাশে যারা আছে, তারা আপনার মূল্য বুঝুক; তাদেরকে ইসলাম বোঝাতে হবে। আমার দুটো পরামর্শ সবার জন্য যারা

এরকম বিপদে পড়েন নি, তবে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আপনার ছেলেমেয়েদের দুটো জিনিস করবেন, তাদেরকে দীনি ব্যাপারে... রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেমনটা বলেছেন, সাত বছর থেকে নামায, দশ বছর থেকে পর্দা এবং দীনি পরিবেশে রাখা। দ্বিতীয় হল, তাদেরকে সময় দেবেন। আপনারা ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিয়েছেন, স্কুলে আছে, কলেজে আছে; বেড়াচ্ছে বন্ধুদের সাথে। আপনারা আয় করছেন, সামাজিকতা করছেন। এতে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আপনি সাথে রাখুন। তাদেরকে সাত বছরের পর থেকেই সাথে রাখুন। একেবারে সতেরো বছর পর্যন্ত। দেখবেন ছেলেমেয়ে আপনার কথার অবাধ্য হবে না। এবার আপনার কথা বলি। ছেলেমেয়েদের বলতে হবে। আমরা আমাদের আগের ভুলের কারণেই হোক, তাদের কারণেই হোক, তারা যদি নামায না পড়ে... দুই ধরনের মানুষ আছে, এক ধরনের মানুষ যারা আমাদের অধীন ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী যারা আছি, আরেকটা হল, যারা আমাদের অধীন নন। আশেপাশে ভাই-বোন, পিতা-মাতা সকলকে হক কথা বলা ফরয। সুন্দর করে বলতে হবে, অবশ্যই। কিন্তু সে বললে মন খারাপ করবে, আর না বললে আল্লাহ মন খারাপ করবে। এবার আপনি সিদ্ধান্ত নিন, আপনি কাকে মন খারাপ করাবেন। দুই নম্বর কথা, দুনিয়ার মানুষ মন খারাপ করলে, কিচ্ছু আসে-যায় না। কিন্তু আল্লাহ মন খারাপ করলে আমাদের অনেক কিছু আসে-যায়। এইজন্য আমরা ভালো ভাষায়, মিষ্টি ভাষায় বলতেই থাকব যে, ভাই নামায পড়ো। কিন্তু যারা আমাদের অধীন, তারা নামায না পড়লে আমাদের গুনাহ হবে, তাদের প্রতি আমাদের কঠোর হতে হবে, সেই কঠোরতা চূড়ান্ত পর্যায়ের। যদি আপনি মা হন... 'বাবা, আমি তোর ভাত দিতে পারব না, আমাকে মাফ কর, তোর বাবা যদি ভাত দেয় (দিক), আমি তোমাকে আদর করতে পারব না'... চূড়ান্ত কঠোর হতে হবে। আমার এই জীবনে আমার ছেলেমেয়েরা যারা নামায পড়ছে না আমার কথায়, তাদের সাথে আমার দোযখে যেতে

হবে...? আমাকে একাই জান্নাতে যেতে হবে, দুনিয়াতে এই প্র্যাক্টিস শুরু করি। এজন্য আমরা যদি কঠোর হই, আদরের সাথে কঠোর হই। আশা করি, আমাদের ছেলেমেয়েদের যদি সামান্য বুঝ থাকে, তারা ফিরে আসবে। আর আমাদের চূড়ান্ত করণীয় হল যে, আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব, তাদেরকে দাওয়াত দেব, যতক্ষণ তারা আল্লাহর ন্যূনতম পথে না আসবেন, ফরয ইবাদতগুলো না করবেন, নামায না করবে, রোযা না করবে, পর্দা না করবে ততক্ষণ তাদের সাথে সাধারণ সম্পর্ক কখনোই রাখব না। আমরা শাসন করতেই থাকব। আদর করতেই থাকব। কিন্তু স্বাভাবিক সম্পর্ক আনব না। এটা যদি করতে পারি, তাহলে আমরা গুনাহ থেকে মুক্ত হতে পারব। আর আমরা যদি কিছু বললাম, শুনল না, নীরব হয়ে গেলাম। হাদীস শরীফে এর বর্ণনা এসেছে, বনী ইসরাইলের ভেতরে পতন কেন আসল? তারা প্রথমে মানুষের অন্যায় দেখে বলল, পরে যখন অন্যায় continue (নিয়মিত) করে, 'ও ভালো হবে না', তারা তখন তাদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখল, তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া, তাদের সাথে উঠাবসা (করল)। তখন আল্লাহ তাদের উপর গযব দিলেন, তাদের অন্তরকে বিকৃত করে দিলেন। তাদের দুআ আল্লাহ কবুল করা বন্ধ করে দিলেন।

<u>প্রশ্ন-১৪৮:</u> আমার তিনটি সন্তান। তার মধ্যে একটি সন্তান এমন একটা কাজ করেছে যে আমরা সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে গেছি। এখন আমি আমার ওই সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারব?

<u>উত্তর:</u> জি না! শুধুমাত্র ধর্মচ্যুত হলে, কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, কুফরি শিরক বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে আপনি তাকে হিদায়াত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলে তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। বাকি অন্যান্য অপরাধের জন্য ওয়ারিসকে

উত্তরাধিকারীকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বৈধ নয়। আপনার সন্তান ভুল করেছে এজন্য সে ভয়ঙ্কর অপরাধী। পাশাপাশি আমরাও কিছুটা অপরাধী। আমরা সন্তানদের কঠিন সমাজে নিজের হাতে তুলে দিয়েছি। তাদেরকে সবসময়ই কাছে রাখি না, তাদের কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের সময়ে যে কাছে রাখব, সাথে করে মসজিদে নিয়ে যাব, তাদের সাথে বেড়াব, গল্প করব– এগুলো করি না। আমরা ভাবি, তাদের তো স্কুলে দিয়েছি। পরিবেশ পাল্টেছে, আমাদের সন্তানদেরকে যে ঈমান চুরি করে নিয়ে বখাটে বানানোর জন্য সামগ্রিক আগ্রাসন চলছে, আমরা অনুভব করি না। একসময় তারা যখন অনেক খারাপ হয়ে যায় তখন আমরা আফসোস করি। আমরা দুআ করি, আল্লাহ আপনাকে সবর দিক। আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন, আপনার সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করেন, আপনি আপনার ছেলেকে বোঝাবেন। শুধু এইটুকুর জন্য আপনার ছেলেকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না।

প্রশ্ন-১৪৯: আপনাদের চ্যানেলে আমি এই লেখাটা দেখি, 'যে স্ত্রীকে ভালোবাসে, সে মুমিন ভালো'। তাহলে আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, যে বাপ-মার সাথে বেয়াদবি করে, খোঁজ-খবর না নিয়ে, বাপ-মাকে না পরিয়ে, না খাওয়িয়ে, বাপ-মার অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকেই শুধু ভালোবাসে, তাহলেও কি মুমিন?

উত্তর: পাগড়ি পরা, টুপি পরা খুবই ভালো ইবাদত। তবে কেউ লুঙ্গি খুলে টুপি পরে, তাহলে আপনি তাকে যা বলবেন, তাই হবে। পিতামাতার খিদমত করা আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরয ইবাদত। কেউ যদি পিতামাতার সাথে ন্যূনতম খারাপ ব্যবহার করে দুনিয়াতে তার উপর গযব আসবে। আখিরাতে তার জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করবে। পিতামাতার অবাধ্যতা ও দুর্ব্যবহারের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না। এর জন্য দুনিয়াতে খুব দ্রুত শাস্তি দেন। আমরা যখন

বলি, স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে..., আমরা যখন বলি তাহাজ্জুদ পড়তে হবে, এর অর্থ এই নয় যে, ফজরের নামায কাযা করে তাহাজ্জুদ পড়তে হবে। আমরা সবাই পিতামাতার ব্যাপারে সচেতন হই।

প্রশ্ন-১৫০: স্বামী যদি স্ত্রীর গায়ে বিনা কারণে সন্দেহবশত তার বড় বোনের কথায় হাত উঠায়, পরবর্তীতে তার স্ত্রীকে তার বাবার বাড়িতে রেখে আসে। সে তার সাথে কোনো contact (যোগাযোগ) করে না, ত্রিশ দিনের উপরে কথা বলে না। কথা বলতে চাইলেও তার বউয়ের সাথে কথা বলে না। এক্ষেত্রে ইসলাম বোনের অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দেয় নাকি স্ত্রীকে?

উত্তর: এটা নিঃসন্দেহে বর্বরতা। আপনি ইসলামি শরীআতের কথা প্রশ্ন করেছেন। আমি জানি না, আপনার স্বামী আদৌ মুসলিম কেমন, আল্লাহই ভালো জানেন। কারণ, মুসলিম তার স্ত্রীর গায়ে এভাবে হাত তুলতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্ত্রীদেরকে মারতে নিষেধ করেছেন। বিশেষ করে এখানে আমাদের বুঝতে হবে, বোনের হক আছে নিঃসন্দেহে। বোনের সাথে যদি স্ত্রী অন্যায় করে থাকে, প্রথম কথা ননদের সাথে ভাবির ঝগড়াঝাঁটি এটা তাদের ব্যাপার। এক্ষেত্রে উভয়পক্ষের বক্তব্য না শুনে, আমি কাউকে শাসন করতে পারি না। এটা কঠিন হারাম। আপনি শাসন যদি করতেই চান, বুঝাতে চান, ভিন্ন কথা। কিন্তু আপনি শাসন করতে চাইলে উভয়ের বক্তব্য শুনতে হবে, একেবারে পরিপূর্ণভাবে। এইজন্য আমাদের সালাফ সালিহীন, বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশিদীন বলতেন, যদি কেউ এসে তোমাকে বলে যে, এই দেখো, অমুক লোক আমার একটা চোখ তুলে নিয়েছে, চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, তুমি খবরদার, ওই লোকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে না। আগে ওই লোকটাকে ডেকে...। হতে পারে, ও তার দুইটা চোখ তুলে দিয়ে এসেছে। এইজন্য আমাদের এটা বুঝতে হবে, যারা

পারিবারিক দায়িত্বে রয়েছেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ...وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَوَفِي رِوَايَةٍإِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ

সহীহ বুখারির হাদীস, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যদি আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষকে কিছু মানুষের দায়িত্ব দেন, সেটা পরিবারের স্ত্রী, বোন, ভাই, বাবা, মামা, সন্তান ছোট বড় যে কোনো পর্যায়ে; তিনি তাদের ভেতর ইনসাফ না করেন, তাদের ভেতর আদালত কায়িম না করেন, বেইনসাফি করেন, পার্শিয়ালিটি করেন, ওই ব্যক্তি জান্নাতের খুশবুও পাবেন না।[২] এটা রাষ্ট্র থেকে পরিবার সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আপনারা যারা পরিবারের কর্তা রয়েছেন, যতো রাগই হোক, আপনি একতরফা কথা শুনে, সে স্ত্রীর কথায় হোক, বোনের কথায় হোক, আপনারা এটা করবেন না, এটা কঠিন গুনাহের কাজ। দ্বিতীয় বিষয় হল, যদি স্বামী এবং স্ত্রীর সাথে বোনেদের ঝগড়াঝাঁটি হয়, এটার জন্য আপনারা বিচার করতে চান, করবেন, বোঝাতে চান বোঝাবেন, এটার শাস্তি কিন্তু মার না। আপনি অন্যের কথায়, আপনি স্ত্রীর কথায় বোনের অধিকার নষ্ট করেন, এটা যেমন কবীরা গুনাহ, বোনের কথায় স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করাও ঠিক তেমনই কবীরা গুনাহ।

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ

আল্লাহর হুকুম অমান্য করে, কারোর কথাই শোনা যায় না।[৩] এমনকি বাবা-মা যদি বলে, বউকে মারো, বাবা-মার সব কথা শুনতে হয়, কিন্তু অন্যের হক নষ্ট করার কথা শোনা যায় না।

[২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৭১৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৪২

[৩] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২০৬৫৩; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস নং-৯১৪৩

এজন্য এটা কঠিন অন্যায় করেছে আপনার স্বামী নিঃসন্দেহে। আপনার বর্ণনা যদি ঠিক হয়, তাহলে আপনার স্বামী অন্যায় করেছেন। সবচে' বড় অন্যায় স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে রেখে আসা, স্ত্রীর হক নষ্ট করা, তার সাথে যোগাযোগ না রাখা, এটা কঠিন অন্যায় কবীরা গুনাহ।

প্রশ্ন-১৫১: আমি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। আমার যথেষ্ট অর্থসম্পদ আছে। এর মধ্যে আমার ভাই বেরাদারের কোনো হক আছে কিনা? আমি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার সম্পত্তি থেকে যদি না দিই তাহলে গুনাহ হবে কিনা? এটা জানতে চাচ্ছিলাম।

উত্তর: ভাই, প্রথমেই আমি আপনাকে বলি, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

সহীহ বুখারিসহ অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। যদি কেউ চায় যে আল্লাহ তার আয়ু বাড়িয়ে দেন এবং তার রিয্‌কে বরকত দেন, তাহলে তার একমাত্র করণীয়, তার পিতামাতার মাধ্যমে যে আত্মীয়স্বজন, ভাই-বোন বা যতোদূরে যায়, এদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে, এদের সহযোগিতা করা সাধ্যমতো।[৪] পিতামাতা এবং ভাইবোনদের সহযোগিতা, তাদের সেবা, এটা আপনার সর্বোচ্চ নেক আমল। এর মাধ্যমে আল্লাহ আপনার আয়ু বাড়াবেন, বরকত দেবেন। দ্বিতীয়ত, ভাই-বোনের পাশে না দাঁড়িয়ে আপনি যদি অন্য দান করেন..., আমরা জানি, আল্লাহ যাদের প্রাচুর্য দিয়েছেন, অনেকেই দান করেন, তারা বলেন আমার ভাইবোন অতো দীনদার নয়, কিন্তু মাদরাসা ইয়াতীমখানার ওরা তো অনেক দীনদার..., এমনকি উলামায়ে কিরাম বলেছেন, কোনো কোনো সাহাবির

---

[৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-২০৬৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৫৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৬৯৩

কওল (বাণী) রয়েছে, ভাই-বোন আত্মীয়স্বজন যদি নেওয়ার মতো হয়, তাদেরকে না দিয়ে অন্য জায়গায় দিলে আল্লাহ্ কবুল করবেন না। তাদেরকে তো আপনি দেবেন, শুধু দীনদারির জন্য নয়..., দীনদারদের অবশ্যই দেবেন..., পাশাপাশি আত্মীয়তার যে হক, সেটা আপনাকে আদায় করতে হবে। আপনি যদি তাদের বিপদ-আপদে সহযোগিতা করেন, তাদের পাশে দাঁড়ান, ন্যূনতম অধিকার আদায় করেন, তাদের বিয়েশাদির দাওয়াতে যান, আপনার অনুষ্ঠানে তাদের দাওয়াত দেন, অসুখ-বিসুখে দেখতে যান, এর বেশি যদি না দেন, তবে দায়বদ্ধ হবেন না আল্লাহর কাছে। তবে যতোবেশি দেবেন ততোবেশি সাওয়াব হবে। বরকত এবং আয়ু আল্লাহ্ বাড়িয়ে দেবেন। এটা হাদীসের শিক্ষা। কুরআন কারীমে এ ব্যাপারে অনেক বলা হয়েছে। হাদীসেও বারবার বলা হয়েছে। (উপস্থাপক: তাহলে বিষয়টা এমন হচ্ছে যে, আমরা যদি আমাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে যারা দরিদ্র তাদেরকে সহায়তা করি, দেখা গেল আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হল, পাশাপাশি ধনী হিশেবে দরিদ্রকে সাহায্য করার যে সাওয়াব সেটাও পাওয়া যাচ্ছে)। হাদীসে এরকম এসেছে, لَهُ أَجْرَانِ: [তার জন্য দুটি প্রতিদান][৫] আপনি যদি অন্য কোনো তালিবে ইলম গরীবকে সাহায্য করেন, তাহলে আপনি একটা সাওয়াব পাবেন। আর যদি আপনার ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করেন, তাহলে দুটি সাওয়াব পাবেন। একটা হল, 'ছিলা রাহমি'। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার সাওয়াব, আরেকটা দানের সাওয়াব। আপনি আত্মীয়দের কারো উপর রাগ করে, তাদের কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে, তাদেরকে একেবারে না দিয়ে, অন্যদের দেন, তাহলে অন্যদের দেওয়াটা কবুল হবে না বলে উলামায়ে কিরাম বলেছেন, সাহাবিদের থেকে এব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে।

---

[৫] সহীহ বুখারি ২/১১৯

প্রশ্ন-১৫২: আমাদের একটা নিয়ম আছে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতে হয়। এটা তো ইসলামের একটা নিয়ম যে, রাখতেই হবে, না রাখলে গুনাহ হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এমন অনেক আত্মীয় থাকে, দেখা যায় তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে গেলে গুনাহ করতে হয়। এমন পর্যায়ে পড়তে হয় যে, তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখাটাই ভালো হয়। সে দেখা যাচ্ছে আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলে বেড়াচ্ছে, আমি যদি তার সাথে দূরত্ব বজায় রাখি...। আমার কী করণীয়?

উত্তর: বোন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার কথা শুধু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নন, কুরআন কারীমেও গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ বারবার বলেছেন:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ...

[যারা বজায় রাখে ওই সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন... ।][৬]

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ...

[(ফাসিক তারাই যারা...) এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা তারা ছিন্ন করে' (এদের উপরেই লা'নত...][৭]

কাফিরদের চরিত্র হল আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করে, আর মুমিনের চরিত্র হল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা রাখার ন্যূনতম পর্যায়টা আমাদের বুঝতে হবে। সেটা হল, আপনি বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়াবেন। তারা আপনার বাড়িতে আসলে মেহমানদারি করবেন। অসুখ-বিসুখে খোঁজ

---

[৬] সূরা: রা'দ, আয়াত: ২১

[৭] সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৭; সূরা: রা'দ,আয়াত: ২৫

নেবেন। দেখা হলে সালাম-কালাম করবেন। আপনি যে অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দেন, সেই পর্যায়ের সকলের সাথে তাকে দাওয়াত দিতে হবে। তাদের দাওয়াতে আপনি যাবেন। কবুল করবেন। এটা যে কোনো মূল্যে আপনাকে ঠিক রাখতে হবে। যদি এমন হয় যে আপনি তাদের বাড়িতে, গানবাজনার অনুষ্ঠান আছে, বেপর্দা আছে, আপনি যাবেন না। বাকিগুলো আপনি ঠিক রাখবেন। কথা বলবেন, কেমন আছেন, ভালো আছেন। যদি আপনার কোনো ভালো আচরণকে তারা অপব্যাখ্যা করে, আপনার গীবত করে, তাহলে আপনি আরও সাওয়াব বেশি পেলেন, আপনার সাওয়াব বাড়তে লাগল, আপনি রাগ করবেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে একজন সাহাবি এসে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আমার আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখি, তাদের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়াই, তাদের সম্পর্ক রক্ষা করি, কিন্তু তারা আমার পেছনে শত্রুতা করে, আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন যে, মাশাআল্লাহ! তুমি তো খুব ভালো পজিশনে আছ, তুমি যদি এভাবে চলতে পার, তাহলে তুমি জিতে যাবে, তারা হেরে যাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে তাই করা হবে। এজন্য আপনি যদি মনে করেন, তাদের দাওয়াতে গেলে অনুষ্ঠানে গেলে গুনাহ হবে, বেপর্দা চলতে হবে, গানবাজনা শুনতে হবে, গীবতে শরীক হতে হবে, তাহলে যেয়েন না। কিন্তু বাকি সম্পর্ক, খোঁজ-খবর রাখবেন, আপনার বাড়িতে দাওয়াত দেবেন, আসলে মেহমানদারি করবেন! আর আপনার ভালো আচরণের যদি তারা খারাপ ব্যাখ্যা করে, এজন্য আপনি দুশ্চিন্তা করেন না, আপনার এতে সাওয়াব বাড়ছে।

<u>প্রশ্ন-১৫৩:</u> বিসমিল্লাহ বলে গীবত, মিথ্যা কথা... এইগুলো বলা যাবে কিনা? এটার পরিণতি কী হবে?

<u>উত্তরঃ</u> যদি কেউ intentionally (ইচ্ছাকৃত) মিথ্যা বলার জন্য

বিসমিল্লাহ বলে, তাহলে কঠিন গুনাহের কাজ হবে। যারা সুন্নাহ জানতে চান; কোনো কথাবার্তা, আলোচনা-ওয়াযের আগে বিসমিল্লাহ বলা কিন্তু সুন্নাত নয়। আমরা মনে করি বিসমিল্লাহ বলে সব শুরু করতে হয়। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ বলেই শুরু করতে হয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একেক জায়গায় একেক ভাবে বিসমিল্লাহ বলেছেন। কথাবার্তার আগে আল্লাহর নাম নিতে হয়, কী বলে? আলহামদু লিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা করে শুরু করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওয়ায-আলোচনা, বক্তৃতা শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ বলে কিংবা আউযুবিল্লাহ বলে শুরু করতেন না, তিনি শুরু করতেন, আল্লাহর প্রশংসা করে, 'আলহামদু লিল্লাহ'। আমরা যারা একটু সুন্নাহ-সচেতন তারা এভাবে চেষ্টা করব। কেউ যদি বিসমিল্লাহ বলে কথা বলতে যেয়ে কথার ভেতরে মিথ্যা-সত্য মিলিয়ে ফেলেন, মিথ্যার জন্য গুনাহ হবে। কিন্তু বিসমিল্লাহ অভ্যাসমতো বলেছেন, ভালো কাজের শুরু হিশেবে, আশা করি, এজন্য অতিরিক্ত কোনো পাপ হবে না। আর নিজের মিথ্যাকে প্রমাণিত করার জন্যে যদি বিসমিল্লাহ বলে মিথ্যা বলেন, যেমন কুরআন ছুঁয়ে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করেন, তাহলে কঠিন গুনাহ হবে। আল্লাহ হিফাযত করুন। বিসমিল্লাহ তো সবজায়গায় থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ বলে শুরু করা, কথার আগে বিসমিল্লাহ বলা, পড়ার আগে বিসমিল্লাহ বলা, সকল কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলা, আল্লাহর নাম নেওয়া, লেখার আগে আল্লাহর নাম নেওয়া...;অবমূল্যায়ন করা, কেউ কেউ অপব্যবহার করে, কাজেই আমরা বলব না–এ পর্যায়ে আমরা না যাই।

<u>প্রশ্ন-১৫৪:</u> অনেক সময় আমাদের সন্দেহপ্রবণতা সৃষ্টি হয় অন্যের প্রতি। এক্ষেত্রে কী করার আছে?

<u>উত্তর:</u> সন্দেহপ্রবণতা অনেক নোংরা (ব্যাপার)। সন্দেহপ্রবণতা

অত্যন্ত বাজে অসুস্থ রোগ এবং কুরআনে নিষিদ্ধ, হাদীসে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ কুরআন কারীমে বলেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

হে মুমিনরা, তোমরা অধিকাংশ ধারণা পরিত্যাগ করো, কারণ কোনো কোনো ধারণা পাপ।[৮] আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ

খবরদার! খবরদার! ধারণার উপর কখনোই তোমরা নির্ভর করবে না, কারণ ধারণা সন্দেহপ্রবণতা, অনুমাননির্ভর চিন্তা সবচে' বড় মিথ্যা।[৯] এটা কিন্তু শুধু বাইরের লোকের ক্ষেত্রে নয়, স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও এটা মনে রাখতে হবে। আমরা সবাই মানুষ। আমরা সকল মানুষের ক্ষেত্রে, এবং বিশেষ করে, স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রী, স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী, ভাইয়ের ক্ষেত্রে ভাই, ভালো ধারণাটা আমরা পোষণ করব। আমরা ভুল করি কোথায়? স্বামী দাড়ি রাখবেন, স্ত্রী রাজি না; সুন্দর হতে হবে, যুবক হতে হবে। এরপর তার সুন্দর চৌকস স্বামী যখন তার বান্ধবীর সাথে গল্প করে, তখন সন্দেহ করে। স্ত্রী পর্দা করবে, স্বামী রাজি না, তার সৌন্দর্য বন্ধুদের দেখাতে হবে; আমার বউ আসলেই খুব সুন্দরী। কিন্তু তার বন্ধু যখন সুন্দরী বউয়ের সৌন্দর্যকে appreciate (প্রশংসা) করে, হাসি মশকরা করেন, তখন সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে আমরা একটা পাপের সাথে আরেকটা পাপ মিলিয়ে ফেলি। আমরা দীন পালন করব। পাশাপাশি আমার সঙ্গীর ব্যাপারে, সাথির ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করব। ভালো ধারণার নিয়মটা হল, একজনকে দেখছেন মাগরিবের আযান হয়েছে সে নামায না পড়ে চলে যাচ্ছে। আপনি দুটো ধারণা করতে পারেন,

---

[৮] সূরা: হুজুরাত, আয়াত: ১২

[৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৫১৪৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৬৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৯১৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-১৯৮৮

এই ব্যাটা বলে ভালো কথা, কিন্তু নামায জামাআতে পড়ে না। আরেকটা ধারণা করতে পারেন, লোকটা নিশ্চয়ই কোনো বিপদে আছেন। নইলে তো এ নামায কাযা করে যাওয়ার লোক নয়! তো, আমরা মানুষের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করব, এটা স্বামী-স্ত্রী সবার ক্ষেত্রেই। কখনোই সন্দেহের উপরে কোনো খারাপ ধারণা করব না। সন্দেহপ্রবণতা একটা অসুস্থতা এবং একটা পাপ।

<u>প্রশ্ন-১৫৫:</u> অনেক সময় দেখা যায়, একজন আরেকজনকে কথার দ্বারা এমন কষ্ট দেয়, সে মানসিক কষ্ট যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। ইসলামের আলোকে এই বিষয়ে বলবেন, যাতে আমরা সংযত হয়ে কথা বলতে পারি।

<u>উত্তর:</u> দুটো বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কথা দিয়ে কষ্ট দেওয়া কঠিনতম পাপগুলোর একটা। অর্থাৎ আপনার কথা দ্বারা কোনো মানুষ কষ্ট পায়, ব্যাথা পায়, বাজে কথা, কটু কথা, উগ্র কথা– এটা সহজ কিছু নয়; এটা হাদীস শরীফে বারবার কবীরা গুনাহের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

হে রাসূল, আপনি আমার বান্দাদের বলে দেন, তারা যেন এমন কথা বলে, যেটা সর্বোত্তম। কারণ, শয়তান কথার ভেতর দিয়ে অন্তরে ঢুকে শত্রুতা তৈরি করে। শয়তান মানুষের সবচে বড় শত্রু, স্পষ্ট শত্রু।[১০] এমনকি আমরা অনেক সময় অন্যদের সাথে সুন্দর কথা বলি, স্বামী স্ত্রীর সাথে, স্ত্রী স্বামীর সাথে কথা বললে মনে করি, এ তো ঘরের লোক, যেমন তেমন কথা বলি। আল্লাহ কিন্তু এভাবে বলেন নি...;

[১০] সূরা: ইসরা, আয়াত: ৫৩

আমার বান্দাদের বলে দেন, কথা এমনভাবে বলবে যেটা সর্বোত্তম। শুনতে ভালো লাগে, মধুর হয়। কাজেই সুন্দর কথা বলা, এটা আল্লাহর নির্দেশিত ইবাদত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

একটু হাসিমুখে সাক্ষাত করা, কথা বলা, এটাও আল্লাহর দরবারে একটা নেক আমল সাদাকা হিশেবে কবুল হয়ে যাবে।[১১] তাহলে কটু কথা বলা, মানুষকে কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া, এটা একটা কবীরা গুনাহ। সুন্দর কথা বলা, এটা কুরআন-হাদীস নির্দেশিত নেক আমল। কাজেই, আমরা সবাই এটা চেষ্টা করব। তিন নাম্বার কথা হল, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, সুনান আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থের সহীহ হাদীস:

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলনামায় সবচে' ভারী যে আমল লেখা হবে সেটা হল মানুষের সুন্দর আচরণ।[১২] অর্থাৎ সুন্দর কথা বলে। আপনার আচরণে মানুষ কষ্ট পায় না। মানুষের মনটা শান্ত হয়। এই আচরণটার সাওয়াব এতো বেশি।

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

সারারাত তাহাজ্জুদ পড়া, সারাদিন নফল রোযা রাখার যে মর্তবা-দরজা, এই মর্যাদা মানুষ শুধু সুন্দর আচরণের মাধ্যমে লাভ করতে পারে।[১৩] কাজেই আমরা এই এতো সহজ আমল কেন ছেড়ে দেব? এজন্য সবাইকে বলব, আমরা চেষ্টা করি এবং যাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, খারাপ আচরণ– চেষ্টা করেন, আল্লাহ তাওফীক দেবেন। এটা হল আমাদের নিজেদের আচরণ। দ্বিতীয়

---

[১১] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-১৯৫৬; মুসনাদ বাযযার, হাদীস নং-৪০৭০

[১২] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৭৯৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২০০৩

[১৩] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৭৯৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২৫০১৩

দিক হল, অন্যরা যখন খারাপ আচরণ করে, তখন আমরা কী করব? আসলে খারাপ আচরণ সহ্য করার জন্য কিছু বিষয় লাগে। হাদীস শরীফে এসেছে:

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي ضَمْضَمٍ؟

হাদীসটা মুহাদ্দিসরা সহীহ বলেছেন। তোমরা কি আবু দমদমের মতো হতে পার না? সাহাবিরা বললেন, লোকটা আবার কে? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ওই লোকটা প্রতিদিন সকালে বলে যে, আল্লাহ, আমি আমার যে সম্মান-সম্ভ্রম, আমার যে ব্যক্তিত্ব-পার্সোনালিটি, এটা আপনার বান্দাদের জন্য বিতরণ করে দিলাম। কেউ যদি আমাকে গালি দেয়, কেউ যদি আমার সাথে খারাপ আচরণ করে, আমি অ্যাডভান্স তাদেরকে মাফ করে দিলাম।[১৪] তো হৃদয়কে প্রশস্ত করা, মানুষ কষ্ট দিলে যতো দ্রুত সম্ভব তার জন্য দুআ করতে শুরু করা, তাকে মাফ করে দেওয়া, এগুলো অত্যন্ত ভালো ইবাদত। নিজের মন যেমন প্রশস্ত হয়, আল্লাহ মনের উদারতার কারণে সাওয়াব বাড়িয়ে দেন। আর হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এজন্য কেউ যদি আপনাকে কষ্ট দিয়ে ফেলে, দ্রুত সেটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। মন থেকে আসবে..., যখনই আসবে, তখনই ওই ব্যক্তির জন্য দুআ করার চেষ্টা করেন। যখন শয়তান দেখবে যে আমি ওকে দিয়ে গুনাহ করাতে চাচ্ছি, ও আরো দুআ করছে। তখন আস্তে আস্তে চলে যাবে। দরূদ শরীফ পড়েন। এভাবে হৃদয়কে প্রশস্ত করেন। ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে প্রশস্ততা এসে যাবে।

<u>প্রশ্ন-১৫৬:</u> আমি অনেকদিন আগে, না বলে একজনের কাছ থেকে একটা জিনিস নিয়েছি, উনি জানতেন না। পরে বুঝতে পারলাম, না বলে নেওয়াটা ঠিক হয় নি। এখন আমি কী করতে পারি? তাকে যদি না জানিয়ে জিনিসটা দিয়ে আসি, তাহলে হবে?

[১৪] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৮৮৬, ৪৮৮৭

উত্তর: যদি সম্ভব হয় তাহলে না বলেই রেখে আসবেন, যে উনি পেয়ে যাবেন– তাহলেই হবে, ইনশাআল্লাহ। আর যদি ক্ষমা চেয়ে নিতে পারেন, তাহলে আরো ভালো হয়।

প্রশ্ন-১৫৭: আমাদের সমাজে ছিঁচকে চোরদের ধরা, মসজিদ বা আশপাশ থেকে টাকা চুরি করল, ঘড়ি নিয়ে গেল, যখন ধরা পড়ে, তখন এমনভাবে পেটানো হয়, যেটা আমাদের দেখতে খুবই খারাপ লাগে। এটাকে ইসলাম কীভাবে মূল্যায়ন করে? এতো নির্মমভাবে যে তাদেরকে পেটানো হয়, এটা ঠিক কিনা?

উত্তর: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের সমাজের দুটি পরস্পরবিরোধী চিত্র রয়েছে। আমরা যে কোনো ছোট খাটো অপরাধীকে ধরতে পারলে...; বড় অপরাধীদের আমরা চিনি, তাদের কাছে আমরা যাই না...; ছোট খাটো অপরাধীকে গণপিটুনি দিতে শুরু করি। আর নিশ্চিত অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে, তাকে যে কোনো রকমের শাস্তি দেওয়া ইসলামে অবৈধ-হারাম। এমনকি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একাধিক হাদীসে বলেছেন, যদি দেখ কোথাও কাউকে হত্যা করা হচ্ছে, গণপিটুনি দেওয়া হচ্ছে, যুলুম করা হচ্ছে, বিনা বিচারে মারা হচ্ছে, তুমি হয় সেটা বন্ধ করবে, নতুবা সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। কারণ আল্লাহর লানত ওখানে অবতীর্ণ হয়। যারা একটা মানুষকে বিনা বিচারে আঘাত করছে, শাস্তি দিচ্ছে বা হত্যা করছে তাদের উপর আল্লাহর লানত নাযিল হয়। এবং তোমাকেও ওই লানত স্পর্শ করবে। আমরা, যে কোনো অপরাধী, যতো বড় অপরাধীই হোক, শাস্তি হাতে তুলে নিতে পারি না। এক্ষেত্রে দুটো বিষয় রয়েছে, একটা হল, আমাদের সমাজে, আমাদের রাষ্ট্রে, আইন এবং আইন প্রয়োগের যে দুর্বলতা, এটা অনেক সময় মানুষকে আইন হাতে তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা দেখেছি, রাস্তার পাশে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে,

ড্রাইভারকে মেরে পিটিয়ে শেষ করে ফেলা হচ্ছে। কেন? জনগণ জানে যে, এই ড্রাইভার, যদি আমরা নিজের হাতে শাস্তি তুলে না নিই, থানায় ঢুকলে আইনে কোনো শাস্তি হবে না। কাজেই আমরা যা পারি করি। অথচ অনেক দেশে, আমি সৌদি আরব থাকা অবস্থায় দেখেছি, একজন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে পাশে দাঁড়িয়ে গেছে, মরে গেছে, কিন্তু গাড়িওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। তারা এসেছে, আইনে গেছে, কারণ সে জানে, আমি কঠিন অপরাধ করেছি। আমি আইন চাই, আইনের মাধ্যমে পাপ ক্ষমা করাতে চাই। আমি দিয়াত প্রদান করব। আইনটা পালন করে পাপ ক্ষমা করব। কেউ আইন হাতে তুলে নিচ্ছে না, কারণ সবাই জানে এখানে ন্যায়বিচার হবে। যেটা ঘটেছে অনিচ্ছাকৃতভাবে, এর ন্যায় বিচার হবে। আমরা যদি অন্তত এইসব ক্ষেত্রে আইনটা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারতাম, তাহলে গণপিটুনি বন্ধ হয়ে যেত। পাশাপাশি আমি আমার দর্শকদের অনুরোধ করব। আল্লাহর ওয়াস্তে, কখনো আইন হাতে তুলে নেবেন না। যতো বড় অপরাধীই হোক, তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে কোর্টের সামনে। তারপর তার অপরাধের শাস্তি কী, শরীআহ অথবা আইন নির্ধারণ করবে। আমি আপনি আইন হাতে তুলে নিলে আমাদের গুনাহ হবে। আমরা কোথাও এভাবে আইন হাতে তুলে নিতে পারি না! যদি কোথাও গণপিটুনি হয়... মসজিদে জুতো চুরি করেছে, আপনি পিটাচ্ছেন...। মসজিদের লাখলাখ টাকা মেরে দিচ্ছে, কিছুই বলতে পারি না। আল্লাহ তাআলার কাছে– ওই গরীব মানুষটা চুরি করেছিল, সে কিছু বলতে পারল না– আল্লাহ তাআলা আমাদের এই আইন হাতে তুলে নেওয়ার জন্য শাস্তি দেবেন। দুনিয়াতে আল্লাহর গযব-লানত আসবে, আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ হিফাযত করুন।

সুদ/ঘুষ/ব্যাংকিং

প্রশ্ন-১৫৮: আমি এক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। সেই প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের অন্য একটা প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সফার করা হয়েছে। সেখান থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠান সার্ভিস বিল নেয়। সেই প্রতিষ্ঠানটা সুদের। সেই প্রতিষ্ঠানে আমার চাকরি করা বৈধ হবে কিনা?

উত্তর: আপনি যে কোম্পানিতে চাকরি করেন, তারা যদি এমন প্রতিষ্ঠানে পাঠায়, যেখানে আপনাকে সুদ লিখতে হয়, সুদের সাক্ষ্য দিতে হয় বা সুদের সঙ্গে জড়িত হতে হয়, তাহলে আপনার ওই কর্ম বৈধ নয়। আপনার মূল চাকরি বৈধ। আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানকে বলবেন যে, আপনাকে এমন প্রতিষ্ঠানে দিক, যেখানে আপনাকে হারাম কোনো কাজে শরীক হতে হয় না। আর যদি এমন প্রতিষ্ঠান হয়, যেখানে সুদ আছে, কিন্তু আপনার কাজটা সুদের নয়, যেমন ব্যাংক সুদের লেনদেন করে, সুদ হারাম। ব্যাংকের সিকিউরিটি, অন্যান্য বৈধ কাজ আছে, সেগুলোতে যদি আপনাকে দেওয়া হয়, তাহলে আশা করা যায়, মূল একটা বৈধ কাজে লিপ্ত আছেন; আশা করা যায়, আপনার কর্ম অবৈধ নয়।

প্রশ্ন-১৫৯: আমি বন্ধকি অর্থাৎ সুদের ব্যবসায় চাকরি করি। এটা ছাড়া অন্য চাকরি করেছি, অল্প বেতন, চলতে অসুবিধা হয়। এখন আমি এইখানে শ্রম দিচ্ছি, আমার বেতন ছাড়া অন্য কোনো পয়সা ধরি না। এতে কি আমার কোনো অসুবিধা হবে? এখানে আমি ম্যানেজারি করি। শ্রম দেব, অর্থ পাব।

উত্তর: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

لَعَنَ اللّٰهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

যে ব্যক্তি সুদ খায়, যে ব্যক্তি সুদ দেয়, যে ব্যক্তি সুদের বিষয়ে লেখালেখি করে এবং সুদের সাক্ষী হয় যারা, সবাইকে আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দিয়েছেন।[১] আপনি ম্যানেজার মানেই আপনি সুদের লেখালেখিতে অবশ্যই জড়িত। ফরম দেন, তারা লিখে দেয়, আপনি সই করেন। সুদের লেখালেখিতে আপনি জড়িত, সুদ গ্রহণ এবং দেয়ায়। এটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছেন, সুদ গ্রহণ এবং দেয়ার লেখালেখিতে জড়িতরাও অভিশপ্ত হন।[২] দ্বিতীয় কথা ভাই, আপনি যদি সুদের পাপকে, যে পাপকে ব্যভিচারের চাইতেও কঠিন বলা হয়েছে..., আপনি কল্পনা করুন, মানুষেরা ব্যভিচার করছে আপনার সামনে, আপনি এগিয়ে দিচ্ছেন, 'আপনি যান আপনি যান', মানুষেরা মদ পান করছে, খুন করছে, আপনি শুধু খুন করছেন না, যে খুন করছে তার সহযোগিতা করছেন; আপনি এটা করবেন কিনা? খুন করা ব্যভিচার করা যেমন পাপ, সুদ খাওয়া কুরআন-সুন্নাহতে এরচেয়ে বড় পাপ বলা হয়েছে। যদিও খুনকে সবচে' কঠিন বলা হয়েছে, ব্যভিচারের চেয়ে সুদকে অনেক সময় বেশি বড় পাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। আপনি কী করে, আপনার যদি ঈমান থাকে আপনি এই পাপের সাথে বসে থাকবেন, দেখবেন, শোনাবেন? এটা আমাদের ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক! আমি আপনাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলব না, আমি এইটুকু বুঝি, আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যদি কেউ আল্লাহকে ভয় করে, যে না! আমি হারাম করব না, আমি হারাম থেকে যেভাবেই হোক আত্মরক্ষা করব; আল্লাহ দুইটা জিনিস বলেছেন, আল্লাহ তার জন্য একটা পথ বের করে দেন, তার কল্পনার বাইরে আল্লাহ তাআলা তাকে রিয্ক দান

---

[১] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৩৮০৯
[২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৫৯৮

করেন।[৩] আমার জানামতে, সৌদি আরবের অধিকাংশ ব্যাংক সুদভিত্তিক! ডাচ ব্যাংকে এক লোক চাকরি করতেন। সৌদি আরবের আলিমরা সবাই বলেন, সুদভিত্তিক ব্যাংকে চাকরি করা হারাম। সে ব্যক্তির ভেতরে তাকওয়া আসল, সে ব্যক্তি আমাদের ওই সময়ে প্রায় বিশহাজার রিয়াল বেতন পেতেন। সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি মাত্র তিন-চার হাজার রিয়ালে চাকরি করতে শুরু করলেন, অন্য একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। বেশ কষ্ট হত, তারপরও তিনি নিজেকে আনন্দিত মনে করতেন। ভাই, আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করেন, আল্লাহ, আমি হারামের ভেতরে থাকব না। এবং নিয়তকে দৃঢ় করেন। আশা করি, আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করে দেবেন।

<u>প্রশ্ন-১৬০:</u> আমার একভাই সুদের টাকা নেওয়া-দেওয়া করে। আমি একটা ভালো ব্যবসার জন্য ভাইয়ের থেকে কিছু টাকা ধার নেব। ওটা সুদের টাকা, আমি জানি। ওই টাকা নিয়ে আমি কি ভালো কাজে লাগাতে পারব? ধার নেব, ভাইকে আবার পরে দিয়ে দেব। এটা কি নেওয়া যাবে?

<u>উত্তর:</u> সুদ যিনি গ্রহণ করেন, তার সাথে সামাজিক লেনদেন না করাই ভালো। অর্থাৎ তার সাথে খাওয়া-দাওয়া সামাজিকতা...। ভাইবোন যেহেতু রক্তের সম্পর্ক। সে বিপদে পড়লে দেখতে যাবেন, এগুলো চলবে। কিন্তু তাকে বাড়িতে দাওয়াত করে খাওয়ানো, তাকে সম্মান করা– এগুলো বেশ বিপজ্জনক বিষয়। তবে সাধারণভাবে, আপনি ঋণ নিতে পারেন। একজন সুদখোর বা হালাল-হারাম ইনকাম আছে, আপনি ঋণ নেবেন, আবার তাকে ফেরত দেবেন। এইরকম ঋণ আপনি একজন সুদখোরের কাছ থেকে নিলে মূলত শরীআতে অসুবিধা নেই।

---

[৩] সূরা: তালাক, আয়াত: ২-৩

<u>প্রশ্ন-১৬১:</u> আমি একজন চাকরিজীবী। আমার চাকরির বয়স বিশবছর। আমি চাকরিজীবনের প্রথমে একটু পয়সা খেয়েছিলাম, এখন আর খাই না। এখন আমি একটা প্লট পেয়েছি, এখন ঝামেলা হচ্ছে, কোথাও ঘুষ দিতে হচ্ছে, এখন যে পরিমাণ ঘুষ দিতে হবে তাও দিতে পারছি না। এখন আমার চাকরির শেষ পর্যায়, আমার যে ক্ষতি হল, এটা কি এটা দিয়ে মেকআপ হবে?

<u>উত্তর:</u> প্রথমেই ভাই, আপনাকে কংগ্রাচুলেট করি, মোবারকবাদ দিই যে, আপনার ভেতরে পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একটা চেতনা এসেছে। এটাকে লালন করেন, বৃদ্ধি করেন, শক্তিশালী করেন। আপনিও অনুভব করছেন, চাকরির শেষে এসে, জীবন কোনো না কোনোভাবে শেষ হয়ে যাবে। শেষ জীবনে আল্লাহর রহমত বরকত অনুভব করা এবং পরবর্তী জীবনে শান্তি পাওয়ার জন্য আমাদের হারাম বর্জন করা অতীব জরুরি। দ্বিতীয় যে বিষয়টা, সেটা হল, জি না! আপনি যদি কাউকে যুলুম করেন, আর অন্য আরেকজন যদি যুলুম করে; অন্যের যুলুমের জন্য আপনার যুলুম ক্ষমা হয় না। সাধারণভাবে বান্দা যখন মাযলুম হন, কারোর মাধ্যমে, তখন তার সাধারণ গুনাহগুলো ক্ষমা হতে পারে; দুনিয়ার কষ্ট, বিপদ-আপদের কারণে আমাদের সাধারণ পাপ ক্ষমা হয়। তবে আপনি particular (বিশেষ) কোনো ব্যক্তিকে যুলুম করেছেন, তার কাছ থেকে অন্যায়ভাবে টাকা নিয়েছেন, অবৈধ উপার্জন করেছেন, এই পাপগুলো এভাবে ক্ষমা হয় না। আপনি হয়তো মদ খেয়েছিলেন, আপনি হয়তো ধূমপান করেছিলেন, এই ধরনের পাপগুলো বিপদ-আপদ, কষ্টের জন্য ক্ষমা হতে পারে। কাজেই প্রথম জীবনে অবৈধভাবে কিছু টাকা আপনার কাছে এসেছিল, শেষ জীবনে আপনার উপরে যুলুম করে কিছু হালাল উপার্জন থেকে বৈধ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, এটা প্লাস মাইনাস কখনোই হবে না। আপনার এই শেষ জীবনে কষ্টের কারণে সাধারণ গুনাহ ক্ষমা হতে পারে। আপনি প্রথম জীবনের

গুনাহের ক্ষমার জন্য যেটা করবেন, তাওবার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিশেবে, আপনি কতো টাকা অবৈধ গ্রহণ করেছিলেন, সাধারণভাবে estimate (বিচার) করবেন। সেই যুগেরই হোক, যে, একলক্ষ টাকা আমি অবৈধ গ্রহণ করেছিলাম, আপনি এই টাকাটা যেহেতু এই ধরনের ক্ষেত্রে যারা পাওনাদার, যাদের থেকে নিয়েছিলেন, তাদের ফিরিয়ে দিতে পারবেন না; তাদের নামে সাদাকা-দান হিশেবে কোথাও দিয়ে দিতে হবে, আপনার বর্তমান অ্যাকাউন্ট থেকে, বর্তমান সম্পদ থেকে। আপনি এখন বলবেন, আমি এখন রিটায়ারমেন্টের সময়, কীভাবে চলব? এত্ত টাকা! যদি এটুকু আপনি বের করতে না পারেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনার মনে তাওবা আসে নি, আপনি তাওবা করতে পারেন নি। তাওবার শর্ত হল, পাপের উপর প্রচণ্ড অনুতপ্ত হওয়া। এই অনুতপ্ত পুরোপুরি হলেই আপনি পারবেন। কারণ জীবনটা খুব কঠিনও নয়, সহজও নয়। আপনার দুইলাখ টাকা লুট হয়ে গেলে চলবে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা হয়ে চলে যাবে, কাজেই তাওবার অনুতাপ যখন হৃদয়কে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করবে, আপনি পারবেন। আর এটা ছাড়া আপনার এই পাপের তাওবা হবে না। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণ তাওবা করার তাওফীক দান করুন।

<u>প্রশ্ন-১৬২:</u> আমি আমাদের মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি। আমাদের মসজিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে একটা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে। আমরা বছর শেষে দেখলাম যে, একটা ভালো অঙ্কের ইন্টারেস্ট জমা হয়েছে। এখন আমরা ওই টাকা দিয়ে কী করব, সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। অনেকের পরামর্শ কবরস্থানে একটা রাস্তা হচ্ছে, ওখানে দান করতে। কেউ কেউ বলছেন, আমাদের এলাকায় একটা ড্রেন হচ্ছে, ওইখানে দিতে। আপনাদের মতামত জানতে চাই।

<u>উত্তরঃ</u> আলহামদু লিল্লাহ! আপনারা আমাদের পরামর্শ চেয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা জানার তাওফীক দেন। প্রথমেই আমি অনুরোধ করব, মসজিদের টাকা সুদভিত্তিক কোনো ব্যাংকে না রেখে, সুদমুক্ত ব্যাংকে রাখার চেষ্টা করেন। আমাদের সমাজে অনেক সময় সুদকে বৈধতা দেবার জন্য, এরকম বলি যে, 'সব তো একই রকম, ওই তো পার্সেন্টেজ করছে'। কোনটা কীরকম, সেটা আমি আপনি বললে হবে না। একটা মুরগি 'বিসমিল্লাহ' বলে যবাই করলে, বিসমিল্লাহ না বলে যবাই করলে এবং মাথাটা বাড়ি মেরে ফাটিয়ে ফেললে, একইরকম হয়; মরে যায়। কিন্তু শরীআতের বিচারে তিনটা মুরগি একরকম না। আকাশ আর পাতালের পার্থক্য থাকে। এইজন্য ইসলামি শরীআহ, আমাদের দেশে প্রচলিত ইসলামি নামধারী ব্যাংকগুলো ষোলোআনা ইসলামি নয়। তবে এতোটুকু যে, তারা সুদমুক্ত থাকার চেষ্টা করে। ইসলামের আরো অনেক দিক রয়েছে। যেহেতু মসজিদ, এজন্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের চেয়ে যে কোনো একটা ইসলামি ব্যাংকে রাখার চেষ্টা করব। আমরা অনেক সময় মনে করি, 'ইসলামী ব্যাংক' তো পুরোপুরি ইসলামি নয়; হতে পারে। প্রত্যেকেরেই কিছু দোষ ত্রুটি থাকবেই। যেহেতু পুরো অর্থ ব্যবস্থা ইসলামি নয়। আপনি ইংল্যান্ডে গেলেন, আপনি দেখলেন একটা হোটেলে শুয়োর রান্না হয়েছে, আরেকটা হোটেলে শুয়োরও রান্না হয়েছে, গরুও রান্না হয়েছে। একজন আপনাকে বলল, গরুর গোশতের ভেতরে অনেক সময় শুয়োরের মাংসের ঝোল মিশে যায়। তো আপনি এখন কী করবেন? হয় কিছুই খাবেন না, অথবা গরুটা খাবেন। যেহেতু গরুর গোশতে কিছুটা শুয়োরের ঝোল মেশে, সুতরাং আমি গরু বাদ দিয়ে শুয়োরই খাই!! এটা তো আপনার ঈমানের দাবি হতে পারে না। দ্বিতীয় কথা হল, ইন্টারেস্ট দেওয়াও হারাম, গ্রহণ করাও হারাম। আপনারা একটা হারামের গুনাহে লিপ্ত হয়েছেন। এখন এটা থেকে বাঁচার নিয়তে যদি ড্রেনেজে ব্যবহার করতে চান, করতে

পারেন। তবে এটা স্থায়ী না করে, টাকাটা যেন মসজিদ পায় এজন্য শরীআহভিত্তিক কোনো ব্যাংকে রাখেন। টাকাটা পরবর্তীতে মসজিদের কল্যাণে ব্যয় করা যাবে। দুটোর যে কোনো একটা করতে পারেন। মসজিদ সংলগ্ন যদি ড্রেনেজ থাকে বা রাস্তা– এগুলোতে ব্যয় করতে পারেন।

প্রশ্ন-১৬৩: আমি জানতে চাচ্ছি, এখন আমাদের বাংলাদেশে অনেকগুলো কোম্পানি এসেছে, এরা দশ মাসে ডবল টাকা দিচ্ছে, এক লক্ষ টাকা দিলে দুই লক্ষ টাকা দিচ্ছে। এটা কি আসলেই সুদ হবে নাকি কী হবে?

উত্তর: প্রথম কথা হল, এক বছরে ডবল দেবে, এরা কখনোই কোনো প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি হয় না সাধারণত। আর আপনি যেভাবে বলেছেন, এটা অবশ্যই সুদ। তারা কীভাবে লেনদেন করেন, বিস্তারিত না জেনে আমরা বলতে পারব না। তবে আপনি যেভাবে বলেছেন, এতে সুদ হবে।

উলূমুল হাদীস

<u>প্রশ্ন-১৬৪:</u> ইমাম বুখারির বুখারি শরীফকে বেশি (সম্মান) করি হাদীস হিসেবে। আমাদের ভেতরে তর্ক হয়েছে, ইমাম বুখারিকে কেন মানব, তিনিও তো মানুষ, তারও তো ভুল হতে পারে, এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, এটা হচ্ছে নামাযের কাতার সোজা করা নিয়ে কথা উঠেছিল...

<u>উত্তর:</u> আমরা বুঝতে মারাত্মক রকমের ভুল করেছি। আমরা কখনোই ইমাম বুখারিকে মানি না। আমরা মানি একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে। এখানে বিষয়টা হল, ইমাম বুখারিসহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীসগুলো সঙ্কলন করেছেন অনেক মুহাদ্দিস। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীস বণর্নার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম সনদ প্রবর্তন করেন। কার কাছ শুনেছে না বললে তারা হাদীস শুনতেন না। এই সনদ-রেফারেন্স পৎড়ংং বীধসরহব (তুলনামূলক নিরীক্ষা) এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ-দুর্বল বর্ণনা, ভুল আছে কিনা, এটা নির্ণয় করে সহীহ-যয়ীফ হাদীস নির্ণয় করা হয়। ইমাম বুখারি বলতে গেলে প্রথম ব্যক্তি, শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করেছেন। এর আগে ইমাম মালিকও চেষ্টা করেছেন। মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ মুহাদ্দিস, তাঁরা হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে সহীহ-যয়ীফ (সঙ্কলন করেছেন)। শুধু সহীহ সঙ্কলন করবেন, এমন সিদ্ধান্ত নেন নি। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল, উদ্দেশ্য ছিল, মানহাজ ছিল, পদ্ধতি ছিল, সহীহ-যয়ীফ-বানোয়াট সকল হাদীস একত্রিত করা, পরে যেন মুহাদ্দিসরা এগুলো থেকে বাছাই করে নিতে পারে। যেমন মুসনাদ আহমাদে (প্রায়) ত্রিশ হাজারের বেশি হাদীস রয়েছে। ইমাম আহমাদ কখনোই বলেন নি, আমি শুধু সহীহ হাদীস সঙ্কলন করব। সনদসহ সকল হাদীস সঙ্কলন করেছেন, এর মধ্যে সহীহ আছে, যয়ীফ আছে। ইমাম

আহমাদের আগে-পরে, ইমাম বুখারির আগে-পরে অনেকেই হাদীস সঙ্কলন করেছেন, শুধু সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেন নি। ইমাম বুখারি সর্বপ্রথম সফল হন। তিনি বলেন, আমি সহীহ ছাড়া সঙ্কলন করব না। ইমাম বুখারির কথাকে কেউ গ্রহণ করেন নি। তাঁর সঙ্কলিত হাদীসকে পরবর্তী তিনশ বছর ধরে মুহাদ্দিসরা প্রতিটি হাদীসের সনদ cross (তুলনা) করেছেন, অন্যান্য সনদের সাথে মিলিয়েছেন। (এভাবে) তারা নিশ্চিত হয়েছেন, বুখারির হাদীসগুলো বিভিন্ন সনদে সহীহ। কাজেই, আমরা ইমাম বুখারিকে কখনোই মানি না। ইমাম বুখারির আরো অনেক বই আছে, যেসব বইয়ে উনি সহীহ-যয়ীফ বাছাই করেন নি। ওগুলোর হাদীস আমরা গ্রহণ করি না। বাছাই করার পরে করি। যেমন আল আদাবুল মুফরাদ, তারীখে বুখারা, তারীখুল কাবীর, তারীখুস সাগীর ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ আছে। সহীহ বুখারির হাদীসগুলো উনি যাচাই করে সঙ্কলন করেছেন। পরবর্তীতে (মুহাদ্দিসরা) অনেক যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হয়েছেন, এই গ্রন্থের হাদীসগুলো সহীহ। এজন্য আমরা সহীহ হাদীস মানি। ইমাম বুখারিকে নয়। আমার নিজের লেখা একাধিক বই আছে এই ব্যাপারে, হাদীসের নামে জালিয়াতি। হাদীসের তত্ত্ব, হাদীস সংকলনের ইতিহাস নূর মুহাম্মাদ আযমি, মাওলানা আব্দুর রহীম। আপনারা এগুলো পড়লে আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন। কাতার সোজা করার ব্যাপারে কী হয়েছে তা আমাদের সম্মানিত দর্শক বলেন নি। কাতার সোজা করার কথা ইমাম বুখারি কিছুই বলেন নি। কাতার সোজা করা, কাতারের মাঝের ফাঁক পূরণ করা, গায়ে গায়ে দাড়ানো, কাতারে ফাঁক হলে সরে গিয়ে পূরণ করা এগুলোর ব্যাপারে অগণিত সহীহ হাদীস রয়েছে।

<u>প্রশ্ন-১৬৫:</u> রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে যদি সৃষ্টি করা না হত, তাহলে কিছুই সৃষ্টি করা হত না। এবং উনার নূর থেকেই সমস্ত সৃষ্টিকে

সৃষ্টি করা হয়েছে, এটা কি সঠিক?

<u>উত্তর:</u> আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা ইসলামকে উপর থেকে নিই নি। কুরআন কারীমে যে কথা কোথাও নেই, এই যে বিশাল হাদীস ভাণ্ডার, সিহাহ সিত্তাহসহ মুসনাদ আহমাদের পঞ্চাশ হাজার হাদীসের ভাণ্ডারে যে হাদীস কোথাও নেই। যে হাদীস কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না, সেগুলো আমরা এমনভাবে বলি, যেটা দীনের ভিত্তি হয়ে গিয়েছে। আর কুরআনে যা আছে হাদীসে যা আছে, এগুলো নিয়ে কেউ আমরা কথা বলি না। আরও দুর্ভাগ্য হল, আজ ইসলামে মুসলিমরা যে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, সেটা কীসের? কোথাও 'লাওলাকা' নিয়ে, কোথাও নূর নিয়ে। কিন্তু ফরয-ওয়াজিব নিয়ে, ওযনে কম দেওয়া হচ্ছে, যুলুম করা হচ্ছে, অন্যায় বিচার করা হচ্ছে, স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করা হচ্ছে, প্রতিবেশীর অধিকার নষ্ট করা হচ্ছে, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে– এগুলো যে দীন, তা উম্মত বোঝে না এখন। আমরা বিভিন্নভাবে জনগণের ভেতরে যখন বলি– স্ত্রীর মোহর না দিলে কঠিন অন্যায় হবে, বোনের সম্পত্তি দেওয়া হয় নি, বাপ মারা গেছে, জীবন চলে গেছে, বোনেরা সম্পত্তি পায় নি, ইয়াতীম ভায়ের সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে– এগুলো নিয়ে আমরা মোটেই কথা বলি না। কুরআন কারীমের দুটো পাঁচটা পৃষ্ঠা উল্টালেই আমরা দেখতে পাই, বান্দার হকের কথা, কোথাও পড়শির হকের কথা, কোথাও ওযন ঠিকমতো দেওয়ার কথা, কোথাও পিতামাতার অধিকারের কথা, ন্যায়বিচার করার কথা, গীবত না করার কথা, মানুষের বিরুদ্ধে আন্দাযে কথা না বলার কথা, সুদ না খাওয়ার কথা, ওযনে কম না দেওয়ার কথা। কুরআনের এমন কোনো পারা নেই যেখানে এই আলোচনা নেই। অথচ আমাদের সারা বছরের যতো ওয়ায আছে, আলোচনা আছে, খুতবা আছে এবং আমাদের যতো মতভেদ আছে, কোথাও এগুলো নেই! ওই লোকটা অন্যায় বিচার করে, পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার

করে, কাজেই ওই লোকটা আমার বাইরের দল, এটা আমরা চিন্তা করি না। কিন্তু ওই লোকটা নূর বলেছে না বলে নি, এটা নিয়ে ঝগড়া করি। আর দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য, আল্লাহ ভালো জানেন। যে নূর এবং রাসূল সৃষ্টি না হলে দুনিয়া সৃষ্টি হত না, এই কথাগুলো আমাদের সুপরিচিত কোনো হাদীসের গ্রন্থে নেই। যেটা আছে, সেটা বলব। لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ : আপনি না হলে এই সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করতাম না। এই মর্মে যে কথাটা প্রচলিত, সেটা ভিত্তিহীন, সনদবিহীন কথা। বিশ্বের সকল মুহাদ্দিস একমত যে, এই কথা কোনো সনদে, কোনো গ্রন্থে বর্ণিত হয় নি। ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী, আবু জাফর সিদ্দিকী তাদের লেখা বইয়ে; আল্লামা রুহুল আমীন, আশরাফ আলী থানভি লিখেছেন, মুল্লা আলী কারি লিখেছেন, আব্দুল হাই লাখনবি লিখেছেন, সুয়ুতি লিখেছেন (রাহিমাহুমুল্লাহু আজমাঈন)। এরা সবাই লিখেছেন যে,

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ

আপনি না হলে বিশ্ব সৃষ্টি করতাম না, এই কথাটা ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ, যয়ীফ, জাল– কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তবে এই অর্থে আরও কিছু কথা, কাছাকাছি কথা, অত্যন্ত দুর্বল অথবা কাছাকাছি জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এটা জাল বা ভিত্তিহীন; পঞ্চাশ হাজার হাদীসের যে সংকলন, তার ভেতরে নেই। বিশ্বের কোনো প্রচলিত হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায় না।[১] এগুলো নিয়ে আমরা সারাদিন বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছি। আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

---

[১] সাগানি, আল মাউযূআত ১/৫২; তাহের পাটনি, তাযকিরাতুল মাউযূআত ১/৮৬; মুল্লা আলী, আল মাসনূ' ১/১৫০; আলবানি, সিলসিলা যায়ীফা ১/৪৫০

আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, মহাবিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ।[২] এ থেকে আমরা বলতে পারি, যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্য বিশ্বকে তৈরি করা হয় নি, বিশ্বকে রহমত দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তৈরি করা হয়েছে। কেউ যদি যুক্তি দিয়ে নিজে বলেন, রাসূল সৃষ্টি না হলে দুনিয়া সৃষ্টি হত না, এটা তাদের ব্যক্তিগত বক্তব্য হিশেবে বলেন, যুক্তি তর্ক দিতে পারেন। এটা হাদীসের বক্তব্য নয়। এই মর্মে কোনো সহীহ হাদীস নেই। বড় অবাক লাগে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ফযীলত-মর্যাদার কথা কুরআন রয়েছে, হাজার হাজার হাদীস রয়েছে, সেটার কোনোটায় আমাদের জান ভরে না। এই অদ্ভুত কথাগুলো না হলে মনে হয়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মর্যাদা বোধহয় হল না। কুরআন যে মর্যাদা দিয়েছে রাসূল (ﷺ) কে, সে মর্যাদায় তৃপ্ত হই না। বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদের পঞ্চাশ হাজার হাদীসে রাসূল (ﷺ) এর যে মর্যাদা এসেছে, সেই মর্যাদায় হৃদয় তৃপ্ত হয় না। যে হাদীস কোথাও পাওয়া যায় না, জোর করে খুঁজে বের করে আনতে হয়, এই হাদীস না হলে জান ভরে না, দুর্বল ভিত্তিহীন মিথ্যা হাদীস; এই হৃদয়ের ঈমান কতোটুকু বা নবীপ্রেম কতোটুকু, এটা আমাদের নিজেদের হৃদয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। আল্লাহ কুরআন কারীমে কোথাও বলেন নি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নূরের তৈরি। কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

আমি তোমাদের মতোই মানুষ।[৩]

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

আমি মানুষ রাসূল মাত্র।[৪] হাদীস শরীফে বারংবার এসেছে,

---

[২] সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতঃ ১০৭

[৩] সূরাঃ কাহ্ফ, আয়াতঃ ১১০; সূরাঃ ফুস্‌সিলাত, আয়াতঃ ৬

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

... আমি মানুষ মাত্র।[৫] আর আমরা জানি, মানুষকে আল্লাহ কী দিয়ে তৈরি করেছেন। এর বিপরীতে, সত্যের বিপরীতে কুরআন কারীমে কোথাও বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নূরের তৈরি। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে, কুরআনকে বারবার নূর বলেছেন। একটা আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং কিতাবে মুবীন এসেছে।[৬] কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন, এখানে নূর বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বোঝানো হয়েছে। এটা খুব স্বাভাবিক কথা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে নূর বলা, কুরআনকে নূর বলা খুব স্বাভাবিক। তাদের আলোয় আমরা আলোকিত। কিন্তু কেউ যদি কুরআনকে নূরের তৈরি বলে, সে ঈমানহারা হবে। আলিমরা জানেন, কুরআনকে যদি কেউ মাখলুক বলে, তাহলে ঈমানহারা হয়ে যাবে। ঠিক তেমনই, রাসূল (ﷺ) নূরের তৈরি, এটা কুরআন-হাদীসে নেই। আমাদের সমাজে যে সকল হাদীস বলা হয়– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তারকা ছিলেন, চতুর্থ আসমানে সত্তর হাজার বছর– সম্পূর্ণ বানোয়াট জাল কথা। 'প্রথমে আল্লাহ আমার নূর সৃষ্টি করেছেন', এটাও বানোয়াট জাল কথা। বিশ্বের কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে নেই। কিছু জাল গ্রন্থে ছাড়া। তো এইরকম হাদীসগুলো জাল। এরপরও কোনো কোনো আলিম বলতে পারেন, নূরের তৈরি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন, এটা আমাদের জন্য বিশ্বাস করা ফরয। এটা কুরআনে রয়েছে,

---

[৪] সূরা: ইসরা, আয়াত: ৯৩

[৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-২৪৫৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৭১৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৫৮৩

[৬] সূরা: মায়িদা, আয়াত: ১৫

এটা অস্বীকার করলে কুরআন অস্বীকার করা হয়। পাশাপাশি কেউ যদি বলে, তাঁর ভেতরে নূর ছিল; এটা ব্যক্তিগত অভিমত হতে পারে। এটা কোনো ঈমানের বিষয় নয়। যেহেতু কুরআনে নেই, সে বিষয় ঈমানে আসতে পারে না। মুতাওয়াতির হাদীসে নেই, ঈমানে আসতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা এই বিষয়গুলোকে নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছি। জেনে অথবা না জেনে। ইসলামের যারা শত্রু, মুসলিমদেরকে পশ্চাৎপদে নিতে চান, যারা মুসলিম সমাজে ন্যায় বিচার চান না, মুসলিমদের শিক্ষা চান না, মুসলিমরা আত্মকলহে নিমগ্ন হোক এমনটা চান, জেনে অথবা না জেনে, আমরা তাদেরকে সহায়তা করছি। এর বদলে যদি আমরা কুরআনের দাওয়াতটা দিতাম, মানুষের অধিকারের কথা, সময়ের ব্যবহারের কথা, ইবাদাতের কথা– তাহলে আমরা অনেক ভালো করতে পারতাম।

প্রশ্ন-১৬৬: আমি শুনেছি, আসর থেকে মাগরিবের ভেতরের সময়টা যদি পড়াশোনা করি কিংবা ঘুমাই, তাহলে স্মৃতি শক্তি লোপ পায়! আমি ওই টাইমে পড়াশোনা করি না, কিন্তু আমি একটা স্টুডেন্ট পড়াচ্ছি, আসর থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়টাতে। কথাটা কতটুকু সত্য?

উত্তর: এই কথাটা সম্পূর্ণ শরীআতবিরোধী বানোয়াট এবং আমাদের সমাজে ধার্মিক মানুষদের ভেতরে প্রচলিত কুসংস্কারগুলোর একটা। এই ব্যাপারে একটা জাল হাদীসও প্রচলিত আছে:

مَنْ أَحَبَّ كَرِيمَتَيْهِ فَلا يَكْتُبَنَّ بَعْدَ الْعَصْرِ

যদি কেউ তার চোখ দুটোকে মহব্বত করে, সে যেন আসরের পরে চোখ দুটোকে কাজে না লাগায় [লেখালেখি না করে]।[৭] না!

---

[৭] মুল্লা আলী কারি, আল মাসনূ' ১/১৭৬, হাদীস নং-৩১৫

এটা কোনো হাদীস নয়। মুহাদ্দিসরা সবাই একমত যে এটা সনদবিহীন; সম্পূর্ণ লোকাচারের ভিত্তিতে প্রচলিত একটা কথা। যে কোনো সময় পড়তে পারেন, তবে কম আলোতে পড়লে চোখের ক্ষতি হতে পারে। এটা অন্য বিষয়। আলো-অন্ধকারে পড়লেন, যেখানে আলো জ্বালান নি, অন্ধকার, চোখের ক্ষতি হতে পারে। এটা বিজ্ঞান কোথায় ক্ষতি হয় না হয় বলবে, কোন সময়ে লেখাপড়া করলে ক্ষতি হয়, ঘুমালে ক্ষতি হয়। এটা এভাবে হাদীসে আসে নি। এই বিষয়ে হয় ওহির ইলম লাগবে, নইলে বিজ্ঞানের ইলম লাগবে। আল্লাহ্ তাআলা তাওফীক দান করুন। আসর মাগরিব ফজরের পরে পড়তে কোনো সমস্যা নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে আসরের পরে যখন আমরা পড়ি, বাইরের কম আলোতে পড়লে আপনার চোখের ক্ষতি হল। আলো জ্বেলে ভালো করে পড়বেন। এখানে শরীআতের নিষেধ নেই, এটা খারাপ কিছু নয়।

<u>প্রশ্ন-১৬৭:</u> আমাদের দেশের হুযুররা বলেন, এক ওয়াক্ত নামায কাযা করলে দুইলক্ষ আটাশি হাজার বছর জ্বলতে হবে। এটা কি কোনো হাদীস?...

<u>উত্তর:</u> এই কথাটা হাদীস নয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, নামায কাযা করলে এরচে' কম শাস্তি হবে। এরচে' বেশি শাস্তি হবে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলছেন:

وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

তুমি এক ওয়াক্ত ফরয সালাতও ছেড়ে দিয়ো না, (যদি) ছেড়ে

দাও তাহলে আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) এর দফতর থেকে তোমার নাম কাটা যাবে, তুমি কাফির হয়ে যাবে।[৮] তো কুফরির চেয়ে বড় গুনাহ তো আর নেই। সালাত তরক করাকে হাদীস শরীফে কুফরি বলা হয়েছে। তবে এই যে এক হুকবা বা অমুক বছর আগুনে পুড়তে হবে, এই কথাটা কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে পাওয়া যায় না। এই হাদীস সম্পূর্ণ সনদবিহীন জাল একটা কথা। যেটা সমাজে প্রচলিত হয়েছে, স্বভাবতই তাদের বইয়ে লিখেছেন, অন্যারা পড়েছেন, এভাবে প্রচলিত হয়েছে। এটা হাদীস নয়। আপনার প্রশ্নের ভঙ্গিতে আমি অনুভব করছিলাম, আপনি হুযুরদের উপর খুব বিরক্ত। হুযুররা পেল কোথায়? আসলে আমাদের দেশটাকে বুঝতে হবে। আমাদের সমাজ হুযুরদেরকে এমন সম্মান দেয়না যে, যারা বড় বড় বই... সৌদি আরবে একজন আলিম গবেষণার জন্য লক্ষলক্ষ টাকা পান। আমাদের দেশের আলিমরা অত্যন্ত নিগৃহীত এবং এজন্য আলিমরা দায়ি নয়। সমাজে যোগ্য ডাক্তার তৈরি করা, যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা যেমন সমাজের উপরে ফরয, ঠিক যোগ্য আলিম তৈরির ব্যবস্থা করা, রাষ্ট্রীয় সমর্থন, সামাজিক সমর্থন ঠিক তেমনি আমাদের উপর ফরয। আমরা সবাই মিলে ফরযে অবহেলা করেছি। আমাদের সমাজে আলিমরা যারা কথা বলেন, গবেষণার সুযোগ পান না। ভুল করছেন আলিমরা একশবার। তবে আপনি যদি আলিমদের এইসব ভুলের কারণে তাদের উপরে বিরক্ত হন, তাহলে তাদের ভালো কাজের মূল্যায়ন কে করবে? কাজেই, আমরা আলিমদের ভুলগুলোকে ভুল বলি, তাদের ভালো কাজগুলোকে মূল্যায়ন করি। এবং সমাজে ভালো আলিম তৈরির চেষ্টা করি। আমরা আলিমদেরকে ঘৃণা না করি, কারণ যারা দীনের ইলম বহন করে চলেছেন, এরা সমাজে নিগৃহীত। সাধারণ গরীব পরিবারের সন্তান। তারা সমাজে কোনো সাপোর্ট পান না, পড়াশোনার সুযোগ

---

[৮] সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৪০৩৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২২০৭৫; মুসনাদ বাযযার, হাদীস নং-৪১৪৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২৬২১

নেই, রাষ্ট্রের কোনো তদারকি নেই, তারপরও টিমটিম টিমটিম করে দশটা ভালো কথা দুইটা ভুল কথা বলে, অন্তত দীনি পরিবেশ বজায় রেখেছেন। আপনি এর বিকল্প উত্তম না দেওয়া পর্যন্ত এটার মূল্যায়ন আমাদের করতে হবে। (উপস্থাপক: খুব চমৎকার বিষয়ের সমাধান দিলেন, আমার মনে হচ্ছে যে, আমাদের সবারই উপকার হবে, আমরা অনেক সময় কারণে-অকারণে আলিমদের প্রতি দোষারোপ করি) তারা ভুল করেন, আমরা সবাই বিরক্ত হই, কিন্তু আমরা তাদেরকে কতোটুকু দিয়েছি?

<u>প্রচলিত ভুল</u>

<u>প্রশ্ন-১৬৮:</u> আমি *নেয়ামুল কুরআনে* একটা আয়াত পেয়েছি যে, 'ইয়া আল্লাহু' এটা ৪১ দিন, প্রতিদিন ৩৬৫ বার পড়লে যে কোনো মনের আশা পূরণ হবে। আমার শাশুড়ি বলেছেন, এটা জালালি খতম! এটা পড়তে শরীরের সমস্যা হতে পারে। এই ব্যাপারে জানতে চাই।

<u>উত্তর:</u> প্রথম কথা বোন, *নেয়ামুল কুরআন* বইটা কেউ পড়বেননা। এটা অত্যন্ত আপত্তিকর, অনেক যাদু আছে। এই বাংলাদেশেরই খুব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী; তিনি হাদীসের বিষয়ে একটা বই লিখিয়েছিলেন, এটা ১৯২৮ সালের দিকে প্রকাশিত, উর্দুতে। সমাজে প্রচলিত জাল হাদীসগুলোর ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনার পরে তিনি লিখেছেন- *যেসব বই পড়বেননা*, তার ভেতরে *নেয়ামুল কুরআন, নাফেউল খালায়েক!* এইগুলো সম্পূর্ণ জাল হাদীস, যাদু-টোনা ইত্যাদি কেন্দ্রিক। *মাকসুদুল মোমেনিন* বইটাও অনেকটা এরকম। এই ব্যাপারে আমি আরেকটু কঠিন কথাই বলতে চাচ্ছি। এই *মাকসুদুল মোমেনিন, নেয়ামুল কুরআন, নাফেউল খালায়েক* সমাজের প্রচলনের জন্য আমাদের সমাজের ভালো আলিমরা ৬০% দায়ি। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বাঙলার উলামায়ে কিরাম, বাংলাদেশে ইসলাম আসার পরে এই একহাজার বছরে পর্যন্ত মাতৃভাষায় দীন চর্চা করেন নি। আমাদের দেশের আলিমরা, যখন *মাকসুদুল মোমেনিন* লেখা হয়, তখন এদেশে বড়-বড় হাক্কানি আলিম ছিলেন, তারা উর্দুতে দীন চর্চা করেছেন, ফারসিতে দীন চর্চা করেছেন, উর্দুতে বই লিখেছেন। তারা মাতৃভাষায় দীন চর্চা না করে প্রথমত আল্লাহর দেওয়া দায়িত্বে অবহেলা করেছেন। কারণ আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

প্রত্যেক রাসূলকে আল্লাহ তাঁর মাতৃভাষা দিয়ে পাঠান।

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তাদের কাছে মাতৃভাষায় বয়ানটা হবে।[১] আমরা আমাদের ইলম-কালাম-বয়ান এটা মায়ের ভাষায় দেওয়া উচিত ছিল, দেই নি। ওই সময়ে মাকসুদুল মোমেনিনের মতো গ্রন্থগুলো যারা লিখেছেন তারা সাধুবাদ পাবেন, অন্তত তারা দীনের জন্য কিছু কথা মানুষকে দিয়েছেন। তবে তাদের জ্ঞানের পরিধি কম ছিল, তারা যা পেয়েছেন তাই দিয়ে গেছেন। এজন্য আমরা লেখকদের জন্য দুআ করি। যে আল্লাহ তাআলা তাদের ভুলত্রুটি মাফ করে তাদের নেক আমলগুলো কবুল করেন। তবে বইগুলোতে অনেক ভুলভ্রান্তি রয়েছে, অনেক, অগণিত। বিশেষ করে *মাকসুদুল মোমেনিন*, *নেয়ামুল কুরআন*, *নাফেউল খালায়েক* এই জাতীয় বইগুলো পড়ার যুগ আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরে, আলহামদুলিল্লাহ, মাতৃভাষায় ব্যাপক দীনের বই লেখা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে যে প্রকার ইসলামি গবেষণা বই প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্বে আর কোনো একক প্রতিষ্ঠান আছে বলে আমার জানা নেই। এজন্য আপনারা ভালো লেখকদের গবেষণামূলক বই পড়েন। সহীহ হাদীস ভিত্তিক বই পড়েন। আপনি যে আমলটার কথা বলেছেন, এটা অত্যন্ত এবং পরিপূর্ণই জাল আমল। কুরআন-হাদীসে কোথাও এই আমল নেই। এটা আপনি করবেন না। মনের আশা পূরণ করার অনেক সহীহ আমল রয়েছে। আমি এই মুহূর্তে একটা বাস্তব কথা বলি, আমার কাছে এই টেলিভিশনের মাধ্যমে এক ভাই এসেছেন, এখানে এসে দেখা করেছিলেন। তিনি বললেন, ঢাকায় তার সম্পত্তি আছে, সম্পত্তিটা একজন

---

[১] সূরা: ইবরাহীম, আয়াত: ৪

নিয়েছিল ডেভলপমেন্টের জন্য। (এখন) দলীলও দিচ্ছে না, সম্পত্তিও দিচ্ছে না; খুব বিপদে আছি, কেস কারবার কোরে। আপনারা বলেছেন তাবীয নেওয়া যাবে না, কবিরাজের কাছে যাওয়া যাবে না, আমাকে একটা সুন্নাত আমল দেন। আমি কয়েকটা সুন্নাত আমল দিলাম, আলহামদু লিল্লাহ! কয়েকদিন পরেই তিনি এসেছেন, দুইতিন সপ্তাহ পরেই, 'হুযুর, ও আমার দলীলপত্র সব ফেরত দিয়ে গেছে!' কাজেই আপনারা সুন্নাত আমল করেন, মনের আশা পূরণ হবে, ইনশাআল্লাহ! اللهُ أَعْلَمُ।

<u>প্রশ্ন-১৬৯:</u> আমার একবোন আমাকে বলেছিল, কোনো বিপদ হলে বা কোনো ভালো কিছুর আশা করলে, ইশার নামাযের পরে কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে, এক বৈঠকে ৪১ বার সূরা ইয়াসিন পড়লে, একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়; এই ক্ষেত্র অনুযায়ী আল্লাহর দরবারে যা কিছু চাওয়া যায়, তাই নাকি আল্লাহ পূরণ করেন, কথাটা কি ঠিক?

<u>উত্তর:</u> কুরআন বা সুন্নাহয় এই আমল নেই। আমলের ক্ষেত্রে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, কেউ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটা আমল করে ফল পেতে পারে, আর এরকম ফলের আমল করা বৈধ। ৪১ বার, ৫০ বার সূরা ইয়াসিন পড়ে দুআ করা অবৈধ কিছু নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এরচে' ভালো ভালো আমল দিয়েছেন যে, এই দুআটা পড়লে তোমার সব বিপদ কেটে যাবে, এই দুআ ইসমে আযম, এইটা বলে দুআ চাইবে– এগুলো মাসনূন। একদিকে দুআ, আরেকদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শেখানো দুআ। কাজেই, আমরা এগুলো করার চেষ্টা করব। আর সূরা ইয়াসিনের যে আমলটা বোন বলেছেন, এই আমলটা কোনো হাদীসে আসে নি। কেউ আমল করে অভিজ্ঞতায় যদি ফল পায়, কুরআনের কোনো সূরা রিপিট করে পড়ে ফল পায়– এটা অবৈধ নয়। এটা দীনের অংশ নয়। এটা অনেকটা চিকিৎসার

অংশ। যাকে 'রুকইয়া শারঈয়া' বলা হয়।

<u>প্রশ্ন-১৭০:</u> আমাদের দেশের ইমাম সাহেবরা মিম্বরে উঠে কিংবা হুযুর-মাওলানারা ওয়ায মাহফিলে দরূদ পড়ার সময় একটা দরূদ পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা নাবিয়্যিনা শাফিয়্যিনা মাওলানা মুহাম্মাদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। এই দরূদে কোনো দোষ দেখছি না, যদিও হাদীসে নেই। এইটা পড়া যাবে কিনা?

<u>উত্তর:</u> দরূদ পড়া সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতগুলোর অন্যতম। দরূদ হল অনেকটা যিক্‌র এবং দুআ। এই যিক্‌র-দুআর দুইটা পর্যায় আছে। আল্লাহ তাআলা আল্লাহর প্রশংসা পছন্দ করেন। আল্লাহ তোমার সকল প্রশংসা, আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও..., বাঙলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু; যে ভাষায় বলি, এখানে প্রশংসা করার, ক্ষমা চাওয়ার মূল সাওয়াবটা হবে। কিন্তু আমরা যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শেখানো শব্দে, 'আলহামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'... এগুলো বলি, তাহলে মূল যিক্‌র বা দুআর সাওয়াবের পাশাপশি মাসনূন শব্দের জন্য খাস অতিরিক্ত সাওয়াব রয়েছে, এটা আমরা পাব। এবং দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে, যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শেখানো শব্দে দুআ করছি। দরূদও এরকম। যেকোনোভাবে যদি আমরা বাঙলাতেও বলি, 'আল্লাহ আমাদের রাসূল (ﷺ) এর প্রতি দরূদ সালাম পেশ করেন'। তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ দরূদের যে মূল সাওয়াব, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ তার দশটা গুনাহ মাফ করবেন, দশটা নেকি দেবেন, দশটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। যে বেশি দরূদ পড়বে, সে শাফাআতের হকদার বেশি হবে। আল্লাহ তার দুনিয়ার দুশ্চিন্তা কাটিয়ে দেবেন। রাসূল (ﷺ) এর রওযায় দরূদ পৌঁছানো হবে, তিনি নিজে সালামের জবাব দেবেন, দুআ করবেন

ইত্যাদি ফযীলত রয়েছে। আমরা যদি অন্তত বলি, 'আল্লাহ আমাদের রাসূল (ﷺ) কে দরূদ ও সালাম পেশ করেন, তার উপরে সালাত সালাম পাঠান', আশা করি, দরূদ-সালামের মূল ইবাদতটা পালন করতে পারব। তবে যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শেখানো শব্দে বলি, তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা পূর্ণাঙ্গ হবে, সাওয়াব বেশি হবে। রাসূল (ﷺ) এর শেখানো দরূদ একটাই। সেটা মূলত দরূদে ইবরাহীম। আমরা যেটা ওয়ায মাহফিলে পড়ি এগুলোর কোনোটাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সেখানো দরূদ নয়। এগুলো পড়লে দরূদের মূল সাওয়াব ইনশাআল্লাহ, পাওয়া যাবে। যদি সুন্নাত শব্দের পরিবর্তে এই সমস্ত আমাদের শব্দ, যেমন 'আলহামদু লিল্লাহ' বলার তাওফীক থাকা সত্ত্বেও 'আল্লাহ তোমার প্রশংসা আল্লাহ তোমার প্রশংসা' বলি, 'আলহামদু লিল্লাহ'কে বর্জন করি; সুন্নাত বর্জন, সুন্নাতকে মেরে ফেলে, সুন্নাত ব্যতিত কাজকে ইবাদতে পরিণত করার কারণে এটা একটা কঠিন অপরাধে পরিণত হবে। ঠিক তেমনই, আমরা ইস্তিগফারের জন্য মাসনূন লফয (শব্দ) জানা সত্ত্বেও, বাদ দিয়ে যদি আমাদের তৈরি বানানো শব্দ ব্যবহার করতে থাকি তাহলে সুন্নাত পরিত্যাগ করে, অবজ্ঞা করার পাপে পাপী হয়ে যাব। দরূদের ক্ষেত্রেও আমরা চেষ্টা করব, 'দরূদে ইবরাহীম' ব্যবহার করার। কারণ এটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শেখানো, এটা দরূদও হবে, কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শেখানো বাক্য ব্যবহার করার সাওয়াবটা আমরা পাব। পাশাপাশি অন্যান্য এসব দরূদ না-জায়িয নয়। তবে এগুলোর ভেতরে খাস ফযীলত নেই। এগুলোর চেয়ে দরূদে ইবরাহীম ব্যবহার করা ভালো।

প্রশ্ন-১৭১: 'তেঁতুল খেলে ব্রেন কমে যায়'। কথাটি কি সত্য?

উত্তরঃ এটা কুরআন-হাদীস-শরীআতের কথা নয়। এটা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি অথবা বিজ্ঞানের কথা হতে হবে।

যতোক্ষণ এগুলো দ্বারা প্রমাণিত না হবে, তখন এটা কুসংস্কার হিশেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-১৭২: অনেকে 'ইল্লাল্লাহ- ইল্লাল্লাহ' বলে যে যিক্‌র করে, যিক্‌রটা কতোটুকু শরীআতসম্মত?

উত্তর: আসলে ভাই, আমরা অনেক কিছুই করি। আমাদের প্রবলেম হল যে, আমরা একটা অস্বচ্ছতায় ভুগি ইবাদতের ক্ষেত্রে। আমাদের ঈমান হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। আমাদের একমাত্র মাবুদ আল্লাহ, অর্থাৎ আমরা যে ইবাদতগুলো করি, 'ইল্লাল্লাহ' যিক্‌র করি, সুবহানাল্লাহ বলি, আলহামদু লিল্লাহ বলি, দাড়ি রাখি, টুপি পরি, নামাযের ভেতরে সিজদা করি– প্রতিটি কাজের সাওয়াব আল্লাহ তাআলা থেকে পাব বলে আশা করি, তিনিই মাবুদ। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই বিশ্বাসের অর্থ হল, কোন ইবাদতটা কীভাবে করলে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর খুশি হবেন, ইবাদতটা কবুল করবেন, এই তরীকা-পদ্ধতিটা একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছ থেকে শিখব। যেমন আল্লাহ বলেছেন, সিজদা করতে, আমরা যেকোনোভাবে সিজদা করে দিলাম, এমন নয়। সিজদাটা কেমন হবে, নাকটা কেমন থাকবে, কপালটা কেমন থাকবে, হাত কেমন থাকবে, সব কিছুই নবীজি থেকে শিখতে হবে। সিজদা হলেই হল না। এজন্য যিক্‌রটাও নবীজি থেকেই শেখা উচিত। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবিগণ, তাবিয়িগণ, তাবি'-তাবিয়িগণ একহাজার বছর পর্যন্ত কোনো মুসলিম 'ইল্লাল্লাহ' যিক্‌র করেন নি। তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিক্‌র করেছেন। এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এটাকে সর্বোত্তম যিক্‌র বলেছেন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার উচ্চারণ করলে আল্লাহ তাআলা অগণিত সাওয়াব দান করেন, জান্নাতে বাগান বানিয়ে রাখেন, বাড়ি বানিয়ে রাখেন– এই সকল সহীহ হাদীসে এসেছে। আমরা কেন সেই

সুন্দর কালিমাটা...। সবচে' মজার হল আরবি ভাষার অনেক কঠিন উচ্চারণ আছে; 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ভেতর কোনো হারফে হালকি নেই। উচ্চারণ কঠিন 'ছা' নেই, 'যাল' নেই। এতো সহজ একটা বাক্য আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, এটা সব দেশের সব ভাষার মানুষ সহজে উচ্চারণ করতে পারে এবং এতে অনেক বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়, এটাকে অর্ধেক ভেঙে আমরা কেন করব? অতীত যুগে, অর্থাৎ দুইশো-তিনশো বছর আগে, কোনো কোনো বুযুগ, মুরীদের সাময়িক মনোযোগের জন্য তারা এটা prescribe (ব্যবস্থাপত্র) করেছিলেন। আমরা মনে করি, তাদের একটা ওযর ছিল, কিন্তু আমরা যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতের বাইরের এগুলোকে মনে করি, এগুলো না হলে বোধহয় আমাদের কলবটা সাফ হবে না। তাহলে আমরা মূলত ইয়াকীন করলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতমতো চললে আমরা কলবটা পুরো সাফ করতে পারব না। এটা কিন্তু ভাই, ভালো চিন্তা না। এজন্য আমরা বিতর্ক-ঝগড়া বাদ দিয়ে..., জায়িয আছে, আরবি ব্যাকরণে জায়িয আছে, আরবি ব্যাকরণ দিয়ে তো আমরা ইসলাম শিখব না। আরবি ব্যাকরণ দিয়েই কিন্তু 'আকবার আকবার' যিক্‌র করা যায়, কুরআনেও আছে, আরবি বাক্য জুমলায়ে ইসমিয়ার মুবতাদা অর্থাৎ সাবজেক্টটাকে ড্রপ করে দিয়ে শুধু খবরকে বলা যায়। আমরা যদি আরবি ব্যাকরণ দিয়ে আল্লাহর যিক্‌র শিখব, তাহলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কী জন্য এসেছিলেন? তিনি তো আমাদের ইবাদত শেখাতেই এসেছিলেন। এজন্য যে ভাইয়েরা 'ইল্লাল্লাহ' যিক্‌র করেন, তাদের অনুরোধ করব, হ্যাঁ, অনেক পীর বুযুর্গ করেছেন। তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। তবে আমরা পীর-বুযুর্গদের শ্রদ্ধা করব (আর) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসরণ করব। এটা ভালো, না রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে শ্রদ্ধা করব আর পীর-বুযুর্গদের অনুসরণ করব? কোনটা ভালো মনে করেন আপনি? আমি মনে করি, পীর-বুযুর্গ, আলিম-উলামা সবাইকে আমরা শ্রদ্ধা

করব, তাদের জন্য দুআ করব, কিন্তু যেখানে তাঁদের কর্ম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ব্যতিক্রম হবে, আমাদের সামনে দুটো অপশন– হয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরটা ব্যাখ্যা করে দূরে রেখে এদের অনুসরণ করব, অথবা এদেরটাকে ব্যাখ্যা করে, এদের মর্যাদা রেখে নবীজিরটা অনুসরণ করব। আমার কাছে এটাই ভালো মনে হয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দিন।

বিদআত/কুসংস্কার

প্রশ্ন-১৭৩: সীরাতুন্নাবী, ঈদে মিলাদুন্নবী হয়ে থাকে দশদিন ব্যাপী, বিশদিন ব্যাপী। এগুলো আমাদের ইসলাম অনুযায়ী কতোটুকু সঠিক? এই ব্যাপারে আমি জানতে চাচ্ছি।

উত্তর: আমরা কোন ইসলাম চাই, এইটা প্রথম প্রশ্ন। ইসলাম যদি আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ), খুলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবায়ে কিরাম– তাঁদের যুগের ইসলাম এখনও নিটুট সংরক্ষিত রয়েছে, হাদীস রয়েছে, আসার রয়েছে। আপনি দেখবেন এই জিনিসগুলো সেই যুগে ছিল না। কারণ মুমিনের জীবন তো সীরাতকেন্দ্রিক, মীলাদকেন্দ্রিক। প্রতিদিন রাসূল (ﷺ) এর জীবন আলোচনা করবে, প্রতি সোমবার রোযা রাখবে। বছর ঘুরে আসলে ঘটা করে এগুলো করবে, এসব সে যুগে ছিল না। তারপরও আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে, এটার দুটো দিক আছে। একটা সীরাতুন্নাবী আরেকটা মীলাদুন্নাবী। আমরা আগেও আপনাদের বলেছি, মীলাদুন্নাবী (ﷺ) এর অর্থ হল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্ম। এর পারিভাষিক অর্থ হল জন্ম উদযাপন করা, জন্মে আনন্দ প্রকাশ করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবায়ে কিরামগণ, তাবিয়িগণ– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্মে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার, আনন্দ প্রকাশ করার, উদযাপন করার একটাই পদ্ধতি ছিল, সেটা হল সোমবারে রোযা রাখা। এছাড়া ১২ রবিউল আওয়াল বা রবিউল আওয়াল মাসে কখনোই রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবিগণ, তাবিয়িগণ, তাঁরা এগুলো কিছুই করেন নি। এটা সর্বজনবিদিত সত্য। এর ব্যতিক্রম কেউ বলতে পারবেন না যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়িগণ, আমাদের চার ইমাম, রবিউল আওয়াল মাসে এইভাবে এইসব কিছু করেছেন। আর দ্বিতীয় বিষয় হল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্ম-জীবনী আলোচনা করা, এটা

যখনোই করি একই রকম সাওয়াব পাব। আমরা এখন যেটা করি, মীলাদুন্নাবী নামে...। সীরাতুন্নাবী, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনী আলোচনা, এটা বরং সুন্নাতের অধিকতর কাছে। সাহাবায়ে কিরামের জীবন দেখেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সীরাত-শামায়িল নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা করতেন। সীরাত মানে মীলাদ, তুফুলাত, বড় হওয়া, আমল, আখলাক, আকৃতি, প্রকৃতি সব এসে যায়। আর মীলাদ হল এই সীরাতের একটা ছোট অংশ। এটাকে আলাদা করে সাহাবায়ে কিরাম তাবিয়িগণ এতো হাইলাইট করতেন না। প্রথম যেটা আমরা সমস্যায় পড়েছি, মীলাদের যে সুন্নাত পদ্ধতি, সেটা হল সোমবারে রোযা রাখা, আর সারা বছরে যখন সুবিধা হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্ম-জীবনী আলোচনা করা। আর যারা মীলাদুন্নাবী রবিউল আওয়াল মাসে করছেন, তারাও স্বীকার করছেন, এটা বিদআতে হাসানাহ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) করেন নি, সাহাবায়ে কিরাম করেন নি, কিন্তু কাজটা ভালো। সুন্নাত বাদ দিয়ে বিদআতে হাসানাকে হাইলাইট করতে গিয়ে আমরা কিছু কঠিন অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতটা মৃত্যুবরণ করছে, আমরা কেউ আর এখন সোমবারে রোযা রাখি না। সাহাবায়ে কিরামের মতো সারাবছর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সীরাত-শামায়িল জীবনী আলোচনা করি না। এই বিদআতে হাসানাকে এতো হাইলাইট করছি, সুন্নাত যারা পালন করছে, তাদেরকেও ঘৃণা করছি। মনে করছি, তাদের দীন বুঝি ভালো নয়। এভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবায়ে কিরাম সবাইকে খারাপ জানার পর্যায়ে চলে যাচ্ছি। আসেন না, আমরা আমাদের জীবনকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতমতো পরিচালনা করার চেষ্টা করি। আমার মীলাদটা সুন্নাতমতো হোক, সাহাবিদের মতো হোক। আমি যেটা বললাম সেটা মুসলিম মুসলিমে বিদ্বেষের জন্য নয়। এটা এমন একটা বিষয় যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবিদের যুগে ছিল না, এই

বিষয় নিয়ে উম্মত এখন পরপস্পরে ফতোয়াবাজি করছে, যে মীলাদ পড়ে না সে কাফির হয়ে গেছে, যে মীলাদ পড়ে সে জাহান্নামি হয়ে গেছে। একটা মানুষ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলেছে, আল্লাহর রাসূলকে রাসূল মেনেছে, তাঁর জীবন মেনেছে, সীরাত মেনেছে, শামায়িল মেনেছে, সুন্নাত মেনেছে, একটা উদ্ভাবিত নতুন জিনিস মানে নি, আমরা তাকে ঘৃণা করছি। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, আসেন, আপনারা যদি কেউ প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নাবী করেই থাকেন তারা নবীর মহব্বতেই করেন। বোঝেন না যে, নবীজি কী কায়দায় করতে বলেছেন। আমরা যিক্‌র করব, তবে যিক্‌রটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পদ্ধতিতে করলে সাওয়াব পাব। তার বাইরে গেলে পাব না, হয়তো গুনাহ হয়ে যাবে। আমরা সালাত আদায় করব, তবে নবীর তরীকায় হলে সাওয়াব পাব। একজন জামাআতে, আযান দিয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করছে। এক ভাই গিয়ে বলল, এভাবে তাহাজ্জুদ আদায় কোরো না। তার মানে এই নয় যে, তিনি তাহাজ্জুদ বিরোধী। তিনি তাহাজ্জুদের নামে আযান এবং জামাআতের বিরোধী। সুন্নাতের খেলাপ কাজটুকুর বিরোধী। আমরা যারা দীনকে ভালোবাসি, আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসি, উম্মাতকে ভালোবাসি, যারা যেটা করছেন এটার গুরুত্বটা বুঝি। এটা কোনো দীন নয়, আমরা সুন্নাত মোতাবেক চলার চেষ্টা করি। বাকি বিষয় নিয়ে ঝগড়া না করি। আজকে উম্মত ছোট ছোট বিষয় নিয়ে এতো ঝগড়া করছে, ফতোয়াবাজি, গালাগালি...। অথচ বান্দার হক, আল্লাহর হক, সালাত, সিয়াম, হালাল-হারাম এগুলো নিয়ে কোনো কথাই চলছে না। আমরা যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সীরাতের কাছে আসতাম, সাহাবিদের কাছে আসতাম, কুরআন তিলাওয়াত করতাম...! আপনাদেরকে অনুরোধ করব ভাইয়েরা, আপনারা যতোদিন আমাদের মুখের কথা শুনে আল্লাহর জান্নাত পেতে চাইবেন, ততোদিন আপনাদের এই সমস্যা থাকবে। কারণ আমরা একেক জন একেক কথা

বলব। কিন্তু যেখানে কোনো ইখতিলাফ নেই, যেখানে কোনো ভুল হয় না, কুরআন এবং সুন্নাহ, যদি আপনারা নিজে পড়তে শুরু করেন, তাহলে আমাদের অত্যাচার থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে তাওফীক দান করেন।

<u>প্রশ্ন-১৭৪:</u> পবিত্র মীলাদুন্নবী উপলক্ষে কি কোনো অনুষ্ঠান করা যাবে?

<u>উত্তর:</u> মীলাদুন্নাবীর কী অনুষ্ঠান করবেন, এটা বোঝার আগে, আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা কী চাই? আমরা যদি চাই আল্লাহর ইবাদত করব, মীলাদুন্নবী করে আল্লাহকে খুশি করব, তাহলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবিদের পদ্ধতিতে করতে হবে। মীলাদুন্নবী নিয়ে বিতর্ক নয়, যেমন একজায়গায় মানুষেরা ঢোল বাজনা বাজিয়ে বা কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে যিক্র করছে; একজন সেখানে গিয়ে বললেন, ভাইয়েরা, উলঙ্গ হয়ে যিক্র করতে হয়না অথবা ঢোল বাজিয়ে যিক্র করতে হয় না। আসলে তিনি যিক্রের বিরোধিতা করছেন না; তিনি বিরোধিতা করছেন একটা পদ্ধতির। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মীলাদে আমরা অনুষ্ঠান, আনন্দ করব, এটা যদি আমরা আল্লাহর ইবাদত করতে চাই, সাওয়াব পেতে চাই, তাহলে অবশ্যই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর পদ্ধতিতে হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

সহীহ বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবের হাদীস। যদি কেউ এমন কর্ম করে, যে কর্ম আমরা করি নি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবিরা করেন নি, তাহলে ওইটা আল্লাহ ফেলে দেবেন, রিজেক্ট করবেন, আল্লাহ ওটা কবুল করবেন না।[১] মীলাদুন্নবী বলতে,

---

[১] সহীহ বুখারি ৩/৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৭১৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২৫৪৭২

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্মের জন্য যেটা করেছেন, তিনি প্রতি সোমবারে রোযা রাখতেন। এবং সোমবারই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্মের দিন, বার। রবিউল আওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্ম– এটা হাদীসেও নেই, কুরআনেও নেই, সাহাবিদের কাছ থেকেও তেমন রিওয়ায়াত নেই। ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন বক্তব্য আছে। আমরা যদি মীলাদুন্নবী পালন করতে চাই, তাহলে প্রতি সোমবারে রোযা রাখা অথবা যখন সুযোগ পাই। সোমবার রোযা রাখা এটাই মীলাদের সুন্নাত পথ। তাছাড়া মীলাদুন্নবীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনী, জন্ম আলোচনা করা, এটাও ইবাদত। এটারও সুন্নাত পদ্ধতি হল, সাহাবায়ে কিরাম শুধু জন্ম আলোচনার জন্য একত্রিত হতেন না। জন্ম জীবনী সীরাত যিক্র, যেগুলো আলোচনা করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি ভক্তি, এবং অনুসরণ বাড়ে, সবগুলো তাঁরা আলোচনা করতেন। এবং সেক্ষেত্রে তাঁরা সবাই বসে থাকতেন মহাব্বতের সাথে, যিনি আলোচনা করতেন তিনি বসে থাকতেন বা দাঁড়াতেন। নবীজির জীবনী আলোচনা করতেন, যখন তার নামটা আসত, তাঁরা প্রত্যেকে যার যার মতো দরূদ পড়তেন। যদি ঠিক এরকমভাবে সুন্নাত পদ্ধতিতে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্ম-জীবনী আলোচনা করি, এটা অবশ্যই খুব ভালো কাজ। এই উপলক্ষে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনী আলোচনার জন্য, তার সীরাত-শামায়িল প্রচারের জন্য যদি আমরা কিছু করি, এটা অত্যন্ত ভালো কাজ হবে।

<u>প্রশ্ন-১৭৫:</u> তাবলীগ জামাআতের চল্লিশ দিনের একটা চিল্লা হয়। এটা কুরআন হাদীসে কতোটুকু সত্য? এটা বিদআত কিনা?

<u>উত্তর:</u> আসলে খুব জটিল প্রশ্ন। আমাদের সমাজে যারা দীনের কাজ করছেন, অন্তত শিরক-কুফর শেখাচ্ছেননা, মানুষদেরকে ভালো পথে ডাকছেন, আমরা তাদের শ্রদ্ধা করি। উম্মাত এখন এতো কঠিন পর্যায়ে আছে যে, পরস্পরে আমরা এমন ভুল

বোঝাবুঝি না করি, যেটা আমাদের হিংসা বাড়ায়। তারপরেও আমরা বিষয়টা খোলা মনে বিবেচনার চেষ্টা করি। দাওয়াত, দীনের প্রচার– এটা আল্লাহ তাআলার একটা ইবাদত। যেমন কুরআন তিলাওয়াত ইবাদত, নামায পড়া ইবাদত; আর প্রতিটা ইবাদত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর তরীকায় করতে হয়। যেটা আমরা বলি 'নবীওয়ালা' কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবিরা দীনের দাওয়াত দিয়েছেন, সারাজীবনই। কিন্তু কখনো তারা সময় নির্ধারণ করে দাওয়াত দিতে বের হন নি। দাওয়াত একটা বড় ইবাদত। কেউ যদি নিজের সুবিধামতো দিন ঠিক করেন, একমাস-দুইমাস-তিনমাস-ছয়মাস– এতে কোনো সমস্যা নেই। দাওয়াতটা চল্লিশ দিন হতে হবে, কম হলে বিশেষ কোনো সাওয়াবের ঘাটতি, চল্লিশ হলে বিশেষ কোনো প্রাপ্তি, এই চিন্তাটা ঠিক নয়। এটাকে আমরা দাওয়াত নামক ইবাদতের অংশ না বানাই। (উপস্থাপক: মূসা আ. নাকি তূর পাহাড়ে চল্লিশ দিন ছিলেন, এটাকে অনেকে দলীল বানায়...) এটাই হল সব বিদআতের সূত্র। আমি জানি, এটা তারা বলেন। বিষয়টা হল, যদি আমরা বলি যে, এটা আমরা সুবিধার জন্য চল্লিশ দিন করেছি, সিলেবাস হিসেবে করেছি, তাহলে কোনো দোষ হতনা। আমি যদি বলি, হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইহরামের কাপড় পরেন, কাজেই নামাযটা ইহরামের কাপড় পরে পড়লেই সাওয়াব বেশি হবে, সাধারণ লুঙ্গি পরা যাবেনা। একটা ইবাদতের যুক্তি দিয়ে আরেকটা ইবাদতের ভেতরে ওইটা ঢুকালেই বিদআত তৈরি হবে। এজন্য প্রতিটি ইবাদতে, যেমন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নামাযের মধ্যে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়তেন, কাজেই কুরআন শরীফ দাঁড়িয়ে পড়লেই সাওয়াব বেশি, বা যিকর দাঁড়িয়ে করলে সাওয়াব বেশি, এই ধরনের চিন্তা করলেই তো...! প্রতিটি ইবাদতকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শিখতে হবে, ইলম তলব ইবাদত, দাওয়াত ইবাদত। যেটা করতে হবে সেটা হল, আমরা

দীনের দাওয়াত দিতে এবং শিখতে বের হব, এই বেরানোর জন্য একটা সিলেবাস করেছি, চল্লিশ দিনের কোর্স করেছি, কেউ একত্রিশ থাকলে..., চল্লিশ থাকলে চল্লিশ, বিয়াল্লিশ থাকলে বিয়াল্লিশ– এই দিনের ভেতরে কোনো ফায়দা-বরকত নেই। বরকত হল, কতোটুকু দীন শিখলাম, শেখালাম। আমরা সিলেবাস করি কারিকুলাম তৈরি করি, পরীক্ষা (নিই)– এটা দীনের অংশ নয়; এই পর্যায়ে রাখলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু আমাদের ভাইয়েরা এই চিল্লাটাকে একটা বরকত বা ইবাদত বানিয়েছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সুন্নাতের খেলাফ। এটা বিদআতের জন্ম দেয়। এর মাধ্যমে অনেক রকম ভুল-ভ্রান্তি হয়। আমি একটা জিনিস আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা আশা করব, তারা এগুলোকে সুন্নাতের আলোকে বিবেচনা করবেন। সহীহ বুখারি এবং অন্যান্য কিতাবের হাদীস, ইবনুল হুয়াইরিস রা. বলেছেন,

أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ

ইবনুল হুয়াইরিস রা. তিনি তাঁর যুবকদের এক গ্রুপ নিয়ে সফরে-খুরুজে বেরিয়েছেন, নবীজির দরবারে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দরবারে তাঁরা,

فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً

বিশ দিন তার কাছে থাকলেন,

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) খুব নরম ছিলেন, বিশ দিনের মাথায় উনার কাছে মনে হল, আমাদের বউয়ের কথা মনে পড়েছে,

أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا

তিনি আমাদেরকে বললেন, বাবা, তোমার বাড়িতে কে কে আছে বলো তো? হুযুর, স্ত্রী আছে, ছেলেটা আছে, মেয়েটা আছে। যখন আমরা কথা বললাম, উনি কথা থেকে বুঝে নিলেন যে, আমাদের মনটা টান শুরু করেছে। তিনি বললেন, যাও বাবা, বিশদিন হয়েছে, চলে যাও। বাড়ি যেয়ে তোমরা এই এই ভাবে চোলো, এইটা কোরো।[২] লক্ষ্য করেন, এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই খুরুজকে বিশদিনে কেটে দিলেন এবং পরিবারের কাছে যাওয়াটাকে গুরুত্ব দিলেন। যুবক, বউয়ের কথা মনে হয়েছে। আমরা এই দিনটাকে শর্ত করে, অনেক সময় ঊনচল্লিশ দিনের দিনও বাড়ি থেকে কোনো দূর্ঘটনা হলেও বাড়ি যেতে দিতে চাই না। বলি, না, চল্লিশ পুরিয়ে যাও, এটা কিন্তু ইবাদত বানানো হল। এজন্য এটা আমরা সিলেবাস পর্যায়ে রাখি, এটা কোনো ইবাদাতের অংশ নয়, তাহলে এটা চলে। আর আমরা যদি এটাকে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বরকত সাওয়াব বানাতে চাই, তাহলে বিদআতের দরজা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা...। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করুন।

<u>প্রশ্ন-১৭৬:</u> মা-বাবার পাপের শাস্তি সন্তান ভোগ করবে কিনা?

<u>উত্তর:</u> না! এটা আমাদের সমাজের কুসংস্কার। আমাদের সমাজে কুসংস্কার আছে। কখনো স্বামী মারা গেলে বউ অপয়া। কখনো ছেলে সন্তান মারা গেলে, শ্বাশুড়ির দৃষ্টিতে পুত্রবধূ অপয়া। এগুলো কুসংস্কার, মিথ্যা, অনেকটা হিন্দুয়ানী বিশ্বাস। আমরা কোনো ধর্মকে অবমাননা করছি না। তবে হিন্দুধর্মে যে পরজন্ম আগের জন্মের অন্যায় ভোগ করা, এটা ওই রকম হয়ে যায়। আসলে প্রতিটি মানুষ তার নিজের কর্মের ফল (পাবে)। আল্লাহ কুরআন কারীমে রিপিটেডলি(Repeatedly-পুনঃপুনঃ) বলেছেন:

---

[২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৬৩১; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৬৩৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৫৫৯৮

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

এক প্রাণ কখনো অন্যের পাপের বোঝা বহন করে না।[৩] এই জন্য শুধুমাত্র আমাদের কারণে যে পাপ হয়, আমি একটা সিনেমা হল খুলেছি, তাতে যতো লোক দেখবে, আমার গুনাহে জারিয়া হবে। আমি একটা পাপের যন্ত্র আবিষ্কার করেছি, আমি একজনকে পাপ শিখিয়েছিলেন, আমি অন্যায়ের দাওয়াত দিয়েছি, আমার কারণে যে মানুষগুলো পাপ করেছেন, তাদের পাপ থাকবে, আমি মানুষকে পাপী করার জন্য পাপী হব। এজন্য মা-বাবার পাপের কারণে কক্ষনো সন্তান শাস্তি পান না। তারা কোনো খারাপ ফল ভোগ করেন না। এটা ঠিক কথা নয়।

[৩] সূরাঃ আনআম, আয়াতঃ ১৬৪; সূরাঃ ইসরা, আয়াতঃ ১৫; সূরাঃ ফাতির, আয়াতঃ ১৮; সূরাঃ যুমার, আয়াতঃ ৭; সূরাঃ নাজম, আয়াতঃ ৩৮

সমকালীন প্রসঙ্গ

প্রশ্ন-১৭৭: আলহামদুলিল্লাহ! আমরা দীনের দাওয়াতের কাজটা মিডিয়ার মাধ্যমে করছি, এটা যুগের চাহিদা ও সময়ের দাবি। ইসলামিক এই প্রোগ্রামগুলো আমরা কতোটুকু দেখতে পারি? সে সম্পর্কে আমাদের যদি কিছু বলেন...

উত্তর: যে বিষয় ন্যাচারালি দেখা বৈধ, সেটা টেলিভিশনের পর্দায় দেখা একইরূপ বৈধ। সেই হিশেবে, যে কোনো টেলিভিশনের পর্দায় ইসলামি প্রোগ্রাম বা ইসলামবিরোধী কোনো দৃশ্য নেই বা শরীআত নিষেধ করছে এমন কোনো দৃশ্য নেই, নগ্নতা নেই, অশ্লীলতা নেই এরকম কোনো সাধারণ বিনোদন প্রোগ্রামও দেখা বৈধ হবে, এটাই স্বাভাবিক কথা। তবে বর্তমানে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি, যারা আমাদের ইসলামিক টিভি বা অন্য টিভির ইসলামিক অনুষ্ঠানগুলো দেখেন, নিজের জীবনকে কুরআন এবং সুন্নাহর রঙে রাঙিয়ে নিতে চান, তারাও অনেক বিনোদন দৃশ্য দেখেন। সাধারণ বিনোদন নাটক সিরিয়াল ইত্যাদি দেখেন। অনেক সময় মহিলারা, বিশেষ করে, যেহেতু মহিলারাই পার্ট করেন, মহিলার জন্য মহিলার দিকে তাকানো শরীআতে বাঁধা নেই। সামান্য কিছু নাচগান অশ্লীলতা ছাড়া মোটামুটি এগুলো অধিকাংশই বৈধ বলা চলে। সাধারণভাবে দেখার মতো বলেই আমরা মনে করি। তবে এগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ইসলামবিরোধী যে বিষয়গুলো রয়েছে, আমরা লক্ষ্য করেছি অনেক দীনদার মানুষের মধ্যে, এগুলোকে মুবাহ বা সামান্য দোষ মনে করে তারা এগুলোতে আসক্ত হয়ে পড়েন। একটা ছোট্ট গুনাহ, অর্থাৎ প্রতিদিন সামান্য কিছু বাজনা, সামান্য কিছু অশালীন দৃশ্য দেখছেন, সেটা হয়তো একদিনে ছোট ছিল, প্রতিদিন করার কারণে কবীরা গুনাহ হয়ে গেল। এই সমস্ত বিনোদন অনুষ্ঠান অধিকাংশই অমুসলিমদের তৈরি এবং অমুসলিম পরিবেশে তৈরি।

এর মধ্যে কখনো শিরক, কখনো কুফর আমরা দেখি। এমন কথা শুনি যেটা কুফরি, এমন কর্মচিত্র দেখি যেটা শিরক, ইলহাদ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে বিরোধিতা। নাটকের সংলাপে-দৃশ্যে, আর এগুলো দেখা কঠিন হারাম। হয়তো বড় একটা নাটকের ভেতরে ছোট্ট একটা দৃশ্য, কিন্তু আমরা হারাম দেখলাম। আর হারাম দেখে আনন্দিত হওয়া অথবা সম্মত হলে কুফরিতে পরিণত হয়ে গেল। (উপস্থাপক: অনেক সময় বিধর্মীদের ধর্মীয় কালচার এবং সামাজিক রীতিনীতি দেখানো হয়) এগুলো সাধারণ বিনোদন নাটকে আসবেই, এটা তো তাদেরই বানানো জিনিস। ক্রমান্বয়ে আমরা মুবাহ দেখতে গিয়ে ছোট গুনাহ করি, ছোট গুনাহকে নিয়মিত করতে করতে কবীরা গুনাহ করি। এই কুফর-ইলহাদ ইত্যাদি দেখে অনেক সময় শিরক-কুফরের গুনাহে লিপ্ত হই। এভাবে আমরা ক্রমান্বয়ে অন্তরগুলোকে আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যাই। তাছাড়া এই ধরনের যে সংলাপ, পোশাক-চিত্র, যারা অভিনয় করেন, তারা আমাদের মনের ভেতরে প্রিয় স্থান দখল করে নেয়। যেটা আমাদের প্রয়োজন ছিল– অনৈসলামিক পোশাক, অনৈসলামিক আচরণ, ব্যক্তিত্বের প্রতি যে স্বাভাবিক ঘৃণা, এটাও আমাদের আর থাকে না। এটা ঈমানের কঠিন দুর্বলতা। এজন্য আমরা আমাদের দর্শকদের অনুরোধ করব, যারা সত্যিকারের কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন রাঙাতে চান, যারা চান যে আল্লাহর পথে চলবেন, তারা একটু রুচিটা তৈরি করতে হবে। বিনোদনটা যেন কুরআন-সুন্নাহর ভেতরে, শরীআতসম্মত বিষয়ে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা যারা ইসলামিক টিভি দেখি, ওই ধরনের বিনোদন, বিশেষ করে অমুসলিমদের তৈরি বিনোদন বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চ্যানেলগুলোর বিনোদন, এগুলো কম দেখব। এগুলো আমাদের হৃদয়গুলোকে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

কিছু মানুষ আছে, যারা হাসি-মশকরার কথাগুলো ক্রয় করে। কী জন্য ক্রয় করে? মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য।[১] যে কোনো বিনোদন, যেটা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ক্রমান্বয়ে সরিয়ে নেয়, আল্লাহর বিরোধিতাকে অন্তরে সহজ করে, এগুলো কুরআনের নিষিদ্ধ 'লাহওয়াল হাদীস'। (উপস্থাপক: আমাদের এই বিনোদনগুলো দেখার মাধ্যমে যে একটা বিরাট সময় নষ্ট হচ্ছে...) অবশ্যই! কিছু হাসি-মশকরা বিনোদন শরীআতে বৈধ বলে কিন্তু বিনোদনটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বিনোদনটা হল আমাদের সময়গুলোকে আরো ভালোভাবে ব্যবহারের জন্য, আমরা মানসিক-শারীরিকভাবে প্রস্তুত হই, এজন্য। কিন্তু আমরা বিনোদনের নামেই যদি সময়টা নষ্ট করি, আর বিশেষ করে এটা একটা নেশায় পরিণত হয়, যেটা আজকে আমরা সবাই জানি। অনেক সময় ভিডিও গেমগুলোকে নির্দোষ মনে করতেন। এখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেই প্রমাণিত হচ্ছে, ভিডিও গেমসের মাধ্যমে কিশোরদের, শিশুদের মধ্যে ারড়ষবহপব(সহিংসতা) তৈরি হচ্ছে। অস্বাভাবিকতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমাদের টিভি বিনোদনগুলো, এটাও ওইরকম! (উপস্থাপক: অনেক সময় হিন্দি সিরিয়ালগুলো মুসলিম মহিলাদের ভেতরে এমন একটা নেশার সৃষ্টি করে, যে তারা সবকিছু বাদ দিয়ে দেন...) এমনকি ইসলামি অনুষ্ঠান দেখা বাদ দিয়েও ওটা দেখতে মন চায়। আমরা মনকে দোষ দেব না, মন চায়..., কিন্তু রুচিটা তৈরি করা আমাদের প্রয়োজন, যারা আল্লাহর পথে থাকতে চায়। আমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরানোর জন্য বহুমুখি ষড়যন্ত্র চলতেই থাকবে, শয়তান বিভিন্নভাবে আমাদের উৎসাহ দেবে। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেছেন:

[১] সূরা: লুকমান, আয়াত: ৬

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না, স্টেপ বাই স্টেপ![২] শয়তান কখনো আমাদের একবারে বলবে না যে, তুমি বড় পাপটা করো; 'সামান্য এইটুকু... এইটুকু তো বড় নয়... সামান্য এটাতে আর কী হবে'? এইভাবে একপা একপা করে আমাদের খারাপে নিয়ে যাবে। এজন্য আমরা আমাদের রুচিটাকে..., একটু অভ্যাস করতে হবে। আপনি সিরিয়ালে যে আনন্দ পান, ইসলামি অনুষ্ঠান, কুরআন-সুন্নাহতেও আনন্দ পাবেন। একটু অনুশীলনের মাধ্যমে রুচি তৈরি করতে হবে। আল্লাহ তাওফীক দিন।

প্রশ্ন-১৭৮: আমাদের এখানে একজন তালীমের মহিলা এসেছিল, তিনি বলেছেন, বিশ্ব ইজতিমায় নাকি শয়তানের আনাগোনা! এটাকে ইসলামের দৃষ্টিতে কী বলে?

উত্তর: শয়তানের আনাগোনা ভালো জায়গায় বেশি হতেই পারে। বিশেষ করে মানুষ যেখানে ভালো হওয়ার জন্য যায়, শয়তান সেখানে বেশি করে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে যায়, যেন ভালো না হতে পারে। এজন্য যদি বলে থাকেন, তাহলে অন্য কথা! মনে হয়, উনি বলতে চেয়েছেন, বিশ্ব ইজতিমাটা ভালোনা, ওখানে খারাপ লোকেরা যায়। এই ধরনের চেতনা আমাদের না থাকা উচিত। প্রতিটা বিষয়কে তথ্যভিত্তিক– বিশ্ব ইজতিমায় যদি কোনো কিছু ভুল থাকে, এই কথা বা এই কর্মটা ভুল হয়েছে। সাধারণভাবে এরকম নেগেটিভ চিন্তা করা, নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা, অথবা কারো প্রতি আমি বিরূপ ধারণা রাখি, অথবা বিশ্ব ইজতিমায় অনেক মানুষ আছে, তারা নামায পড়েনা, অথবা পড়ত না, তাদের মতামত আমার পছন্দ না, তারা যেহেতু বিশ্ব

[২] সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৬৮ ও ২০৮; সূরা: আনআম, আয়াত: ১৪২

ইজতিমায় গিয়েছে, কাজেই কাজটা ভালোনা– এগুলো সবই খারাপ চিন্তা। বিশ্ব ইজতিমা দীনি দাওয়াতের জন্য একটা ভালো বরকতময় প্রচেষ্টা। সেখানে লক্ষলক্ষ মানুষ যান। অধিকাংশই যান দীন জানতে, দীন বুঝতে, দীনের দাওয়াত দিতে অথবা গ্রহণ করতে। এগুলো সবই দীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অনেক খারাপ মানুষ যান, অনেকে হয়তো নিজের পাপ রেখেই পূণ্যের অনুভূতি নিতে যান। এজন্য যারা দাওয়াত দিচ্ছেন তারা দায়ি নন। আমরা ওয়ায মাহফিল করি, মাদরাসা খুলি, অনেকে ভালো লোক নামায পড়তে যান, অনেক পাপী মুসল্লি যান– এজন্য তো আর ইমাম বা মসজিদ কর্তৃপক্ষ দায়ি নন। বিশ্ব ইজতিমা দাওয়াতের একটা ভালো প্রচেষ্টা। এর মাধ্যমে মানুষ কল্যাণ পাচ্ছে। কোনো সমালোচনা করলে আমরা সুনির্ধারিত তথ্যভিত্তিক সমালোচনা করব। এটা গ্রহণযোগ্য। মুসলিমদের দীনি কাজের এই ধরনের ঢালাও মন্তব্য ঠিক নয়।

<u>প্রশ্ন-১৭৯:</u> কোনো সংস্থা, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের এই অধিকার আছে কি যে তারা ফতোয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে?

<u>উত্তরঃ</u> বিষয়টা যেহেতু আমাদের দেশে বর্তমানে বহুল আলোচিত, আমাদের দীনদার দর্শকদের মধ্যে প্রশ্নটা আসবে, এটা স্বাভাবিক। আমাদের মসজিদে, মাহফিলে অনেকেই এই প্রশ্নটা করেন। প্রথমে বুঝতে হবে, ফতোয়া বিষয়টা কী? ফতোয়া অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ে কোনো সমস্যার সমাধান জিজ্ঞাসা করা। ইসলামে ফতোয়া এবং কাযা, ধর্মীয় সমস্যার সমাধান ও বিচারকে খুব ভালোভাবে পার্থক্য করা হয়েছে। বিচার হল আইনগত প্রক্রিয়া যেটা বীবপঁঃব (কার্যকর) হয়। আর ফতোয়া হল, শরীআতের মতামত প্রকাশ করা। এটাতে execution করা হয় না, কেউ করেও না। আমরা একটু ক্রমান্বয়ে এগুতে থাকি। আমার হাতে কুকুরে আঁচড় দিয়েছে। আমার একটা নাগরিক অধিকার আছে

যে, আমি কোনো ডাক্তারকে গিয়ে বলব, ভাই, কুকুরে আঁচড় দিয়েছে, আমি এখানে কী ওষুধ দেব? এই প্রশ্ন করা আমার নাগরিক অধিকার। আর একজন ডাক্তার যদি এর উত্তর জানেন, তবে এই উত্তর দেওয়া তার নাগরিক অধিকার। আমরা যদি আইন করে বলি যে, কেটে গেলে কেউ ডাক্তারকে প্রশ্ন করতে পারবে না অথবা ডাক্তারকে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারবে না। সেটা যেমন অমানবিক এবং মানবাধিকার বিরোধী। ঠিক তেমনই, আমার হাত কেটে গেলে, বা কুকুরে আঁচড় দিলে...। আমি যেহেতু মুসলিম, আমার মনে সন্দেহ হবে, আমি কি নাপাক হলাম? ধোয়া লাগবে? না ওযু করা লাগবে? আমি একজন আলিমকে প্রশ্ন করব, এই অধিকার আমার ন্যূনতম মানবিক ধর্মীয় অধিকার। এবং যে আলিম এটা জানেন, তাকে প্রশ্ন করা হলে, এটা তার ন্যূনতম ধর্মীয় অধিকার, মানবিক অধিকার এবং ধর্মীয় নির্দেশ:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

যাকে কোনো ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কোনো ইলমের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সে জানে কিন্তু উত্তর না দেয় কিয়ামতে তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।[৩] কাজেই এটা ওই রকমই মানবিক অধিকার, নাগরিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকার। এটা বন্ধ করার অর্থই নাগরিকদের নাগরিক অধিকার নিষিদ্ধ করে দেওয়া। দ্বিতীয় কথা, আমাদের সমাজে প্রতিদিন আমরা পেপারে পড়ি, ভুল চিকিৎসায়, অপচিকিৎসায় অগণিত মানুষ মারা যাচ্ছে; কখনো গ্রাম্য ডাক্তার মেরেছে, কখনো শিক্ষিত ডাক্তারের বেখেয়ালে অবহেলায় মরেছে। এই যে চিকিৎসা শাস্ত্রের অপব্যবহার করা হচ্ছে, এইজন্য যদি আমরা বলি, আজকে থেকে আইন করে দেওয়া হল, কোনো জায়গায় কেউ

[৩] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৬৫৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২৬৪৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-২৬৬

চিকিৎসা করতে পারবে না, একমাত্র সরকারি হাসপাতাল ছাড়া কোথাও চিকিৎসা চলবে না। এটা যেমন অমানবিক, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, ঠিক কোথাও ফতোয়ার অপব্যবহার হয়েছে যুক্তি দিয়ে মূল এই নাগরিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকারকে নিষিদ্ধ করা একই রকমের অমানবিকতা। তৃতীয় যে বিষয়টা আমাদের বুঝতে হবে, বাংলাদেশের কোনো আলিম ফতোয়া বীবপঁঃব করেন না। ফতোয়ার অপব্যবহার করেন না। একটু দয়া করে গ্রামে যান। যেখানে ফতোয়ার অপব্যবহার হয়েছে, কেন হয়েছে খোঁজ নেন। আমরা গ্রামে বসবাস করি, গ্রামে-শহরে কিছু মানুষ রয়েছে, সমাজপতি। যারা তাদের oponent (প্রতিপক্ষ) কে দমন করার জন্য, শায়েস্তা করার জন্য, কখনো থানা, কখনো কোর্ট, কখনো রাজনীতি, কখনো ফতোয়া ব্যবহার করে। যখন তারা সুযোগ পান থানা দিয়ে জব্দ করেন, যখন তারা সুযোগ পান আদালত দিয়ে জব্দ করেন, যখন তারা সুযোগ পান রাজনৈতিক ক্যাডার দিয়ে জব্দ করেন। যখন তারা দেখেন, ওগুলোতে সুবিধা হচ্ছে না, তখন তারা একটা ফতোয়া বানিয়ে নেন, নিয়ে একজন মাওলানা সাহেবকে বলেন যে, হুযুর এইভাবে এই করেছে। হুযুর বলে, এই করলে এই হবে। তখন ওই সমাজপতি, তিনি এই ফতোয়াকে ব্যবহার করে opponent কে শায়েস্তা করেন। আমাদের দেশে কোনো আলিমেরই ফতোয়া বীবপঁঃব করার ক্ষমতা নেই। করেনও না। এগুলোকে অপব্যবহার যারা করেন, তারা সমাজপতি। কখনো আইনের অপব্যবহার করে, কখনো থানার অপব্যবহার করে, কখনো রাজনীতির অপব্যবহার করে, কখনো ফতোয়ার অপব্যবহার করে। কাজেই আমরা অপব্যবহার রোধ করতে গিয়ে– এগুলোকে রদ করতে হবে, রাজনীতির অপব্যবহার হয়, ছাত্র রাজনীতির অপব্যবহার হয়, থানার অপব্যবহার হচ্ছে, বিনা বিচারে দশ বছর পড়ে রয়েছে, সুতরাং থানা বন্ধ করে দাও! এটা যেমন অযৌক্তিক বাজে কথা, ফতোয়া বন্ধ করা একই রকম বাজে কথা। চতুর্থ যে বিষয়টা, আমরা

আরো লক্ষ করি, আসলে বাংলাদেশে যতো ফতোয়াবিরোধী আন্দোলন, আপনি একটু চোখ মেলে তাকান, একটু চোখ মেলে তাকালে দেখবেন, বাংলাদেশের কোনো আলিম রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধে কোনো ফতোয়া দেন না। কেউই দেয় না। বাংলাদেশের একেবারে নাদান মূর্খরাও রাষ্ট্রীয় আইন বোঝে। ফতোয়ার কোনো executing power (কার্যকর করার ক্ষমতা) নেই, এটা তারা জানে। বিষয়টা অন্য, দুঃখজনক হলযে আমাদের সমাজে– দুঃখজনক আমাদের জন্য না ইউরোপ আমেরিকার জন্য!– আমাদের সমাজের মানুষের ভেতরে নামায পড়ুক না পড়ুক, রোযা রাখুক না রাখুক, আমাদের সমাজের যুবক-যুবতী অশ্লীলতাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। মাদকতাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। তারা যদি রাস্তায় কাউকে জড়াজড়ি করতে দেখে, বিবাহ করে নি দুইজন শুয়ে থাকে, যদি কাউকে দেখে মদ খেয়ে রাস্তায় মাতলামি করছে, চুমা খাচ্ছে, তাহলে নামাযি বেনামাযি, যে কোনো মুসলিম, এমনকি হিন্দুও এটার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হবে। এটাকে দমন করার জন্য দরজা বন্ধ করবে, আটকে দেবে, বন্দি করবে এবং এটার একটা সমাধান করার জন্য মাওলানা সাহেবের কাছে যাবে। কারণ তারা জানে অশ্লীলতা নিরোধনে ধর্মীয় নির্দেশনা নিতে হবে। এখানে থানা-আইন করে কিছু হবে না। এই অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে এখনো ইউরোপ আমেরিকার মতো রাস্তাঘাটে মদ খেয়ে পড়ে থাকে না কেউ, মদ খেলে ঘরে খায়। কারণ জানে সমাজ সহ্য করবে না। রাস্তাঘাটে অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, ইভটিজিং হচ্ছে, এখনও রাস্তাঘাটে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে না। ইউরোপ আমেরিকার দৃষ্টিতে এটা খুব খারাপ জিনিস। যতো ফতোয়াবিরোধী দেখবেন, সব এক জায়গায় গিয়ে আটকে গেছে। হয়তো অবৈধভাবে বিয়ে না করে ছিল, অথবা হয়তো জড়াজড়ি করে ছিল। যুবকেরা ধরে নিয়ে হুযুরের ডেকে একটা কিছু বলেছে, মারধোর করেছে– এই একটা ঘটনা ছাড়া বাংলাদেশে ফতোয়ার কোনো অপব্যবহার হয় না।

এখন ফতোয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্য যেটা আমরা বুঝতে পারি, এইক্ষেত্রে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা রাস্তাঘাটে জড়াজড়ি করবে, রাস্তার পাশে শুয়ে থাকবে, পার্কে চুমু খাবে, কাপড় খুলবে। কেউ যেন কিছু না বলতে পারে। যুবকেরা যখন হুযুরদের কাছে যাবে, হুযুরেরা বলবে, বাবা, আমি কিছু বলতে পারব না। আস্তে আস্তে যুবকদের জন্য এটা গা সওয়া হয়ে যাবে। এই কারণে আমার যেটা মনে হয়, আল্লাহ ভালো জানেন, এবং ইউরোপের সাথে মিলিয়ে দেখেন, এটাই হল ফতোয়া বন্ধের জন্য যে আন্দোলন চলছে এটার মূল কাহিনী। আমরা যদি সত্যিই দেশকে ভালোবাসি..., ইউরোপের মতো অশ্লীলতা যদি দ্রুত আমদানি করতে চাই, ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। ইউরোপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পরিবার ভেঙে গিয়েছে, সমাজ ভেঙে গিয়েছে, তাদের মানবসভ্যতা ধ্বংস হচ্ছে। আমরা আমাদের শ্লীলতা-সভ্যতা বজায় রেখে মানবাধিকার বজায় রাখব। সবচে' বড় কথা, ফতোয়া বন্ধ করা যায় না, channelized (নিয়ন্ত্রণ) করা যায়। সরকার রাষ্ট্র যেটা করতে পারেন, যে অমুক অমুক ফতোয়া দেবেন, প্রত্যেক থানায়, প্রত্যেক জেলায় ফতোয়া authority (কর্তৃপক্ষ) থাকবে, তারা ফতোয়া দেবেন। মানুষের ধর্ম, ধর্মীয় অধিকার, এটা সহজাত। আমার জন্মের সাথে ধর্ম রয়েছে। এটাকে আপনি বাঁধ দিয়ে বন্ধ করতে পারবেন না। পাড় ভেঙে বন্যা বয়ে দেবে। আপনি channelized করতে পারেন যে, ফতোয়া দেবে অমুক অমুক authority। এই পাশ করলে, এই ডিগ্রি হলে সরকারি লাইসেন্স হলে, সরকারের অনুমোদনক্রমে এইভাবে ফতোয়া বোর্ড থাকবে প্রত্যেক থানায় তারা ফতোয়া দেবেন, যেগুলো ক্রিটিক্যাল। বাকি ফতোয়া সবাই দিতে পারবেন। ফতোয়া দেওয়া যেমন মানবাধিকার, নাগরিকের ন্যূনতম ধর্মাধিকার, ফতোয়া চাওয়াও তেমনই অধিকার। কোনো রাষ্ট্র, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ-গোষ্ঠীর এটা বন্ধ করার অধিকার

নেই। কেউ করেও নি, ইউরোপে করে নি, আমেরিকায় করে নি; তুরস্ক বলেন, মালয়েশিয়া বলেন– কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এটা করা হয় নি। কী করা হয়? channelized করা হয়, অমুক ফতোয়া দেবে। আমরা আশা করি, ফতোয়ার অপব্যবহার রোধে, যারা ফতোয়ার অপব্যবহার করেন, সমাজপতি তাদেরকে আগে রোধ করুন। ফতোয়ার ব্যাপারে channelized করুন, কে ফতোয়া দিতে পারবে। তা নাহলে, সমস্যা বাড়বে, সমাজের উন্নতি হবে না। প্রথম কথা আপনারা ফতোয়া বন্ধ করলেও মুসলিমরা ফতোয়া বন্ধ করবে না। আপনারা ভারতীয় হাইকোর্টের বড় রায় জানেন, একজন মহিলার ব্যাপারে রায় দেওয়া হয়েছিল, মহিলাকে তালাক দিয়েছে, স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত মহিলার খোরপোশ দেবে, এটা হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল। মহিলা হুযুরদের কাছে গিয়েছে, হুযুর হাইকোর্টে রায় পেয়েছি, আমার স্বামী আমার দ্বিতীয় বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত খোরপোশ দেবে– এটা শরীআত সমর্থন করে? হুযুররা বললেন, না,শরীআতে এটা নেই। শরীআতে ইদ্দতের পর আর খোরপোশের হুকুম নেই। 'শরীআতে নেই, তাহলে আমি আর টাকা নেব না'। একজন সাধারণ মুসলিম, আপনি আইন করে...! আলিম-উলামাদের সাথে না নিয়ে শুধু আইন করে সমাজের মানুষদের আমরা উন্নয়ন করতে পারব না। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করেন।

<u>প্রশ্ন-১৮০:</u> ইসলাম যেটা নারীদের সম্পদ দিয়েছে, এটা যে বর্তমান সরকার যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমাদের প্রতিবাদ করা জরুরি কিনা?

<u>উত্তর:</u> নারীদের সম্পত্তিই শুধু নয়, কুরআন কারীমে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন, কেউ যদি মনে করেন রমাযান মাসে রোযার বিধানটা খুবই ভালো, তবে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এটাকে

এক মাসের জায়গায় পনেরো দিন, কিংবা দুই মাসে দুইবার...; কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট কোনো বিধান, অনেক ভালো মনে করে সংস্কারের চিন্তা করেন, এটা নিঃসন্দেহে কুফরি। তিনি কুরআনের অন্যান্য আয়াত মানেন, একটা অস্বীকার করেন, সেটাও কুফরি। তবে সরকার আদৌ এটা চেয়েছেন কিনা, এটা নিয়ে বিভিন্ন রকমের বক্তব্য আছে। এটা নিয়ে আমাদের সচেতন...। আমরা আশা করি, সরকারের দায়িত্ব জনগণের ধর্ম রক্ষা করা, সরকার এ ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। তারা মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত দেবেন না। আশা করি, সরকার এটা করবেন না। যদি করতে চান তাহলে অবশ্যই আমরা আপত্তি করব, সরকার অবশ্যই আমাদের মতামত গ্রহণ করবেন। আল্লাহ হিফাযত করুন।

প্রশ্ন-১৮১: আমার প্রশ্ন হল, আমার আম্মু খুব অসুস্থ। আমাদের এখানে মেডিটেশন করান অনেকেই। ইসলামের দিক থেকে এটা কতটুকু জায়িয?

উত্তর: বর্তমানে সারাবিশ্বে মেডিটেশনের প্রসার ঘটেছে, মেডিটেশন, ইয়োগা, কোয়ান্টাম মেথড ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ধ্যান করা হচ্ছে। ধ্যান বিষয়ে জানার আগে আমরা মূল একটা বিষয় জানি। যে ব্যক্তি কখনো বিরিয়ানি খায় নি, তাকে তেহারি খাওয়ালে হয়তো মজা পাবে। কিন্তু যে নিয়মিত ভালো বিরিয়ানি খায় তার কাছে...? কেন তেহারি খাবে? এটা হল মূল প্রশ্ন। ধ্যান বা মেডিটেশন একটা নেগেটিভ এপ্রোচ। অর্থাৎ আপনি কল্পনা করছেন, আপনার এইরকম হচ্ছে, আপনার চারিপাশে এরকম হচ্ছে...। একটা কল্পনার মাধ্যমে নিজের মনকে শান্ত করা, মনকে উজ্জীবিত করা। এটাতে মূলত মিথ্যা কল্পনার মাধ্যমে, অনেক সময় চিন্তা করে করে নিজের ভেতরে একটা শক্তি আনার চেষ্টা করা হয়। আর নিজের মনকে মিথ্যা প্রবোধ দিতে দিতে একসময়

মন মনে করে যে আমি সত্যিই বোধহয় এটা। এর বিপরীতে ইসলামে যেটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে যিক্‌র এবং দুআ। যিক্‌র এবং দুআ হচ্ছে একটা পজিটিভ এপ্রোচ। আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করছেন, কোনো মিথ্যা কল্পনা নয়, শুধু অর্থের দিকে একটু খেয়াল রেখে আল্লাহর নামটা মুখে নেওয়া, আল্লাহর প্রশংসাবাচক কোনো বাক্য মুখে নেওয়া এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা– এই প্রার্থনায় আপনি মনোযোগ যতো গভীরে দেবেন, আপনি দশ মিনিটের যিক্‌র ও প্রার্থনায় যে ফল পাবেন, জাগতিক ফল, এটা এক ঘণ্টার মেডিটেশনের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। যে ধর্ম যে সমাজ নামায জানে না, দুআ জানে না, যে ধর্মে সরাসরি যিক্‌র বা দুআর ব্যবস্থা নেই, পুরোহিতের কাছে যেতে হয়, পাদরির কাছে যেতে হয়, তারা মেডিটেশন খুঁজবে, ইয়োগা খুঁজবে, এটা স্বাভাবিক। ইসলামে আমাদের মুসলিমদের রয়েছে দুআ-যিক্‌র-সালাত। আপনি দুআয় অভ্যস্ত হন, ধ্যানের চেয়ে, মেডিটেশনের চেয়ে–আপনি নিজে একটু আল্লাহর কাছে দুআ করতে শিখুন, এতে, মেডিটেশনে আমরা যেটা পাই, অর্থাৎ আত্মিক শক্তি, অসুস্থতাকে কাটিয়ে তোলার জন্য মনের জোর– এটা তো আপনি পাবেনই; উপরন্তু, বান্দা যখন আল্লাহ্ কাছে দুআ করে, কথা বলে তার আত্মা শুদ্ধ হয়, আত্মায় শক্তি আসে এবং সে অগণিত সাওয়াব পেতে থাকে। আমরা যেখানে দুআ ও যিকরের মাধ্যমে– মেডিটেশনের যে লাভ, এক ঘণ্টার মেডিটেশনে যে লাভ, দশ পনের মিনিটে দুআ-যিক্‌রে অনেক বেশি লাভ। এবং এখানে কোনো উস্তাদ লাগে না। আপনি আল্লাহর দিকে মনোযোগ দেবেন, ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। সবচে' বড় কথা, এতে আপনি দুনিয়ার এই লাভের পাশাপাশি আত্মার লাভ, আত্মার শক্তি, আল্লাহর সাওয়াব ও যিক্‌র, আল্লাহর জান্নাত পাচ্ছেন। আমি অনুরোধ করব, আমরা এই মেডিটেশন নামক নেগেটিভ এপ্রোচের চেয়ে দুআ এবং যিক্‌রের মাধ্যমে আমাদেরকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করি। আমাদের মানসিকতা সুন্দর করি,

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুন্দর করি। মানুষের প্রতি ধারণাকে সুন্দর করি। আল্লাহ তাওফীক দিন। এখানে আরো অনেক বিষয় আছে, যা ঈমান নষ্ট করার পর্যায়ে নিতে পারে।

প্রশ্ন-১৮২: বর্তমানে সড়ক দূর্ঘটনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, এটা খুব মারাত্মক ব্যাপার ...

উত্তর: এটা আইন করে (ঠেকাতে পারবেন না)। অনেকে আইন করতে চায়! সড়ক দূর্ঘটনা কেন হয়? চালকদের তাকওয়ার অভাব, আপনি আইন করে পারবেন না। কীভাবে পারবেন? আমাদের যারা চালক আছেন, চালকদের যে ইউনিয়ন আছে, সেখানে চালক ভাইদের ভেতরে যদি বিবেক উজ্জীবিত হয়, চালকেরা যদি একজন সড়ক দূর্ঘটনাকারীকে ঘৃণা করেন। রাস্তার উপরে বেআইনিভাবে রেখেছে, সহকর্মীরা তাকে ঘৃণা করে, সহজীবীসহ পেশাজীবীরা তাকে ঘৃণা করে যে, কাজটা খুব অন্যায় করেছে; বন্ধুদের দ্বারা ঘৃণিত হবে। আসলে মানুষের অন্যায় দূর করতে, দুটি বিষয় লাগে। আমাদের ভেতরে পশুত্ব রয়েছে। একটা পশুকে যখন আপনি বশ করতে চান, (তখন দরকার) লোভ এবং ভয়। লোভ আর ভয়ের সমন্বয় ছাড়া মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় না। এ লোভ আর ভয় সমাজের হতে পারে, আইনের হতে পারে, আল্লাহর হতে পারে। সমাজ আর আইনের ভয় মূলত আমাদের পুরো মানুষ করে না। ইউরোপ আমেরিকাতে আইন ভালো আছে। আইনকে ভয় পায় মানুষ। কিন্তু আপনারা কিছুদিন পরপরই শুনছেন, এই আইন, বড় বড় সততার কথা বলছে, এমন লোকেরা বিশাল বিশাল দুর্নীতিতে ধরা পড়ে যাচ্ছে। আসলে আমাদের আল্লাহর ভয় যদি মনে থাকে, আমি একটা লোককে রাস্তায় খুন করলে আইন থেকে বেঁচে যাব; কিন্তু আল্লাহর কাছে আমি কঠিন শাস্তি পাব মানুষ হত্যার। এই অনুভূতি যদি থাকে, আমি বেআইনিভাবে গাড়িটা রাস্তায় রাখলে, যদি আমার কারণে

মানুষ কষ্ট পায়, পেছনে অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে, মানুষ রয়েছে, আমি মুখে যাই বলি না কেন, আল্লাহর কাছে আমার কঠিন শাস্তি পেতে হবে ।আমার আওলাদের বরকত নষ্ট হবে, এই চেতনা যখন চালক ভাইয়ের ভেতরে আসবে, তাহলে আমাদের দেশের অনেক দুর্নীতি কমে যাবে । চালক ভাই যদি বোঝে, আমার শিক্ষানবিশ হেলপারকে দিয়ে গাড়ি চালালে, এটা আল্লাহর কাছে আমার আমানতের খিয়ানত হবে, মালিক জানবেনা, কিন্তু আমি গুনাহগার হব, গাড়ি এক্সিডেন্ট হলে আমার গুনাহ হবে । এই চেতনা যদি চালক ভাইয়ের ভেতরে আসে, তাহলে এটা কমে যাবে ।

প্রশ্ন-১৮৩: মাযহাব মানা কি ফরয?

উত্তর: মাযহাব মানে হল পথ, মত, স্কুল । মুমিনের জন্য একটাই দায়িত্ব, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' । আল্লাহর ইবাদত করবে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পদ্ধতিতে । আর মুহাম্মাদ (ﷺ) বলে গেছেন, আমি দুটো জিনিস রেখে গেলাম । আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ । মূলত আমাদের দায়িত্ব হল, আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাতমতো জীবন যাপন করা । তবে বাস্তবতা এই যে, আমরা মুসলিম সমাজে শতকরা প্রায় নিরানব্বই জনেরও বেশি আমরা কুরআন বা হাদীস বুঝি না । অধিকাংশ মানুষ কিছুই বুঝি না, আর অল্প মানুষ... অল্প হয়তো একটা দুইটা হাদীস পড়েছি, বাকি অনেক হাদীস পড়িনি । স্বভাবতই দীন সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই । আর এজন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনেও বলেছে:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

[আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ

করে; তারাই তার প্রতি ঈমান রাখে][৪]

কিন্তু সবাই ফকীহ হবে না।

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

সমাজে কিছু মানুষ থাকবেন তারা দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন, ফকীহ হবেন।[৫] যাদের কাছ থেকে আমরা খুটিনাটি মাসআলা-মাসায়িল জেনে নেব। কাজেই আমরা মাযহাব মানব, দীন পালনের উপকরণ হিশেবে। যিনি দীন বোঝেন না, তাকে কোনো না কোনো একজন বড় আলিমকে মানতেই হবে। আসলে আমরা যে মাযহাব মানি, এটাও ঠিক না। আমরা কেউই মাযহাব মানিনা। আমরা বলি হানাফি মাযহাব;কিন্তু আমরা যদি হানাফি মাযহাবই মানতাম, তাহলে বাংলাদেশে হানাফিদের মধ্যে এতো দল কেন? হানাফিরাই বিভিন্ন রকম হলাম কী করে? কাজেই আমরা মূলত প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকার একজন আলিমকে মানি। আবার বাংলাদেশের হানাফিদের সাথে তুরস্কের হানাফিদের অনেক পার্থক্য, মিশরের হানাফিদের অনেক পার্থক্য, ইরাকের হানাফিদের অনেক পার্থক্য। মূল বিষয়টা হল যে, মাযহাব নামে হোক, আলিম নামে হোক, একজন বড় আলিমকে আমরা অনুসরণ করব, আমরা কুরআন বুঝি না এই সেন্সে। বিষয়টার দুটো পর্যায়। যে মুমিন মনে করেন যে, আমার দায়িত্ব কুরআন এবং সুন্নাহমতো চলা, আমি কুরআন সুন্নাহ অতো বুঝতে পারি না, সেই যোগ্যতাও নেই। অমুক আলিম বা অমুক ইমাম বা অমুক মাযহাব কুরআন-হাদীস ভালো বোঝেন। আমি তার মতগুলো মানব– এই চেতনায় উনি আশা করি ঠিক কথায় বলেছেন। তবে কখনো যদি বুঝতে পারি যে, উনার কথাটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীসের বিপরীত বা উনার পক্ষে কোনো দলীল নেই কুরআন হাদীসে। কুরআন হাদীসে তার বিপরীত আছে। আমি উনার মত

---

[৪] সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১২১

[৫] সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ১২২

বাদ দিয়ে কুরআন হাদীসই মানব। এই চেতনায় যারা মাযহাব মানেন অথবা আলিমদের অনুসরণ করেন, তাদের এই কর্মটা সুন্নাহসম্মত। সাহাবি তাবিয়িদের স্বীকৃত এবং এটা একটা মাসনূন পদ্ধতি। আর যে ব্যক্তি মনে করেন, কুরআন-হাদীস বোঝা আমাদের কাজ না, কুরআন-হাদীসে কী আছে সে চিন্তা করে লাভ নেই, আমার হুযুর অথবা মাওলানা সাহেব অথবা ইমাম সাহেব যেটা বলবেন আমি সেটাই মানব, যদি কখনো কুরআন বা হাদীসে কিছু পাই, মাওলানা সাহেব হুযুর বা মুরশিদ ইমামের বিপরীতে, তাহলে আমি কুরআন হাদীসের কথাটা ব্যাখ্যা করে রেখে দেব, হুযুরের মত ছাড়বই না– এই পর্যায়টা হল শিরক! এটা উলামায়ে কিরাম, ইমাম আবু হানীফা ও পরবর্তী উলামারা বলেছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রশ্ন-১৮৪: অনেক সময় দেখা যায়, অনেকে ইসলামের কোনো বিষয়ে না জেনেই মন্তব্য করে। এই ব্যাপারটা কেমন?

উত্তর: আমরা বাংলাদেশে একটা জিনিস লক্ষ্য করি; যে কোনো বিষয়ে– যদি আমরা একশজন মানুষ থাকি, সেখানে যদি একটা বিল্ডিং ক্র্যাক করে বা কোনো মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়– সেখানে ডাক্তার থাকলে সবাই ডাক্তারকে যেতে দেন। সেখানে প্রত্যেকেই বলেন না, পায়ে পানি ঢালো, মাথায় পানি ঢালো। বিল্ডিং ক্র্যাক হলে–আমরা বসে আছি কয়েকশ হাজার মানুষ– ইঞ্জিনিয়ার থাকলে তাকেই আমরা আগিয়ে দিই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দীনের ব্যাপারে, আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো মতামত ব্যক্ত করি। আর দীনের ব্যাপারে না জেনে মন্তব্য করা হারাম, কবীরা গুনাহ।

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আল্লাহর ব্যাপারে, আল্লাহর দীনের ব্যাপারে না জেনে কোনো

কথা বলা ভয়ঙ্কর কবীরা গুনাহ্ এবং এটা শয়তানের নির্দেশ।[৬] কাজেই আমরা মুসলিমরা এই অকারণ গুনাহ্ থেকে বিরত (থাকব)। যেহেতু আমি মাসআলাটা জানিনা, আমি নীরব থাকি। দ্বিতীয়ত আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেনঃ

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা যদি না জান, তাহলে আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করো। যারা জ্ঞানবান, যাদের কুরআন-সুন্নাহর ইলম আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো।[৭] দীনের ব্যাপারে মতভেদ হলে আমরা কেন পরস্পরে ঝগড়া করব? ঠিক আছে, আমারও এটা জানা নেই, আপনারও জানা নেই, আমি একটা ধারণায় বলছি, আমরা আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করব বা 'আসেন না অমুক আলিমকে ফোন করি'। যে আলিম বিতর্কে জড়িয়ে গেছেন, তাকে বাদ দিয়ে আরো দশজন আলিমকে ফোন করি। আর আমরা যারা আলিমরা বিতর্কে জড়িয়ে যাই; না জানার কারণে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়– তাদেরও উচিত সত্যকে মেনে নেওয়া এবং সত্যকে নিজের সম্মানের চেয়ে বড় চোখে দেখা। এইভাবে আমরা যদি আল্লাহর জন্য মনটা নরম করি, তাহলে অনেক কঠিন গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারব।

<u>প্রশ্ন-১৮৫:</u> আমাদের চলার পথে দেখা যায়, যেমন আমি বাসে উঠছি, আমার পাশে একজন মুরব্বি দাঁড়িয়ে আছেন, আমি বসে আছি, এজন্য আমি যদি তাকে একটু সহযোগিতা করি, সহমর্মিতা প্রকাশ করি, ইকরাম করি, তাহলে আমার কী ফায়দা? কারণ, কেন জানি এই বিষয়টা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে।

<u>উত্তর:</u> আপনি এমন একটা কথা বলেছেন, এখন তো মনে হচ্ছে

---

[৬] সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৬৯; সূরাঃ আ'রাফ, আয়াতঃ ৩৩

[৭] সূরাঃ নাহল, আয়াতঃ ৪৩; সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৭

একঘণ্টা কথা বলি। আমাদের সমাজে যে ন্যূনতম মূল্যবোধ, এটা উঠে যাচ্ছে। এটা উঠে যাওয়ার কারণ আমরা মিডিয়াতে যা দেখছি, এখানে ারড়ষবহপব(সহিংসতা) দেখছি, হানাহানি দেখছি, প্রেম দেখছি। কিন্তু যেটা দেখে আমরা শিখি, কোনো অনুষ্ঠানেই এইটা দেখছি না যে শ্রদ্ধা করতে হবে, একজন অন্ধ অসহায়কে পথ দেখিয়ে দিতে হবে, একজন মুরব্বিকে দেখে উঠে পড়তে হবে, মহিলাকে দেখে জায়গা দিতে হবে। অথচ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলছেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا

যে ব্যক্তি বয়স্কদেরকে সম্মান করে না এবং ছোটদেরকে স্নেহ করে না, সে আমার উম্মাতই নয়।[৮]

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ

বৃদ্ধ, দাঁড়ি পেকে গেছে, এরকম মুসলিমকে সম্মান করা, এটা আল্লাহকে মর্যাদা দেওয়ারই একটা প্রকাশ।[৯] যেমন মনে করেন, হিজড়া। আমি বারবার এটা বলি, আমাদের দেশে অনেক ব্যাপারে কথা আছে, কিন্তু হিজড়াদেরকে যেখানে হাদীস শরীফে পরিপূর্ণ মানবিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। নামাযের অধিকার, রোযার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, কিন্তু আমাদের সমাজে একটা সন্তান হিজড়া হওয়া মানেই সে পরিত্যক্ত হয়ে গেল। অন্ধ! আমরা বিদেশে দেখেছি, মুসলিম দেশ, অমুসলিম দেশে অন্ধরা ডাক্তার, প্রফেসর! আমাদের দেশে অন্ধ মানেই ফকির। এই যে, আমরা অসহায়দের ব্যাপারে সামাজিকভাবে, পারিবারিকভাবে নির্লিপ্ত, তাদের হক নষ্ট করি, সন্তানের হক দিই না, প্রতিবেশীর হক দিই না, মুমিনের হক দিই না, এটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে

---

[৮] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৯৪৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-১৯২০

[৯] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৮৪৩

আমাদের সামাজিক গযবের একটা বড় কারণ।

<u>প্রশ্ন-১৮৬:</u> টেস্টটিউব বেবি নেওয়া বা এ পদ্ধতিটা গ্রহণ করা শরীআত কতোটুকু সমর্থন করে?

<u>উত্তর:</u> চিকিৎসা করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমরা জানি। যদি স্বামী-স্ত্রী টেস্টটিউব ব্যবহার করে,(এভাবে) সন্তান গ্রহণ করা বৈধ। শর্ত হল, অবশ্যই স্বামীর স্পার্ম (শুক্রাণু) এবং মায়ের জরায়ু ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ যদি সন্তান গ্রহণে সমস্যা সীমিত হয়, টেস্টটিউবে সন্তান গ্রহণের পরে, সেটাকে মায়ের জরায়ুতে স্থানান্তর করা হবে, তাহলে এটা বৈধ। বিজ্ঞানের আরেকটা বিষয় রয়েছে, অন্যের স্পার্ম বা অন্যের জরায়ুতে সন্তান রাখা, এটা অবৈধ। এটা শরীআতে সম্পূর্ণ অবৈধ। অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর সিদ্ধান্তের...। আমরা এমন কিছু না করি, যেটা শরীআতের সমস্ত বিধানগুলো পাল্টে দেয়, রক্ত সম্পর্ক, দৈহিক সম্পর্ক, বংশ পরিচয়, যার মাধ্যমে ইসলামের অনেক কিছু নির্ভর করে। কাজেই যদি স্বামী এবং স্ত্রীর কিছু দুর্বলতা কাটানোর জন্য টেস্টটিউব ব্যবহার করা হয়, এটা উলামায়ে কিরাম কোনো মতভেদ ছাড়াই বৈধ বলেছেন। এখানে সমস্যা নেই। তবে অন্যের জরায়ু বা স্পার্ম ব্যবহার করা বৈধ নয়।

<u>প্রশ্ন-১৮৭:</u> মসজিদে দেখা যাচ্ছে এক পাশে আল্লাহ, আরেক পাশে মুহাম্মাদ, এটা সঠিক হচ্ছে কিনা?

<u>উত্তর:</u> আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ লেখা, এটা মূলত সুন্নাত না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবি ও তাবিয়িদের যুগে কখনোই মসজিদের সামনে এসব লেখা হত না। মসজিদের সামনে এমন কিছু লেখা– যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নামাযের দাঁড়ালে চোখ যেতে পারে, এগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন। ফুকাহারা নিষেধ করতেন। এখন আমরা ক্রমান্বয়ে এসব করছি। বুঝতে

হবে, আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হক আছে। আমরা যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে আল্লাহর জায়গায় বসিয়ে দিই তাহলে শিরক হবে। এজন্য সুন্দর হয় যে, আমরা লিখি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কুরআনের একটা আয়াত। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কুরআনের একটা আয়াতের অংশ। এভাবে যদি আমরা লেখি, তাহলে আমাদের ঈমানের বাক্য প্রকাশ পায়। এটা খুব সুন্দর হয়। আল্লাহ ও মুহাম্মাদ– এভাবে লেখা... বাক্যহীন শব্দ, এটা কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। এর দ্বারা যদি, আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ, দুইজনকে সমান অর্থাৎ আমাদের দুইজন মাবুদ রয়েছেন, তাহলে এটা শিরকে চলে যেতে পারে। এজন্য আমরা অনুরোধ করব, মসজিদের সামনে কারুকাজ যতো কম করা যায়; বিশেষ করে মানুষের মাথার উপরে, নামাযে দাঁড়িয়ে নযরে পড়ে, এরকম জায়গায় কোনো কারুকাজ না করা। আর কারুকাজ করলেও হালকা করা, আর কেউ লিখতে চাইলে, আল্লাহর কুরআনের আয়াত বা একদিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অপরদিকে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'– এমন লিখতে পারেন।

বিবিধ

<u>প্রশ্ন-১৮৮:</u> সূরা ইয়াসিনের ৫৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহপাক বলছেন: سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ। এটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?

<u>উত্তর:</u> سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ এর অর্থ হল, আমাদের করুণাময় প্রভু জান্নাতে আমাদেরকে সালাম দেবেন। তিনি বলবেন, সালাম। জান্নাতবাসী তোমাদেরকে সালাম দিচ্ছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীরা সালাম পাবেন– এটার কথাই আল্লাহ এখানে বলেছেন।

<u>প্রশ্ন-১৮৯:</u> রাসূলে পাক (ﷺ) নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে চারবার অপারেশন হয়েছে। এটা এক মাহফিলে আমি শুনেছি। এটা কতোটুকু কুরআন-হাদীসসম্মত? জানতে চাই।

<u>উত্তর:</u> রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর 'সীনাচাকে'র ব্যাপারে সহীহ হাদীস এসেছে। ছোটবেলায় একাধিকবার তাঁর 'সীনাচাক' হয়েছে, এটা জানা যায়। একটা ছোট বয়সে উনার দুধ-মার কাছে, হালিমার কাছে থাকা অবস্থায়। আর একবার মি'রাজের আগে, আরো অন্যান্য কিছু কথা আছে।

<u>প্রশ্ন-১৯০:</u> হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর বংশধরের সবাই কি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? কে কে করেছিলেন?

<u>উত্তর:</u> রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আওলাদ সবাই মুসলিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কিছু সন্তান নবুয়ত পাওয়ার আগেই ইন্তিকাল করেন। আর বংশ বলতে যদি তাঁর চাচা, চাচাতো ভাই ইত্যাদি বোঝানো হয়, তবে তার কোনো কোনো চাচা মুসলিম হন নি। যেমন আবু লাহাব, আবু তালিব। অন্য চাচা, যেমন আব্বাস,

মুসলিম হয়েছিলেন। চাচাতো ভাইদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পরে ছিলেন, তারা মুসলিম হয়েছিলেন। আর কেউ বাকি ছিলেন না।

প্রশ্ন-১৯১: মানুষ যে সারারাত সভা শোনে এবং ভোরের দিকে যে তাবারক দেওয়া হয়। এই সভা শোনা কি ইসলামি শরীআতের (ভেতরে) নাকি বাইরে?

উত্তর: মাহফিল অবশ্যই ভালো কাজ। রাত জেগে মাহফিল করার ব্যাপারে দুটো অন্যায় রয়েছে। একটা হল, সারারাত জাগা। তাহাজ্জুদ না পড়া, ফজর...। এটা নিজেদের জন্য মূলত সুন্নাতের খেলাফ। এটা উচিত নয়। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের, যেটা হারাম, সেটা হল সারারাত মাইক চালানো। রাত স্বাভাবিক, যেটা জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য; ১১ টা ১২ টার পর মাইক চালিয়ে মানুষের ঘুমের ডিস্টার্ব করা, এটা কঠিন হারাম। আমাদের সবাইকে সতর্ক হতে হবে। ওয়ায শোনা, এটা আমাদের নফল ইবাদত, আমি কাউকে ওয়ায শুনতে... এমনকি সাহরিতে ডাকার সময়, দীর্ঘ সময় ধরে ডাকা, মানুষের ঘুম নষ্ট করা...। যদি আমরা ওয়ায মাহফিল করি...; আগের যামানায় মাইক ছিল না, বুযুর্গরা ওয়ায করতেন, মানুষ দূর থেকে আসত, যেতে পারত না। এজন্য আগে এরকম রেওয়াজ ছিল। আমরা এগুলো থেকে নিজেদের রক্ষা করব।

প্রশ্ন-১৯২: আমার আপার একটা ছেলে আছে, এগারো বছর হল। জন্ম থেকে হাঁটা-চলা, খাওয়া-দাওয়া কোনোটাই একা একা পারে না। সবসময় শুয়ে থাকে বিছানাতে, খাওয়া-দাওয়া করতে পারে না। বাচ্চাটার খাতনা দেওয়া হয় নি। বাচ্চাটির খাতনা দেওয়াটা কি খুব জরুরি?

উত্তর: খাতনা মুসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত অথবা ওয়াজিব।

খাতনা দেওয়ার মতো অবস্থা যদি থাকে, তাহলে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে যেহেতু প্রতিবন্ধী; শরীআতের মুকাল্লাফ নয়। অর্থাৎ শরীআতের কোনো তাকলীফ, অর্থাৎ দায়িত্ব তার উপরে আসছে না। সে কথা বলতে পারে না, বুঝতে পারে না। কাজেই এই খাতনা দেওয়ার দায়িত্বও তার উপরে আসে নি মূলত। কাজেই যদি বাপ-মা মনে করেন, মুসলিম ছেলে, অবুঝ হোক, যেহেতু বয়স হচ্ছে, খাতনা দিয়ে দেওয়া ভালো কাজ। এবং স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তার পেশাবের ক্ষেত্রে অনেক উপকার হবে, infection (সংক্রমণ) ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আর যদি ডাক্তার বলে খাতনা তার জন্য কষ্টদায়ক হবে, ক্ষতিকর হতে পারে, যেহেতু শরীআতের কোনো বিধানই তার উপর প্রযোজ্য নয়, এক্ষেত্রে খাতনা না দিলেও গুনাহ হবে না। তবে খাতনা দিয়ে দিতে পারলে ভালো হবে, যেহেতু মুসলিমের সন্তান। অনেক কিছু হয় নি, কিন্তু growth (বৃদ্ধি/বর্ধন) যেহেতু হয়েছে, খাতনা দিতে পারলে ভালো হবে।

<u>প্রশ্ন-১৯৩:</u> আসরের নামাযের পরে ঘুমানোর ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ আছে কিনা?

<u>উত্তর:</u> হাদীস শরীফে বিভিন্নভাবে ফজরের পরে ঘুমানোর ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আছে। আসরের পরে ঘুমানোর ব্যাপারে নিষেধ আছে, এমনটা আমার জানা নেই।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০
মোবাইল: ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮
dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust
www.assunnahtrust.com